একটা সিন্দুকে থালা-ঘটি-বাটি গাড়ু-গেলাস-বক্নো-পিলসুজ অপর্য্যাপ্ত ভরা হইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখিতেছিলাম। এক সময়ে ইসারায় কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সব হচ্ছে কি? তুমি কি আর ফিরে আসতে চাও না না কি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, ফিরে কোথায় আসব শুনি?

আমার মনে পড়িল এ বাড়ী সে বঙ্কুকে দান করিয়াছে। কহিলাম, কিন্তু ধর যদি সে যায়গা তোমার বেশি দিন ভাল না লাগে?

রাজলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার জন্যে তোমার মন খারাপ করবার দরকার নেই। তোমার ভাল না লাগ্‌লে চলে এসো, আমি তাতে বাধা দেব না।

তাহার কথার ভঙ্গীতে আমি আঘাত পাইয়া চুপ করিলাম। এটা আমি বহুবার দেখিয়াছি, সে আমার এই ধরণের কোন প্রশ্নই যেন সরল চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। আমিও যে কাহাকে অকপটে ভালবাসিতে পারি, কিম্বা তাহার সংস্রবে স্থির হইয়া বাস করিতে পারি, ইহা কিছুতেই যেন তাহার মনের সঙ্গে গাঁথিয়া এক হইয়া উঠিতে চায় না। সংশয়ের আলোড়নে অবিশ্বাস এক মুহূর্ত্তেই এমন উগ্র হইয়া বাহিরে আসে যে, তাহার জ্বালা বহুক্ষণ অবধি উভয়ের মনেই রি রি করিয়া জ্বলিতে থাকে। এই অবিশ্বাসের আগুন যে কবে নিবিবে, এবং কেমন করিয়া নিবিবে, আমি তাহার কোন কিনারাই ভাবিয়া পাই না। সেও ইহারই সন্ধানে অবিশ্রাম ঘুরিতেছে। এবং গঙ্গামাটি এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করিয়া দিবে কি না, সে তথ্য যাঁহার হাতে তিনি অলক্ষ্যে চুপ করিয়াই আছেন।

সর্ব্ববিধ আয়োজনে আরও দিন চারেক কাটিল, এবং আরও দিন দুই গেল, শুভক্ষণের প্রতীক্ষায়। তার পরে একদিন সকালে অপরিচিত গঙ্গামাটির উদ্দেশে আমরা সত্যসত্যই যাত্রা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথটা আমার ভাল কাটিল না,—মনে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। আর, সকলের চেয়ে খারাপ কাটিল বোধ করি রতনের। সে মুখখানা অসম্ভব ভারি করিয়া গাড়ীর এক কোণে চুপ চাপ বসিয়া রহিল; ষ্টেসনের পর ষ্টেসন গেল, কোন কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না। কিন্তু, আমি ভাবিতেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য কথা। স্থানটা জানা কি অজানা, ভাল কি মন্দ, স্বাস্থ্যকর কিম্বা ম্যালেরিয়ায় ভরা সে দিকে আমার খেয়ালই ছিল না; আমি ভাবিতেছিলাম, যদিচ জীবনটা এতদিন আমার নিরুপদ্রবে কাটে না, ইহার মধ্যে অনেক গলদ, অনেক ভুল-চুক, অনেক দুঃখ দৈন্যই গিয়াছে, তবুও সে সব আমার অত্যন্ত পরিচিত। এই দীর্ঘ দিনে তাহাদের সহিত মোকাবিলা ত বটেই, বরঞ্চ এক প্রকারের স্নেহই জন্মি[illegible] তাহাদের জন্য আমিও কাহাকেও দোষ দিই না, আমাকেও আর বড় কেহ দোষ দিয়া সময় নষ্ট করে না। কিন্তু এই যে কোথায় কি একটা নূতনের মধ্যে নিশ্চিত চলিয়াছি, এই নিশ্চয়তাই আমাকে বিকল করিয়াছে। আজ নয় কাল বলিয়া আর দেরি করিবার রাস্তা নাই। অথচ, ইহার না জানি ভাল না জানি মন্দ। তাই ইহার ভাল-মন্দ কো[illegible] আজ আর কোন মতেই ভাল লাগে না। এ[illegible] আমরা দ্রুতবেগে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হ[illegible]নে যাইতে ততই এই অজ্ঞাত রহস্যের বোঝা [illegible] উপর চাপিয়া চাপিয়া ব[illegible] তাহার কোথা[illegible] মনে হইতে লাগিল, তাহার অবধি ন[illegible]সিয়াছে,—সেখা[illegible] অচির ভবিষ্যতে হয়ত আমাকেই কেন্দ্র[illegible]র বুক জুড়ি[illegible] বিশ্রী দল গড়িয়া উঠিবে, তাহাদের না [illegible] আমার [illegible] না পারিব ফেলিতে। তখন কি যে হইবে, [illegible] যে হইবে না ভাবিতেও সমস্ত মনটা যেন হিম হই[illegible] উঠিল। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী [illegible] বাহিরে দু চক্ষু মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। [illegible] মনে হইল ইহাকে আমি কোন দিন ভা[illegible] তবু ইহাকেই আমার ভালবাসিতেই হইবে। [illegible] কোন দিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এতবড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো [illegible] ঘটিয়াছে! অথচ, একটা দিন পূর্ব্বে [illegible] যাঁতা-কল হইতে আত্মরক্ষা করিতে [illegible] রূপে উহারই হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম [illegible] মনে মনে সবলে বলিয়াছিলাম, [illegible] সকল ভাল-মন্দের সঙ্গেই তোমাকে নিলাম [illegible]। অথচ, আজ আমার মন এমন বিক্ষিপ্ত এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাই ভাবি, সংসারে করিব বলায় এবং সত্যকার করায় কত বড়ই না ব্যবধান।

৩

সাঁইথিয়া ষ্টেসনে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল, তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীর [illegible] কাশীরাম স্বয়ং ষ্টেসনে আসিতে পারেন নাই, সে দিকের ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু জন দুই লোক পাঠাইয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহার লেখায় অবগত হওয়া গেল যে, ঈশ্বরেচ্ছায় 'অত্র' অর্থাৎ তিনি

সমস্ত মুখখানি চাপা হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে হাসিল না, আমিও আহারে মন দিলাম। সাধুজী বলিলেন, সে নামের সঙ্গে আর ত কোন সম্বন্ধ নেই। নিজেরও না, পরেরও না।

রাজলক্ষ্মী সহজেই সায় দিয়া কহিল, তা বটে। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সাধুজী, আপনি বাড়ী থেকে পালিয়েছেন, কত দিন?

প্রশ্নটি অত্যন্ত অভদ্র। চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর মুখে হাসি নাই বটে, কিন্তু যে পিয়ারীর মুখখানি আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, এখন রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমিষে আমার তাহাকেই মনে পড়িয়া গেল। সেই পুরাণো দিনের সমস্ত সরসতা তাহার চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে যেন সজীব হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

সাধু একটা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, আপনার এ কৌতূহল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলনা, ভাল মানুষটির মত মাথা নাড়িয়া কহিল, তা' সত্যি। তবে, একবার নাকি ভারি ভুগতে হয়েছে তাই,—এই বলিয়া সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, হাঁ গা, বলত তোমার সেই উট আর টাট্টু ঘোড়ার গল্পটি? সাধুজীকে একবার শুনিয়ে দাও ত,—আহা হা! ষাট্! ষাট্! কে বুঝি বাড়ীতে নাম করচে।

সাধুজী বোধ হয় হাসি চাপিতে গিয়াই একটা বিষম খাইলেন। এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই, কর্ত্রীঠাকুরাণীর আড়ালে কতকটা অনুচরের মতই ছিলাম। এখন সাধুজী বিষম সামলাইয়া যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—আপনি বুঝি তা'হলে একবার সন্ন্যাসী—

আমার মুখে লুচি ছিল, বেশি কথার যো ছিলনা, তাই ডান হাতের চারটা আঙুল তুলিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম,—উহুঁ হুঁ—একবার নয়, চার বার নয়—

এবার সাধুজীর গাম্ভীর্য্য আর বজায় রহিলনা, সে এবং রাজলক্ষ্মী দু'জনেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সাধু কহিলেন, ফিরলেন কেন?

লুচির ডেলাটা তখনও গিলিতে পারি নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিলাম।

রাজলক্ষ্মী তর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল—হাঁ, তাই বই কি! আচ্ছা, একবার না হয় আমারি জন্যে,—তাও ঠিক সত্যি নয়—আসলে ভয়ানক অসুখে পড়েই,—কিন্তু আর তিন বার?

কহিলাম, সেও প্রায় কাছাকাছি—মশা কামড়ে। ওটা কিছুতেই চামড়ায় সইলনা আচ্ছা,—

সাধু হাসিয়া কহিলেন, আমাকে আপনি বজ্রানন্দ বলেই ডাকবেন। আপনার নামটি—

আমার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী জবাব দিয়া কহিল, ওঁর নামে কি হবে। উনি বয়সে অনেক বড়, ওঁকে দাদা বলেই ডাকবেন। আর আমাকেও বৌদিদি বলে ডাকলে রাগ কোরবনা। আর আমিই কোন্ না বয়সে তোমার বছর পাঁচেকের বড় হব।

সাধুজীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আমিও এতটা প্রত্যাশা করি নাই। বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, এ সেই পিয়ারী! সেই স্বচ্ছ, সহজ, স্নেহাতুরা আনন্দময়ী! সেই যে আমাকে কোনমতেই শ্মশানে যাইতে দিতে চাহে নাই, এবং কিছুতেই রাজসংসর্গে টিকিতে দিলনা,—এ সেই। এই বন্ধুহীন ছেলেটি তাহার কোথাকার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে,—সেখাকার সমস্ত অজানা বেদনা রাজলক্ষ্মীর বুক জুড়িয়া টান্ ধরিয়াছে! কোন মতে ইহাকে সে আবার [illegible] ফিরাইয়া আনিতে চায়।

সাধু বেচারা লজ্জার ধাক্কাটা সামলাইয়া [illegible] কহিল, দেখুন, দাদা বলতে আমার [illegible] কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীদের [illegible]

রাজলক্ষ্মী লেশমাত্র অপ্রতিভ হইলনা, [illegible] নেই কেন? দাদার বোকে সন্ন্যাসীর [illegible] বলেও ডাকে না, পিসি বলেও ডাকে না, [illegible] আমাকে তুমি আর কি বোলে ডাকবে শুনি?

ছেলেটি নিরুপায় হইয়া [illegible] কহিল, আচ্ছা বেশ। ছ'সাত' ঘণ্টা [illegible] আপনার সঙ্গে। এর মধ্যে যদি দরকার হয় [illegible] তাই বলেই ডাকবো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা'হলে ডাকোনা একবার!

সাধু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দরকার হলে ডাকবো বলেছি—মিছিমিছি ডাকাডাকি উচিত নয়। রাজলক্ষ্মী তাহার পাতে আরও গোটা চারেক সন্দেশ ও বরফি দিয়া কহিল, বেশ, তা' হলেই [illegible] আমার [illegible] কিন্তু নিজের দরকারে যে কি বোলে তোমাকে ডাকবো ঠাউরে পাচ্চিনে। আমাকে দেখাইয়া কহিল, উনি ত ডাকতুম সন্ন্যাসী ঠাকুর বোলে [illegible] সে আর হয় [illegible] গুলিয়ে যাবে। তোমাকে না হয় ডাকবো সাধুঠাকুরপো বোলে,—কি বল?

সাধুজী আর তর্ক করিলেন না, অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, বেশ, তাই ভাল।

তিনি এ দিকে যাই হোন্, দেখিলাম খাহারাদির ব্যাপারে তাঁহার রসবোধ আছে। পশ্চিমের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের তিনি কদর বুঝেন এবং তাহাদের কিছুমাত্র অমর্য্যাদা করিলেন না। একজন [illegible] পরম স্নেহে একটির পরে একটি দিয়া দিতে লাগিলেন এবং আর একজন নিঃশব্দে নিঃসঙ্কোচে গলাধঃকরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। মনে মনে ভাবিলাম সাধুজী পূর্ব্বে যাহাই করুন, সম্প্রতি এরূপ লোভের ভোজ্য এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবা করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ত্রুটি একটা বেলার মধ্যে সংশোধন করিবার প্রয়াস করিতে দেখিলে দর্শকের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং রাজলক্ষ্মী আরও গোটা কয়েক পেঁড়া এবং বরফি সাধুজীর পাতে দিতেই অজ্ঞাতসারে আমার নাক এবং মুখ দিয়া একসঙ্গে এতবড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে রাজলক্ষ্মী এবং তাহার নূতন কুটুম্ব [illegible] চকিত হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী আমার [illegible] চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি [illegible] তুমি উঠে হাতমুখ ধোওগেনা। [illegible] থাকবার দরকার কি?

[illegible] একবার রাজলক্ষ্মীর [illegible] হাঁড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া [illegible] দীর্ঘশ্বাস পড়বার কথাই বটে। [illegible] আর রইলনা!

[illegible] কহিল, আরও অনেক আছে। বলিয়া [illegible] নিক্ষেপ করিল।

[illegible] সময়ে রতন পিছনে আসিয়া বলিল, মা, চিঁড়ে ত ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু দুধ কি দই কিছুই [illegible] পাওয়া গেল না।

সাধু [illegible] অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, আপনাদের আতিথ্যের উপর ভয়ানক অত্যাচার করলুম, বলিয়া সহসা উঠিবার উপক্রম করিতেই রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, আমার মাথা খাবে ঠাকুরপো যদি ওঠো। খাইবি বল্‌চি আমি সমস্ত হাঁড়ি [illegible] ফেলে দেবো!

সাধু [illegible] বিস্ময়ে বোধ হয় ইহাই চিন্তা করিল যে, এ [illegible] স্ত্রীলোক যে একদণ্ডের পরিচয়েই এত বড় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল! রাজলক্ষ্মীর পিয়ারীর ইতিহাসটা না জানিলে বিস্ময়ের কথাই বটে! তার পরে সে একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, খেতে আমার কিছুই বাধে না, কিন্তু আপনারও ত কিছু খাওয়া চাই। আমা মাথা খেয়ে ত আর সত্যি পেট ভরবেনা?

রাজলক্ষ্মী জিভ কাটিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, ছি, অমন কথা মেয়েমানুষকে বল্‌তে নেই ভাই! আমি এ সব খাইনে, আমার সহ্য হয়না। চাকরদের খাবার ঢের আছে,—আজ রাতটা বই ত নয়, যাহোক্ একমুঠা চিঁড়ে টিঁড়ে খেয়ে একটু জল খেলেই আমার চলে যাবে। কিন্তু ফিরে [illegible] তুমি যদি উঠে যাও, তা'হলে তাও আমার খাওয়া হবেনা ঠাকুরপো। বিশ্বাস না হয় ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। বলিয়া সে আমাকে আপিল করিল। কাজেই এতক্ষণে আমাকে কথা কহিতে হইল। বলিলাম এ যে সত্যি সে আমি হলফ্ নিয়ে বল্‌তে রাজী আছি! সাধুজী, মিথ্যে তর্ক কোরে লাভ নেই ভায়া পারো হাঁড়িটা উপুড় না হওয়া পর্য্যন্ত সেবাটা যেমন চল্‌চে চলুক, নইলে ও আর কোন কাজেই আস্‌বে না। খাবারটা ট্রেণে এসেছে,—সুতরাং অনাহারে মারা গেলেও ওঁকে তার একবিন্দু খাওয়ানো যাবে না। এটা ঠিক কথা।

সাধু কহিল, কিন্তু এ সব খাবার ত গাড়ীতে ছোঁয়া যায়না!

আমি বলিলাম, সে মীমাংসা আমি এতদিনে শেষ কোরে উঠতে পারলাম না ভায়া, আর তুমি কি এক আসনেই নিষ্পত্তি করতে পার্‌বে? তার চেয়ে বরঞ্চ কাজ সেরে উঠে পড় নইলে হয়ত ডুব দিলে হয়ত চিঁড়েজলও গলা দিয়ে গলবার পথ পাবে না। বলি, ঘণ্টাকয়েক আরও ত তুমি সঙ্গে আছো, শাস্ত্রের বিচার পারো ত পথে যেতে যেতেই বুঝিয়ো,—তাতে কাজ না হোক্ অন্ততঃ অকাজ বাড়বেনা। এখন যা' হচ্চে তাই চলুক।

সাধু জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে সমস্ত দিনই উনি [illegible] খাননি?

বলিলাম, না। তা' ছাড়া কালও কি নাকি একটা ছিল, শুন্‌চি, দু'টো ফল-মূল ছাড়া কালও আর কিছু ওঁর মুখে যায়নি।

রতন পিছনেই ছিল, ঘাড় নাড়িয়া কি যেন একটা বলিতে গিয়া—বোধ হয় মনিবের গোপন চোখের ইঙ্গিতে—হঠাৎ থামিয়া গেল।

সাধু রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিল, এতে আপনার কষ্ট হয়না?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু হাসিল, কিন্তু আমি কহিলাম, সেটা প্রত্যক্ষ এবং অনুমান কোনটাতেই জানা যাবেনা। তবে, চোখে যা দেখেছি তাতে আরও

দুই-একটা দিন বোধ হয় যোগ করা যেতে পারে।

রাজলক্ষ্মী প্রতিবাদ করিয়া কহিল, তুমি দেখেচ চোখে? কখ্‌খনো না।

ইহার আমিও জবাব দিলাম না, সাধুজীও আর কোন প্রশ্ন করিলেননা। বেলার দিকে লক্ষ্য করিয়া নীরবে ভোজন শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

রতন এবং সঙ্গের দু'জনের আহার সমাধা হইতে বেলা গেল। রাজলক্ষ্মী নিজের ব্যবস্থা কি করিল সেই জানে, আমরা গঙ্গামাটির উদ্দেশে যখন যাত্রা করিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অন্ধকারও কোথাও কিছু ছিলনা। মালবোঝাই গাড়ী দু'টা সকলের পিছনে, রাজলক্ষ্মীর গাড়ী মাঝখানে এবং আমার গাড়ীটা ভাল বলিয়া সকলের অগ্রে। সাধুজীকে ডাকিয়া কহিলাম, ভায়া, হাঁটার ত আর কমতি নেই, আজকের মত না হয় আমার এটাতেই পদার্পণ করনা?

সাধু কহিলেন, সঙ্গেই ত রইলেন, না পারলে না হয় উঠেই বোস্‌ব,—কিন্তু এখন একটু হাঁটি।

রাজলক্ষ্মী মুখ বাড়াইয়া বলিল, তাহ'লে আমার বডিগার্ড হয়ে চল ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে দু'টো কথা কইতে কইতে যাই। এই বলিয়া সে সাধুজীকে নিজের গাড়ীর কাছে ডাকিয়া লইল। সম্মুখেই আমি। মাঝে মাঝে গাড়ী, গোরু এবং গাড়োয়ানের সম্মিলিত উপদ্রবে তাঁহাদের আলাপের কিছু কিছু অংশ হইতে বঞ্চিত হইলেও অধিকাংশই শুনিতে শুনিতে গেলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ী তোমার এদিকে নয়, আমাদের দেশের দিকেই, সে তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি, কিন্তু আজ কোথায় চলেচ সত্যি বল ত ভাই?

সাধু কহিলেন, গোপালপুরে।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের গঙ্গামাটি থেকে সেটা কতদূর?

সাধু জবাব দিলেন, আপনার গঙ্গামাটিও জানিনে আমার গোপালপুরও চিনিনে, তবে সম্ভবতঃ ও দু'টো কাছাকাছিই হবে। অন্ততঃ, তাই ত শুন্‌লাম।

তাহ'লে এত রাত্রে গ্রামই বা কি কোরে ঠাওরাবে, যার ওখানে যাচ্চো, তাঁর বাড়ীই বা কি কোরে খুঁজে পাবে?

সাধুজী একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, গ্রামটা ঠাওরানো শক্ত হবেনা, কারণ, পথের উপরেই নাকি একটা মজানো পুকুর আছে, তার দক্ষিণ দিয়ে ক্রোশখানেক হাঁটলেই পাওয়া যাবে। আর বাড়ী খোঁজবার দুঃখ পোহাতে হবেনা, কারণ সমস্তই অচেনা। তবে গাছতলা একটা পাওয়া যাবেই এ আশা আছে।

রাজলক্ষ্মী ব্যাকুল হইয়া বলিল, এই শীতে রাত্রে গাছতলায়? ওই সামান্য কম্বলটি মাত্র অবলম্বন কোরে? সে আমি কিছুতেই সইতে পারবোনা ঠাকুরপো!

তাহার উদ্বেগ আমাকে পর্য্যন্ত যেন আঘাত করিল। সাধু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু আমাদের ত ঘর-বাড়ী নেই, আমরা ত গাছতলাতেই থাকি দিদি।

এবার রাজলক্ষ্মীও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে দিদির চোখের সাম্‌নে নয়। রাত্রে ভাইকে আমরা নিরাশ্রয়ের মধ্যে পাঠাইনে। আজ আমার সঙ্গে চল, কাল তোমাকে আমি নিজে উদ্যোগ করে পাঠিয়ে দেব।

সাধু চুপ করিয়া রহিলেন। রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া বলিয়া দিল তাহাকে না জানাইয়া যেন কোন জিনিষ গাড়ী হইতে স্থানান্তরিত না করা হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাক্সটা আজ রাত্রির [illegible] আটক করা হইল।

আমি বলিলাম, তা[illegible]লে ঠা[illegible] আমার [illegible] করলে, ভায়া, এসোনা আমার গাড়ীতে?

সাধু একটু ভাবিয়া কহিলেন, থাক এখ[illegible] সঙ্গে একটু কথা কইতে কইতে যাই।

আমিও ভাবিলাম, তা বটে! নূতন [illegible] অঙ্গীকারের দিকেই সাধুজীর মনে [illegible] চলিতেছিল আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলা[illegible]; তবুও শেষ রক্ষা হইল না। হঠাৎ এক সময়ে যখন তিনি অঙ্গীকার করিয়াই লইলেন, তখন [illegible]কবার মনে হইল একটু সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঠাকুর, পালালেই কিন্তু ভাল করিতে। শেষে আমার দশা না হয়!

অথচ, চুপ করিয়াই রহিলাম।

দু'জনের কথাবার্ত্তা অবাধে চলিতে লাগিল। গোরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে এবং তন্দ্রার ঝোঁকে মাঝে মাঝে তাঁহাদের আলাপের সূত্র হারাইতে থাকিলেও কল্পনায় সাহায্যে পূর্ণ করিয়া চলি চলিতে আমারও সময়টা মন্দ কাটিলনা।

বোধ করি একটু তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিলাম, সহ শুনিলাম প্রশ্ন হইল, হাঁ আনন্দ, তোমার ওই বাক্সটিতে কি আছে ভাই?

লইল, চোখের উপর ইহার জলন্ত ইতিহাস ছেলেটি যেন একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে লাগিল।

সহসা সাধু রাজলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মনে হয় তোমাকে যেন আমি চিন্‌তে পেরিছি দিদি। মনে হয় তোমাদের মত মেয়েদের নিয়ে গিয়ে একবার তোমাদেরই ভাই-বোনদের নিজের চোখে দেখাই।

রাজলক্ষ্মী প্রথমে কথা বলিতে পারিল না, তার পরে ভাঙা গলায় কহিল, আমার কি সে সুযোগ হতে পারে আনন্দ? আমি যে মেয়ে-মানুষ একথা কি কোরে ভুলব ভাই?

সাধু কহিল, কেন হতে পারে না দিদি? আর তুমি মেয়ে-মানুষ এই কথাটাই যদি ভোলো, ত কষ্ট কোরে তোমাকে ও-সব দেখিয়ে আমার কি লাভ হবে?

৪

সাধু জিজ্ঞাসা করিল, গঙ্গামাটি কি তোমাদের জমিদারী দিদি?

রাজলক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, দেখ্‌ছ কি ভাই, আমরা একটা মস্ত জমিদার।

এবার উত্তর দিতে গিয়া সাধুও একটুখানি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, মস্ত জমিদারী কিন্তু মস্ত সৌভাগ্য নয়, দিদি। তাহার কথায় তাহার পার্থিব অবস্থা সম্বন্ধে আমার একপ্রকার সন্দেহ জন্মিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী সে দিক দিয়া গেল না। সে সরল ভাবে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, সে কথা সত্যি আনন্দ। ও সব যত দূর হয়ে যায় ততই ভাল।

আচ্ছা দিদি, উনি ভাল হয়ে গেলেই তোমরা আবার সহরে ফিরে যাবে?

ফিরে যাবো? কিন্তু আজ সে তো অনেক দূরের কথা ভাই!

সাধু কহিল, পারো ত আর ফিরোনা দিদি। এই সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে। যখন কাছে ছিলে, তখনও যে এদের কষ্ট তোমরা দাওনি তা নয়, কিন্তু দূরে থেকে এমন নির্ম্মম দুঃখ তাদের দিতে পারোনি। তখন দুঃখ যেমন দিয়েচ, দুঃখের ভাগও তেমনি নিয়েচ। দিদি, দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে, দেশের দুঃখ-দৈন্য বোধ করি এমন কাণায় কাণায় ভর্ত্তি হয়ে উঠে না। আর এই কাণায়-কাণায় বল্‌তে যে কি বুঝায়, তোমাদের সহর বাসের সর্ব্বপ্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখ্‌তে পারো দিদি—

হাঁ আনন্দ, বাড়ীর জন্যে তোমার মন কেমন করে না?

সাধু সংক্ষেপে কহিল, না। সে বেচারা বুঝিল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম রাজলক্ষ্মী প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিল কেবল সহিতে পারিতেছিল না বলিয়াই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন?

সাধু কহিল, কিন্তু বাড়ী ত এখন আর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী আবার অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, আচ্ছা আনন্দ, এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

সাধু হাসিয়া কহিল, ওরে বাস্‌রে! সন্ন্যাসীর অত লোভ! না দিদি, আমি কেবল পরের দুঃখের ভার নিতে একটু চেয়েছি, তাই শুধু পেয়েচি।

রাজলক্ষ্মী আবার নীরব হইয়া রহিল। সা[illegible] কহিল, উনি বোধ করি, ঘুমিয়ে পড়েছেন, কি[illegible] এইবার একটু তাঁর গাড়ীতে গিয়ে বসি গে। আ[illegible] দিদি, কখনো দু'চার দিন যদি তোমাদের অতিথি হই উনি কি রাগ করবেন?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, উনি-টি কে? তোমার দাদা?

সাধুজীও মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, না হয় তাঁ[illegible]

রাজলক্ষ্মী বলিল, আর আমি রাগ কোরব কি [illegible] জিজ্ঞেস করলে না? আচ্ছা, চলত এখন গঙ্গা-মাটিতে, তারপরে অর বিচার হবে।

সাধুজী কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না, বো[ধ] করি কিছুই বলিলেন না। ক্ষণেক পরে আমা[র] গাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, দাদা, আপনি কি জেগে আছেন?

আমি জাগিয়াই ছিলাম, কিন্তু সাড়া দিলাম না। তখন আমারই পার্শ্বে সাধুজী একটুখানি স্থান করি[য়া] লইয়া তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি গায়ে দিয়া শুইয়া পড়ি[লেন]। একবার ইচ্ছা হইল একটুখানি সরিয়া গিয়া বেচারাকে আর একটু যায়গা দিই, কিন্তু পাছে নড়া-চড়া করিতে গেলে, তাঁহার সন্দেহ জন্মে আমি জাগিয়া আছি, কিম্বা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে এবং এই গভীর নিশীথে আর এক দফা দেশের সুগভীর সমস্যা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই ভয়ে করুণা প্রকাশের চেষ্টা মাত্র করিলাম না।

গঙ্গামাটিতে গাড়ী কখন প্রবেশ করিল আমি জানিতে পারি নাই, জানিলাম যখন গাড়ী থামিল আসিয়া আমাদের নূতন বাটীর দ্বারপ্রান্তে। তখন সকাল হইয়াছে। গোটা চারেক গো-যানের বিবিধ এবং বিচিত্র কোলাহলে চতুষ্পার্শ্বে ভিড় বড় কম জমে নাই। রতনের কল্যাণে পূর্ব্বাহ্নেই শুনিয়াছিলাম এটা নাকি মুখ্যতঃ ছোট জাতির গ্রাম। দেখিলাম, রাগ করিয়া কথাটা সে নিতান্ত মিথ্যা কহে নাই। এই শীতের ভোরেও পঞ্চাশ ষাটটি নানা বয়সের ছেলে মেয়ে উলঙ্গ এবং অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বোধ করি এই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া তামাসা দেখিতে জমা হইয়াছে। পশ্চাতে বাপ-মায়ের দলও যথাযোগ্য ভাবে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। ইহাদের আকৃতি ও পোষাক পরিচ্ছদে ইহাদের কৌলীন্য সম্বন্ধে আর যাহার মনে যাহাই থাক্‌, রতনের মনের মধ্যে বোধ হয় সংশয়ের বাষ্পও রহিল না। তাহার ঘুম-ভাঙ্গা মুখ এক নিমিষেই বিরক্তি ও ক্রোধে ভীমরুলের চাকের মতন ভীষণ হইয়া উঠিল। কর্ত্রীকে দর্শন করিবার অতি-ব্যগ্রতায় গোটা কয়েক ছেলে-মেয়ে কিঞ্চিৎ আত্ম-বিস্মৃত [illegible] ঘেঁসিয়া আসিয়াছিল, রতন এমন একটা বিকট [illegible] করিয়া তাহাদের তাড়া করিল যে [illegible] সম্মুখে না থাকিলে সেইখানেই [illegible] ঘটিত। রতন কিছুমাত্র [illegible] অনুভব করিল না। আমার প্রতি চাহিয়া [illegible] যত সব ছোট-জেতের মরণ! দেখচেন বাবু ছোটলোক ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা—যেন রথ-দোল [illegible] এসেচে! আমাদের সব ভদ্দর লোক কি [illegible] সঙ্গে পারে বাবু? এখুনি সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে একাকার করে দেবে।

'ছোঁয়া-ছুঁয়ি' কথাটা সর্ব্বাগ্রে কানে গেল রাজলক্ষ্মীর। তাহার মুখখানি যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

সাধুজী নিজের বাক্স সামলাইতে ব্যস্ত ছিলেন, কাজটা সমাধা করিয়া তিনি একটা লোটা বাহির করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, এবং কাছাকাছি যে ছেলেটিকে পাইলেন অকস্মাৎ তাহারই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, ওরে ছেলে, যা তো ভাই, এখানে কোথা ভাল পুকুর-টুকুর আছে—এক ঘটি জল নিয়ে আয়—চা খেতে হবে। বলিয়া পাত্রটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া, সম্মুখের একজন প্রৌঢ় গোছের লোককে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মোড়লের পো, কাছাকাছি কার গোরু আছে দেখিয়ে দাও ত দাদা, এক ছটাক দুধ চেয়ে আনি। গাঁয়ের টাট্‌কা খাঁটি জিনিস,—চায়ের রঙ্‌টা যা দাঁড়াবে দিদি,—বলিয়া তিনি একবার আমার ও একবার তাঁহ[illegible] দিদির মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দি[illegible] কিন্তু এ উৎসাহে কিছুমাত্র যোগ দিলেন ন[illegible] অপ্রসন্ন মুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, রতন, যা [illegible] বাবা ঘটিটা মেজে একটু জল নিয়ে আয়।

রতনের মেজাজের খবরটা ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি[illegible] তার উপর এই শীতের সকালে যখন কে-এক অচেনা সাধুর জন্য কোথাকার একটা নিরুদ্দে[illegible] জলাশয় উদ্দেশ করিয়া জল আনিবার ভার পড়ি[illegible] তখন আর সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল ন[illegible] এক মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহ[illegible] চেয়েও যে ছোট, সেই হতভাগ্য বালকটার উপর[illegible] তাহাকে সে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া কহিয়া উঠি[illegible] নচ্ছার পাজি ব্যাটা! ঘটি ছুঁলি কেন তুই? চ[illegible] হারামজাদা, ঘটি মেজে জলে ডুবিয়ে দিবি! বলি[illegible] সে কেবল চোখ-মুখের ভঙ্গিতেই ছেলেটাকে যে[illegible] গলা ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া লইয়া গেল।

তাহার কাণ্ড দেখিয়া সাধু হাসিল, আমি[illegible] হাসিলাম। রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু সলজ্জ হা[illegible] হাসিয়া কহিল, গ্রামটা যে তোলপাড় করে তুল[illegible] আনন্দ! সাধুদের বুঝি রাত না পোয়াতেই [illegible] চাই?

সাধু বলিল, গৃহীদের রাত পোয়ায়নি বলে বু[illegible] আমাদেরও পোহাবে না? বেশ ত! কিন্তু দুধে[illegible] যোগাড় যে করা চাই। আচ্ছা, বাড়ীটার মধ্যে[illegible] ঢুকে দেখা যাক্‌ কাঠ-কুটো, উনুন-টুনুন আছে কিনা[illegible] ওহে কর্ত্তা, চল না দাদা, কার ঘরে গোরু আছে[illegible] একটু দেখিয়ে দেবে। দিদি, কালকের সে[illegible] হাড়িটায় বর্‌ফি কিছু ছিল না? না, গাড়ীর মা[illegible] অন্ধকারে তাকে শেষ করেছেন?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, পাড়ার যে দু'চার জন মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহারাও মুখ ফিরাইল।

এমন সময়ে গমস্তা কাশীরাম কুশারী মহাশ[illegible] হন্তদন্ত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার তিন চার জন লোক, কাহারো মাথায় ঝুড়ি-ভরা শাক সব্জী ও তরকারী, কাহারো হাতে ঘটি ভরা দুধ, কাহারো হাতে দধির ভাণ্ড, কাহারো হাতে একটা বৃহদায়তন রোহিত-মৎস্য [illegible] রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে এই সামান্য একটু বিলম্বের জন্য বহুবিধ কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। লোকটিকে আমার

ভাল বলিয়াই মনে হইল। বয়স পঞ্চাশের উপর গিয়াছে। কিছু কৃশ, দাড়ি গোঁফ কামানো—রঙটি ফর্সার দিকেই। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম; তিনিও প্রতি-নমস্কার করিলেন। কিন্তু সাধুজী এ সকল প্রচলিত ভদ্রতার ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি তরকারির ঝুড়িটা স্বহস্তে নামাইয়া লইয়া তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন; দুধ যে খাঁটি সে বিষয়ে নিঃসংশয় মত দিলেন, এবং মৎস্যটির ওজন কত তাহা অনুমান করিয়া ইহার আস্বাদ-সম্বন্ধে উপস্থিত সকলকেই আশান্বিত করিয়া তুলিলেন।

এই সাধু মহারাজের শুভাগমন সম্বন্ধে গমস্তা মহাশয় পূর্ব্বাহ্ণে কোন সম্বাদ পান নাই; তিনি কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিল, সন্ন্যাসী দেখে ভয় পাবেন না, কুশারী মশাই, ওটি আমার ভাই। একটু হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আর বারবার গেরুয়া ছাড়ানো যেন আমার একটা কাজ হয়ে উঠেছে।

কথাটা সাধুজীর কানে গেল। কহিলেন, এ কাজটা তত সহজ হবেনা দিদি। বলিয়া আমার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া তিনি একটুখানি হাসিলেন। ইহার অর্থ আমিও বুঝিলাম, রাজলক্ষ্মীও বুঝিল। সে প্রত্যুত্তরে কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে দেখা যাবে।

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল কুশারী মহাশয় বন্দোবস্ত বড় মন্দ করেন নাই। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলিয়া তিনি নিজে সরিয়া গিয়া পুরাতন কাছারি-গৃহটিকেই কিছু কিছু সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন করিয়া দিব্য বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ভিতরে রান্না এবং ভাঁড়ার-ঘর ছাড়া শোবার ঘর দু'টি। ঘরগুলি মাটির, খড় দিয়া ছাওয়া, কিন্তু বেশ উঁচু এবং বড়। বাহিরে বসিবার ঘর-খানিও চমৎকার পরিপাটি। প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, পরিষ্কার এবং মাটীর প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এক ধারে একটি ছোট কূপ, এবং তাহারই অদূরে গোটা দুই-তিন টগর ও শেফালি বৃক্ষ। আর একদিকে অনেকগুলি ছোট বড় তুলসী গাছের সারি, এবং গোটা-চারেক যুঁই ও মল্লিকা ফুলের ঝাড়। সব সুদ্ধ যায়গাটা দেখিয়া যেন তৃপ্তি বোধ হইল।

সকলের চেয়ে উৎসাহ দেখা গেল, সন্ন্যাসী-ভায়ার। যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতেই উচ্চকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—যেন এমন আর কখনও দেখেন নাই! আমি কলরব না তুলিলেও মনে-মনে খুসিই হইয়াছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার ভাইয়ের জন্য রান্না-ঘরে চা তৈরি করিতেছিল, অতএব মুখের ভাব তাহার চোখে দেখা গেলনা বটে, কিন্তু মনের ভাব তাহার কাহারও কাছে অবিদিত ছিলনা। কেবল দলে ভিড়িল না রতন। সে মুখখানা তেমনি ভারি করিয়াই একটা খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

চা প্রস্তুত হইল। সাধুজী কল্যাকার অবশিষ্ট মিষ্টান্নযোগে পেয়ালা দুই চা নিঃশব্দে পান করিয়া উঠিলেন। এবং আমাকে কহিলেন, চলুন না গ্রামখানা একবার দেখে আসা যাক। বাঁধটাও ঘুরে নয়, অমনি স্নানটাও সেরে আসা যাবে। দিদি, আসুন না জমিদারী পরিদর্শন কোরে আসবেন। বোধ হয় ভদ্রলোক বড় কেউ নেই,—লজ্জা করবার বিশেষ আবশ্যক হবে না। সম্পত্তিটি ভাল, দেখে লোভ হচ্ছে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, তা' জানি। সন্ন্যাসীদের স্বভাবই ওই।

আমাদের সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ এবং আরও একজন চাকর আসিয়াছিল, তাহারা রন্ধনের আয়োজন করিতেছিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, মা, মহারাজ, অমন টাট্‌কা মাছের মুড়ো তোমাকে দিয়ে ভরসা হয় না, নেয়ে এসে দাদাঠাকুরই চড়িয়ে দেবে। এই বলিয়া সে আমাদের সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত রতন কোন কথায় বা কাজে যোগ দান করে নাই। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময়ে সে অত্যন্ত ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল, মা, ঐ যে বাঁধ না পুকুর কি একটা-পোড়া দেশের লোকে বলে, ওতে যেন আপনি নাববেন না। ভয়ানক জোঁক আছে,—এক একটা না কি এক হাত কোরে।

মুহূর্ত্তে রাজলক্ষ্মীর মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হইয়া গেল,—বলিস্ কি রতন, এদিকে কি বড্ড জোঁক না কি?

রতন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাই ত শুনে এলুম।

সাধু তাড়া দিয়া উঠিলেন,—আজ্ঞে হাঁ, শুনে এলে বৈ কি! ব্যাটা নাপ্‌তে ভেবে ভেবে আচ্ছা ফন্দি বার করেছে! ইহার মনের ভাব এবং জাতির পরিচয় সাধু পূর্ব্বাহ্ণেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন; হাসিয়া কহিলেন, দিদি, ওর কথা শুনবেন না, আসুন। জোঁক আছে কি না সে পরীক্ষা না হয় আমাদের দিয়েই হয়ে যাবে।

তাঁহার দিদি কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেন

না, জোঁকের নামে একেবারে অচল হইয়া কহিলেন, আমি বলি আজ না হয় থাক্ আনন্দ। নতুন জায়গা, বেশ না জেনে-শুনে এমন দুঃসাহস করা ভাল হবেনা। রতন, তুই না হয় ওঠ্ বাবা, এখানেই দু-ঘড়া জল কুয়ো থেকে তুলে দে। আমাকে আদেশ হইল,—তুমি রোগা মানুষ, তুমি যেন আর কোথাকার কোন্ জলে নেয়ে এসোনা। বাড়ীতেই দু-ঘটি জল মাথায় দিয়ে আজকের মত নিরস্ত হও।

সাধু হাসিয়া বলিলেন, আর আমিই কি এত অবহেলার দিদি, যে আমাকেই কেবল সেই জোঁকের পুকুরে পাঠিয়ে দিচ্চেন?

কথাটা বেশি কিছু না, কিন্তু এইটুকুতেই রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু যেন হঠাৎ ছল্ছল্ করিয়া আসিল। সে ক্ষণকাল নীরবে স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে যেন অভিষিক্ত করিয়া কহিল, তুমি যে ভাই মানুষের হাতের বাইরে। যে বাপমায়ের কথা শোনেনি, সে কি একটা কোথাকার অজানা অচেনা বোনেরই কথা রাখ্বে?

সাধু প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া সহসা একটু থামিয়া কহিলেন, এই অজানা অচেনা কথাটি বলবেন না দিদি। আপনাদের সবাইকে চিন্ব বলেইত ঘর ছেড়ে আসা, নইলে আমার কি দরকার ছিল বলুন ত? এই বলিয়া তিনি একটু দ্রুত পদেই বাহির হইয়া গেলেন, এবং আমিও পিছু পিছু তাঁহার সঙ্গ লইলাম।

দুইজনে এইবার বেশ করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া গ্রামখানিকে দেখিয়া লইলাম। গ্রামখানি ছোট, এবং অধিকাংশই যাহাদের ছোট জাত বলি তাহাদেরই। বস্তুতঃ, দুই ঘর বারুজীবী এবং এক ঘর কর্মকার ব্যতীত গঙ্গামাটিতে জলাচরণীয় কেহ নাই। সমস্তই ডোম এবং বাউরিদের বাস। বাউরিরা বেতের কাজ এবং মজুরি করে, এবং ডোমেরা চাঙারি, কুলা, চুপ্ড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পোড়ামাটি গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। গ্রামের উত্তর-দিকে যে জল-নিকাশের বড় নালা আছে, তাহারই ওপারে পোড়ামাটি। শোনা গেল ও-গ্রামখানা বড়, এবং উহাতে অনেক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির বাস আছে। আমাদের কুশারী মহাশয়ের বাটীও ওই পোড়ামাটিতেই। কিন্তু পরের কথা পরে হইবে, আপাততঃ নিজেদের গ্রামের যে অবস্থা চোখে দেখা গেল তাহাতে দৃষ্টি জলে ঝাপ্সা হইয়া আসিল। বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাঙলা দেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এক ছটাক জমি জায়গা প্রায় কাহারও নাই, কেবলমাত্র চাঙারি-চুপ্ড়ি হাতে বুনিয়া এবং জলের দামে গ্রামান্তরের সৎ-গৃহস্থের দ্বারে বিক্রয় করিয়া কি করিয়া যে ইহাদের দিনপাত হয় আমি ত ভাবিয়া পাইলাম না। তবুও এমন করিয়াই এই অশুচি অস্পৃশ্যদের দিন চলিতেছে এবং হয় ত এমনি করিয়াই ইহাদের চিরদিন চলিয়া গেছে, কিন্তু কোন দিন কেহ খেয়ালমাত্র করে নাই। পথের কুকুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন-তেমন ভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে, তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলারও ইহার অধিক দেশের কাছে এক বিন্দু দাবী দাওয়া নাই। ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের সর্ব্ববিধ হীনতা আপনার এবং পরের চক্ষে এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, মানুষের পাশে মানুষের এত বড় লাঞ্ছনায় কোথায় কাহারও মনে লজ্জার কণা মাত্র নাই। কিন্তু সাধু যে আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন আমি জানিতাম না। তিনি হঠাৎ কহিলেন, দাদা, এই হচ্চে দেশের সত্যিকার ছবি। কিন্তু মন খারাপ করবার দরকার নেই। আপনি ভাবচেন এ সব বুঝি এদের অহরহ দুঃখ দেয়, কিন্তু তা' মোটেই নয়।

আমি ক্ষুব্ধ এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, এটা কি রকম কথা হ'ল সাধুজী?

সাধুজী বলিলেন, আমাদের মত যদি সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতেন দাদা, তা'হলে বুঝতেন আমি প্রায় সত্যি কথাটাই বলেচি। দুঃখটা বাস্তবিক কে ভোগ করে দাদা? মন ত? কিন্তু সে বালাই কি আমরা আর এদের রেখেচি! বহুদিনের অবিশ্রাম চাপে একেবারে নিঙ্ড়ে বার করে দিয়েচি। এর বেশি চাওয়াটাকে এখন নিজেরাই এরা অন্যায় স্পর্দ্ধা বলে মনে করে। বাঃ রে বাঃ! কি কলই না আমাদের বাপ পিতামহরা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন! এই বলিয়া সাধু নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতই হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতেও পারিলাম না; এবং তাঁহার কথাটারও ঠিক অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলাম।

এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই, জলের অভাবে হৈমন্তের ধানটা প্রায় আট আনা রকম শুকাইয়া গিয়া ইতিমধ্যেই অভাবের হাওয়া বহিতে সুরু

করিয়াছিল। সাধু কহিলেন, দাদা, যে ছলেই হোক্ ভগবান্ যখন আপনাকে আপনার প্রজাদের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছেন, তখন হঠাৎ আর পালাবেন না, অন্ততঃ এ বছরটা কাটিয়ে যাবেন। বিশেষ কিছু যে করতে পারবেন, তা ভাবিনে; তবে চোখ দিয়েও প্রজার দুঃখের ভাগ নেওয়া ভাল, তাতে জমিদারী করার পাপের বোঝাটা কতক হাল্কা হয়।

আমি মনে মনে কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, জমিদারী এবং প্রজা আমারই বটে! কিন্তু পূর্ব্বেও যেমন জবাব দিই নাই, এবারও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম।

ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গেছে। কাল অপরাহ্নের মত আজও আমাদের উভয়কে খাইতে দিয়া রাজলক্ষ্মী একপাশে বসিল। সমস্ত রান্না সে নিজে রাঁধিয়াছে, সুতরাং মাছের মুড়া ও দধির সর সাধুর পাতেই পড়িল। সাধুজী বৈরাগী মানুষ, কিন্তু সাত্ত্বিক এবং অসাত্ত্বিক, নিরামিষ এবং আমিষ কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ দেখা গেল না, বরঞ্চ, এরূপ উদ্দাম অনুরাগের পরিচয় দিলেন যাহা ঘোর সাংসারিকের পক্ষেও দুর্লভ। রান্নার ভাল-মন্দের সমজ্দার ব্যক্তি বলিয়াও যেমন আমার খ্যাতি ছিল না, আমাকে বুঝাইবার দিকেও রাঁধুনির কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইল না!

সাধুর তাড়া নাই, অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে আহার করেন,—চর্ব্বণ করিতে করিতে কহিলেন, দিদি, সম্পত্তিটি সত্যিই ভাল, ছেড়ে যেতে মায়া হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ছেড়ে যেতে ত তোমাকে আমরা সাধছিনে ভাই।

সাধু হাসিয়া কহিলেন, সন্ন্যাসী-ফকিরকে কখনো এত প্রশ্রয় দেবেন না দিদি,—ঠক্‌বেন। তা সে যাই হোক্, গ্রামটি বেশ, কোথাও একজন এমন চোখে পড়ল না যার জল ছোঁয়া যায়। এমন একটা ঘর দেখলাম না যার চালে এক আঁটি আস্ত খড় আছে,—যেন ঋষিদের আশ্রম।

আশ্রমের সহিত অস্পৃশ্য গৃহগুলির একদিক দিয়া যে উৎকট সাদৃশ্য ছিল, সেই কথা মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল, শুন্‌লুম সত্যিই না কি এ গাঁয়ে কেবল ছোট জাতের বাস,—এক ঘটি জলের প্রত্যাশাও কারও কাছে নেই। বেশি দিন দেখ্‌ছি থাকা চল্‌বে না।

সাধু একটু হাসিলেন, আমি কিন্তু নীরব হইয়া রহিলাম। কারণ, রাজলক্ষ্মীর মত করুণাময়ীও কোন্ সংস্কারের মধ্যে দিয়া এত বড় লজ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারিল আমি তাহা জানিতাম। সাধুর হাসি আমাকে স্পর্শ করিল কিন্তু বিদ্ধ করিল না। তাই, কথা কহিলাম না সত্য, তথাপি আমার মন ওই রাজলক্ষ্মীকেই উদ্দেশ করিয়া ভিতরে ভিতরে বলিতে লাগিল, লক্ষ্মী, মানুষের কর্ম্মই কেবল অস্পৃশ্য ও অশুচি হয়, মানুষ হয় না। না হইলে পিয়ারী কিছুতেই আজ আবার লক্ষ্মীর আসনে ফিরিয়া আসিয়া বসিতে পারিত না। আর সে কেবল সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, মানুষকে কেবল-মাত্র মানুষের দেহ বলিয়া আমি কোন দিন ভুল করি নাই। সে পরীক্ষা আমার ছেলেবেলা হইতে বহুবার হইয়া গেছে। অথচ, এ সকল কথা মুখ ফুটিয়া তাহাকে বলিবারও যো নেই,—বলিবার প্রবৃত্তিও আর আমার নাই।

উভয়ে আহার সমাধা করিয়া উঠিলাম। রাজলক্ষ্মী আমাদের পান দিয়া বোধ করি নিজেও কিছু খাইতে গেল। কিন্তু আন্দাজ ঘন্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে নিজেও যেমন সাধুজীকে দেখিয়া আকাশ হইতে পড়িল, আমিও তেমনি বিস্মিত হইলাম। দেখি, ইতিমধ্যে কখন তিনি বাহিরে গিয়া একটা লোক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং ঔষধের সেই ভারি বাক্সটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিজেও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কাল এই কথাই ছিল বটে, কিন্তু আজ তাহা আমরা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম। মনেও করি নাই এই প্রবাসে রাজলক্ষ্মীর এত আদর যত্ন উপেক্ষা করিয়া সাধুজী অনিশ্চয় অন্যত্রের জন্য এমন সত্বর উন্মুখ হইয়া উঠিবেন। স্নেহের শৃঙ্খল এত সত্বর কাটিবার নয়, রাজলক্ষ্মীর নিভৃত মনের মধ্যে বোধ হয় এই আশাই ছিল,—সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি কি যাচ্ছো না কি আনন্দ?

সাধু বলিলেন, হাঁ দিদি, যাই। এখন না বেরুলে পৌছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

সেখানে কোথায় যাবে, কোথায় শোবে? আপনার লোক যে সেখানে কেউ নেই?

আগে ত গিয়ে পৌছই দিদি!

কবে ফিরবে?

সে তো এখন বলা যায় না। কাজের ভিড়ে যদি না এগিয়ে যাই ত একদিন ফিরতেও পারি।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, তার-পরে সে মাথার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে

একটি সংসারি জুড়ে বড় সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেচেন।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারিলনা, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, যাবার সময় সে কি তোমাকে কিছু বলে গেল?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না, তেমন কিছু নয়।

কেন যে একটুখানি সত্য গোপন করিলাম তাহা নিজেও জানিনা। কিন্তু বিদায়কালে সাধুজীর শেষ কথাটা তখন পর্য্যন্ত আমার কানে তেমনি বাজিতেছিল। যাবার সময় সেই যে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, বিচিত্র দেশ এই বাঙলা দেশটা! এর পথেঘাটে মা-বোন্,—সাধ্য কি তাঁদের ফাঁকি দিয়ে যাই!

ম্লান মুখে রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, আমারও মনের মধ্যে অনেকদিনের অনেক ভুলে-যাওয়া ঘটনা ধীরে ধীরে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম তাই বটে! তাই বটে! সাধুজী তুমি যেই হও, এই অল্প বয়সেই তোমার এই কাঙাল দেশটিকে তুমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছ। না হইলে ইহার যথার্থ রূপটির খবর এত এমন সংক্ষেপে এই কয়টি কথায় দিতে পারিতেনা! জানি, অনেকদিনের অনেক ত্রুটি অনেক বিচ্যুতি আমার মাতৃভূমির সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কালি লেপিয়াছে, তবুও, এ সত্য যাচাই করিবার যাহার সুযোগ মিলিয়াছে, সেই জানে ইহা কত বড় সত্য।

এই ভাবে নীরবে মিনিট দশ পোনর কাটিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, এই উদ্দেশ্যই যদি তার মনে থাকে, একদিন আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে আমি বলে দিচ্ছি। এ দেশে নিছক পরের ভাল করতে যাওয়ার দুর্গতি হয়ত সে আজও জানেনা। এর স্বাদ কতক আমি জানি। আমারই মত একদিন যখন সন্দেহে, বাধায়, কটুকথায় তার সমস্ত মন বিরক্তিরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে, তখনি সে পালিয়ে আস্‌বার পথ পাবেনা।

আমি সায় দিয়া কহিলাম, অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ সব দুঃখের কথা যেন সে বেশ জানে।

রাজলক্ষ্মী বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না। জান্‌লে সে পথে কেউ যাবেনা আমি বল্‌চি।

এ কথার আর জবাব ছিলনা। বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, একদিন ইহার অনেক সাধু সঙ্কল্প, অনেক পুণ্য কর্ম্ম তাহার শ্বশুরবাড়ীর দেশে অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিল। সেই নিষ্কাম পরোপকারের ব্যথা অনেকদিন ইহার মনে লাগিয়া ছিল। যদিচ, আরও একটা দিক দেখিবার ছিল, কিন্তু সেই অবলুপ্ত বেদনার স্থানটা চিহ্নিত করিয়া তুলিতেও আর প্রবৃত্তি হইলনা, তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ, রাজলক্ষ্মী যাহা বলিতেছিল তাহা মিথ্যা নয়। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হয়? কেন একের শুভ চেষ্টা অপরে এমন সন্দেহের চক্ষে দেখে? কেন এগুলি বিফল করিয়া দিয়া মানুষে সংসারে দুঃখের ভার লঘু করিতে দেয় না? মনে হইল সাধুজী যদি থাকিতেন কিম্বা যদি কখনো ফিরিয়া আসেন, এই জটিল সমস্যার মীমাংসার ভার তাঁকেই দিব।

সেদিন সকাল হইতে নিকটেই কোথা হইতে মাঝে মাঝে সানাইয়ের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, এই সময়ে জন কয়েক লোক রতনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। রতন সম্মুখে আসিয়া কহিল, মা, এরা আপনাকে রাজ-বরণ দিতে এসেছে। এসো না হে, দিয়ে যাওনা,—এই বলিয়া সে একজন প্রৌঢ় গোছের লোককে ইঙ্গিত করিল। লোকটির পরিধানে হরিদ্রারঙে ছোপানো একটি কাপড়, গলায় নূতন কাঠের মালা। সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিয়া বারান্দার নীচে হইতেই নূতন শালপাতায় একটি টাকা ও একটি সুপারি রাজলক্ষ্মীর পদতলের উদ্দেশে রাখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং কহিল, মা-ঠাকরুণ, আজ আমার মেয়ের বিয়ে।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল, এবং পুলকিত চিত্তে কহিল, মেয়ের বিয়েতে এই বুঝি দিতে হয়?

রতন কহিল, না মা তা নয়, যার যেমন সাধ্য সে তেমনি জমিদারকে দেয়,—এরা ছোট জাত, ডোম, এর বেশি আর কোথায় কি পাবে বলুন, এই কত কষ্টে—

কিন্তু নিবেদন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই টাকাটা ডোমের শুনিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, তবে থাক্ থাক্, এ-ও দিতে হবেনা,—তোমরা এমনিই মেয়ের বিয়ে দাও গে।

এই প্রত্যাখ্যানে কন্যার পিতা এবং ততোধিক রতন নিজে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠিল; সে নানা

প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, এই রাজ-বরণের সম্মানটা গ্রহণ না করিলে কোন মতেই চলিবে না। রাজলক্ষ্মী কেন যে ঐ সুপারি শুদ্ধ টাকাটা লইতে কিছুতেই চাহেনা, ঘরের ভিতরে বসিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম, এবং রতনই বা কি জন্য যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিল তাহাও আমার অবিদিত ছিলনা। খুব সম্ভব সেয় টাকাটা আরও বেশি এবং সমস্তা কুমারী মহাশয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই ইহারা এই কৌশল করিয়াছে; এবং রতন 'হুজুর' ইত্যাদি সম্ভাষণের পরিবর্ত্তে তাহাদের মুখপাত্র হইয়া আর্জি পেশ করিতে আসিয়াছে। সে যে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াই আনিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহার এই সঙ্কট অবশেষে আমিই মোচন করিলাম। উঠিয়া আসিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, আমি নিলাম, তোমরা বাড়ী গিয়ে বিয়ের উদ্যোগ করগে।

রতনের মুখ গর্ব্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং রাজলক্ষ্মী অস্পৃশ্যের প্রতিগ্রহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল। খুসি হইয়া কহিল, এ ভালই হল যে, যাঁর মান্য তিনি স্বহস্তে নিলেন, এই বলিয়া সে হাসিল।

মধু ডোম কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, হুজুর, পহর রেতের মধ্যেই লগ্‌ন, একবার যদি পায়ের ধূলো দেন। এই বলিয়া সে একবার আমার ও একবার রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি করুণ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

আমি সম্মত হইলাম, রাজলক্ষ্মী নিজেও একটু হাসিয়া সানাইয়ের শব্দটা আন্দাজ করিয়া বলিল, ওই বুঝি তোমার বাড়ী মধু? আচ্ছা, যদি সময় পাই ত আমিও গিয়ে একবার দেখে আসবো! রতনের প্রতি চাহিয়া কহিল, বড় তোরঙ্গটা খুলে দেখত রে, আমার নতুন শাড়ীগুলো আনা হয়েছে কি না? যা, মেয়েটিকে একখানা দিয়ে আয়! মিষ্টি বুঝি এ দেশে পাওয়া যায় না? বাতাসা মেলে? আচ্ছা তাই বেশ। অমনি তাও কিছু কিনে দিয়ে আসিস্ রতন। হাঁ, মধু তোমার মেয়ের বয়স কত? পাত্তরের বাড়ী কোথায়? লোক কতগুলি খাবে? এ গাঁয়ে ক'ঘর তোমরা আছ?

জমিদার গৃহিণীর একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে মধু সসম্ভ্রমে এবং সবিনয়ে যাহা কহিল তাহাতে বুঝা গেল তাহার কন্যার বয়স বছর নয়েকের মধ্যেই, পাত্র যুবা পুরুষ,—ত্রিশ চল্লিশের বেশি হইবেনা—বাড়ী ক্রোশ পাঁচেক উত্তরে কি একটা গ্রামে—সে একটা তাহাদের বড় সমাজ, সেখানে জাতীয় ব্যবসা কেহ করেনা—সকলেরই চাষ-বাস পেশা—মেয়ে বেশ সুখেই থাকিবে, তবে ভয় শুধু এই রাত্রিটার জন্য। কারণ, বরযাত্রীর সংখ্যা কত হইবে, এবং তাহারা কোথায় কি ফ্যাসাদ বাধাইয়া দিবে, তাহা আজ প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনমতেই অনুমান করিবার যো নাই। তাহারা সকলেই সমৃদ্ধ ব্যক্তি,—কি করিয়া যে মান-মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া শুভ-কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে এই ভয়েই মধু কাঁটা হইয়া আছে। এই সকল সবিস্তারে নিবেদন করিয়া সে পরিশেষে সকাতরে জানাইল যে, তাহার চিঁড়া গুড় এবং দধি সংগ্রহ হইয়াছে, এমন কি শেষকালে খান দুই করিয়া বড় বাতাসাও পাতে দিতে পারিবে; কিন্তু তথাপি যদি কোন গোলযোগ হয় ত তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে।

রাজলক্ষ্মী সকৌতুকে ভরসা দিয়া কহিল, গোলযোগ কিছু হবেনা, মধু, তোমার মেয়ের বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হবে আমি আশীর্ব্বাদ করচি; খাবার জিনিস এত জোগাড় করেচ, তোমার বেয়াইয়ের দল খেয়ে খুসি হয়ে বাড়ী যাবে।

মধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সঙ্গের লোক গুলিকে লইয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আশীর্ব্বচনের উপর বরাত দিয়া সে বিশেষ কোন সান্ত্বনা লাভ করিলনা; আজ রাত্রির জন্য কন্যার পিতার মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ লাগিয়া রহিল।

শুভকর্ম্মে পায়ের ধূলা দিব বলিয়া মধুকে আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই যাইতে হইবে এরূপ সম্ভাবনা বোধ করি আমাদের কাহারও মনে ছিলনা। সন্ধ্যার কিছু পরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার আয়ব্যয়ের একটা খসড়া পড়িয়া শুনাইতেছিল, আমি বিছানায় শুইয়া মুদ্রিত নেত্রে কতক বা শুনিতেছিলাম, কতক বা শুনিতেছিলামনা, কিন্তু অদূরে বিবাহ-বাটীর কলরোল কিছুক্ষণ হইতে যেন কিছু অসাধারণ রকমের প্রখর হইয়া কানে বাজিতেছিল। সহসা রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া সহাস্যে কহিল, ডোমের বাড়ীর বিয়ে, মারা-মারি এর একটা অঙ্গ নয় ত?

বলিলাম, উঁচু জাতের নকল যদি করে থাকে ত বিচিত্র নয়। সে সব কথা তোমার মনে আছে ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হুঁ। তারপরে ক্ষণকাল কান খাড়া করিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাস্তবিক, এ পোড়া দেশে যা' করে আমরা মেয়েদের বিলিয়ে দিই, তাতে ইতর-ভদ্র সবাই সমান। ওরা চলে গেলে আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম ওই যে কাল

সকালে ঐ ন'বছরের মেয়েটাকে কোন্ অপরিচিত সংসারে টেনে নিয়ে যাবে, আর কখনও হয়ত আস্‌তে পর্য্যন্ত দেবেনা। এদের নিয়মই এই। বাপ ছ'শো টাকায় মেয়েটাকে আজ বিক্রী করে দেবে। একবার পাঠিয়ে দাও, এ কথা মুখে আনবারও যো থাকবেনা। আহা! মেয়েটা সেখানে কতই না কাঁদবে,—বিয়ের সে কি জানে বল?

এ সকল দুর্ঘটনা ত জন্মকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, এক রকম সহিয়াও গেছে,—আর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেও প্রবৃত্তি হয়না। সুতরাং প্রত্যুত্তরে কেবল মৌন হইয়াই রহিলাম।

জবাব না পাইয়া সে কহিল, আমাদের দেশে ছোটবড় সব জাতের মধ্যেই বিয়েটা ত কেবল বিয়েই নয় এটা ধর্ম,—তাই ত, নইলে—

ভাবিলাম বলি, একে যদি ধর্ম বলিয়াই বুঝিয়াছ ত এত নালিশ কিসের? আর যে ধর্ম্মে-কর্ম্মে মন প্রসন্ন না হইয়া গ্লানির ভারে অন্তর কালো হইয়া উঠিতে থাকে, তাহাকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করাই যায় বা কিরূপে?

কিন্তু আমার বলিবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী নিজেই [illegible] কহিল, কিন্তু এ সব বিধি-ব্যবস্থা করে গেছেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি; শাস্ত্রবাক্য মিথ্যাও নয়, অমঙ্গলেরও নয়,—আমরা কি-ই বা জানি, আর কতটুকুই বা বুঝি!

বস্! যাহা বলিতে চহিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না। এ সংসারে যাহা কিছু ভাবিবার ছিল, সমস্তই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের জন্য বহুপূর্ব্বেই ভাবিয়া স্থির করিয়া দিয়া গেছেন, দুনিয়ায় নূতন করিয়া চিন্তা করিবার কোথাও কিছু বাকি নাই! এ কথা রাজলক্ষ্মীর মুখে এই নূতন শুনিলাম না, আরও অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, এবং বরাবরই চুপ করিয়া গেছি। আমি জানি ইহার জবাব দিতে গেলেই আলোচনাটা প্রথমে উষ্ণ এবং পরক্ষণেই ব্যক্তিগত কলহে নিরতিশয় তিক্ত হইয়া উঠে। ত্রিকালদর্শীদের আমি তাচ্ছল্য করিতেছিনা, রাজলক্ষ্মীর মত আমিও তাঁহাদের অতিশয় ভক্তি করি; শুধু এই কথাটাই ভাবি, তাঁহারা দয়া করিয়া যদি শুধু কেবল আমাদের এই ইংরাজি-আমলটার জন্য ভাবিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক দুরূহ চিন্তার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন, আমরাও হয় ত সত্যসত্যই আজ বাঁচিতে পারিতাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথাগুলা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কেমন করিয়া পাইত জানিনা, কিন্তু এখন এই অস্পষ্ট দীপালোকে আমার মুখের চেহারাটার প্রতি সে দৃষ্টিপাত করে নাই, তবুও যেন আমার নিগূঢ় চিন্তার ঠিক দ্বারপ্রান্তেই আঘাত করিল। কহিল, তুমি ভাব্‌চ, এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি,—ভবিষ্যতের বিধি ব্যবস্থা কেউ পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্দেশ করে দিতে পারে না। কিন্তু আমি বল্‌চি পারে। আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেচি, এ কাজ তাঁরা না পারলে সজীব মন্ত্রগুলোকেও কখনো দেখ্‌তে পেতেন না। বলি, এটা ত মানো আমাদের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলির প্রাণ আছে? তারা জীবন্ত?

বলিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি না মান্‌তে পারো, কিন্তু তবুও এ সত্য। তা' নইলে আমাদের দেশের এই পুতুল খেলার বিয়েই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ-বন্ধন হতে পারতনা! এ সমস্তই ত ওই সজীব মন্ত্রের জোরে! সেই ঋষিদের কৃপায়! অবশ্য, অনাচার পাপ আর কোথায় নেই, সে সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু আমাদের এ দেশের মত সতীত্বই কি তুমি আর কোথাও দেখাতে পারো?

বলিলাম, না। কারণ, এ তাহার যুক্তি নয় বিশ্বাস। ইতিহাসের প্রশ্ন হইলে তাহাকে দেখাইতে পারিতাম, এই পৃথিবীতে সজীব মন্ত্রহীন আরও দেশ আছে যথায় সতীত্বের আদর্শ আজও এমনিই উচ্চ। অভয়ার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারিতাম, এই যদি, তবে তোমাদের জীবন্ত মন্ত্র নর নারী উভয়কেই এক আদর্শে বাঁধিতে পারেনা কেন? কিন্তু এ সকলের প্রয়োজন ছিলনা। আমি জানিতাম তাহার চিত্তের ধারাটা কিছুদিন হইতেই কোন্ দিক দিয়া বহিতেছে।

দুর্গতির বেদনা সে ভাল করিয়াই জানে। যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহাকে কলুষিত না করিয়া কেমন করিয়া যে সে এ জীবনে লাভ করিবে, তাহার কিছুই সে ভাবিয়া পায়না। তাহার দুর্জ্জয় হৃদয় ও প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি—এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া এই দুঃখের জীবনে তাহার তীর্থের মত সুপবিত্র হইয়া উঠিবে সে তাহার কোন কিনারাই দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি পাই। নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া পর্য্যন্ত অপরের গোপন আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়তই আমার চোখে পড়ে। বেশ স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু তবু যেন দেখিতে পাই তাহার যে দুর্দ্দম কামনা এতদিন অত্যুগ্র নেশার মত তাহার

সমস্ত মনটাকে উত্তলা-উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল সে যেন আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার এই প্রাপ্তিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে। এই হিসাবের অঙ্কগুলায় কি আছে জানি না, কিন্তু শূন্য ছাড়া যদি আর কিছুই আজ আর সে না দেখিতে পায় ত, কেমন করিয়া কোথায় গিয়া যে আবার আমি নিজের এই শতছিন্ন জীবন-জালের গ্রন্থি বাঁধিতে বসিব এ চিন্তা আমার মধ্যেও বহুবার আনাগোনা করিয়া গেছে। ভাবিয়া কিছুই পাই নাই, কেবল এই কথাটাই নিশ্চয় করিয়া আছি যে, চিরদিন যে পথে চলিয়াছি, প্রয়োজন হয়ত আবার সেই পথেই যাত্রা সুরু করিব। নিজের সুখ ও সুবিধা লইয়া কাহারও সমস্যা জটিল করিয়া তুলিব না। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, যে মন্ত্রের সজীবতার আলোচনায় আমাদের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে বিপ্লব বহিয়া গেল, তাহারই প্রসঙ্গ লইয়া পাশের বাড়ীতেই যে তখন মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল, এ সংবাদ দু'জনের কেহই জানিতাম না।

অকস্মাৎ পাঁচ-সাতজন গোটাদুই আলো লইয়া অত্যন্ত সোরগোল করিয়া একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। এবং ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিল, হুজুর! বাবু মশায়!

আমি ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম, এবং রাজলক্ষ্মীও সবিস্ময়ে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নালিশটা তাহারা সকলেই একসঙ্গে সমস্বরে করিতে চায়। রতনের পুনঃপুনঃ বকুনি সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত কেহই চুপ করিতে পারিল না। যাই হোক, ব্যাপারটা বুঝা গেল। কন্যাসম্প্রদান বন্ধ হইয়া আছে, কারণ, মন্ত্র ভুল হইতেছে বলিয়া বরপক্ষীয় পুরোহিত কন্যাপক্ষীয় পুরোহিতের ফুল জল প্রভৃতি টান্ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। বাস্তবিক, এ কি অত্যাচার। পুরোহিত সম্প্রদায় অনেক কীর্ত্তিই করিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া জোর করিয়া আর একজন সম-ব্যবসায়ীর ফুল-জল প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া, এবং শারীরিক বল প্রয়োগে তাহার মুখ চাপিয়া স্বাধীন ও সজীব মন্ত্রোচ্চারণে বাধা দেওয়া—এমন অত্যাচার ত কখনও শুনি নাই।

রাজলক্ষ্মী কি যে বলিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু রতন ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল, সে বাহিরে আসিয়া মস্ত একটা ধমক্ দিয়া কহিল; তোদের আবার পুরুত কিরে? এখানে, অর্থাৎ জমিদারীতে আসিয়া পর্য্যন্ত সে, 'তুমি' বলিবার যোগ্য কাহাকেও পায় নাই, কহিল, তোর তোদেরদের আবার বি তাদের আবার পুরুত; এ কি আমাদের বা কায়েত-নবশাক পেয়েছিস্ যে বিয়ে দিতে আ বামুন ঠাকুর? এই বলিয়া সে বারবার আ ও রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি সগর্ব্বে চাহিতে লাগি এখানে, মনে করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে র জাতিতে নাপিত।

মধু-ডোম নিজে আসিতে পারে নাই, ক সম্প্রদানে বসিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধী আসিয়াছি সে ব্যক্তি যাহা বলিতে লাগিল তাহাতে যদিচ গেল ইহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরাই নিজে 'পুরোহিত,' তথাপি, রাখাল পণ্ডিত তাহা ব্রাহ্মণেরই সামিল। কারণ, তাহার গলায় পৈ আছে, এবং তাহাদের দশ কর্ম্ম করায়। এমন কি তাহাদের ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খায় না। সুত এতবড় সাত্বিকতার পরেও আর প্রতিবাদ চলে অতএব, আসল ও খাঁটি ব্রাহ্মণের সহিত অতঃপর কোন প্রভেদ থাকে ত সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর

সে যাই হোক, ইহাদের ব্যাকুলতায় ও আ বিবাহ-বাটীর প্রবল চীৎকার শব্দে আমাকে যা হইল। রাজলক্ষ্মীকে কহিলাম, তুমিও চল না, একলা কি করবে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে মাথা নাড়িল, কিন্তু কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিল না, চল আমার সঙ্গ লইল। আসিয়া দেখিলাম সম্বন্ধী অত্যুক্তি করে নাই। বিবাদ তুমুল উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। একদিকে বরপ প্রায় ত্রিশ বত্রিশ জন এবং অন্যদিকে ক পক্ষীয়ও প্রায় ততগুলি। মাঝখানে পাত্র ও শিবু পণ্ডিত দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী রাখাল পণ্ডিতে চাপিয়া ধরিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা সসম্মানে এ মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করিয়া শিবু-পণ্ডিত এই অতর্কিত আক্রমণের হেতু জিজ্ঞাসা করায় কহিল, হুজুর, মন্তরের ম জানেনা এই ব্যাটা, আব নিজেকে বলে পণ্ডিত! বিবাহটাই আজ ভেস্তে দিব রাখাল মুখ ভ্যাঙাইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, দিত! পাঁচখানা গাঁয়ে ছাদ্দ, বিয়ে নিত্যি দি আর আমি জানিনে মন্তর! মনে ভাবিলাম এখানে সেই মন্ত্র! কিন্তু বাটীতে রাজলক্ষ্মীর কাছে না মৌন থাকিয়াই তর্কের জবাব দিয়াছি, কিন্তু এখানে যদি যথার্থ-ই মধ্যস্থতা করিতে হয় ত বিপদে পড়িতে হইবে। অবশেষে বহু বাদবিতণ্ডায় স্থির হইল যে

রাখালই মন্ত্র পাঠ করাইবে, কিন্তু ভুল যদি কোথাও হয় ত শিবুকে আসন ছাড়িয়া দিতে হইবে। রাখাল রাজী হইয়া পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিল, এবং কন্যার পিতার হাতে কয়েকটা ফুল এবং বরকন্যার দুই হাত একত্র করিয়া দিয়া যে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিল তাহা আমার আজও মনে আছে। এগুলি সজীব কি না জানিনা এবং মন্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ হয় বেদে ঠিক এই কথাগুলিই ঋষিরা সৃষ্টি করিয়া যান নাই।

রাখাল পণ্ডিত বরকে বলিলেন, বল, মধু তোমায় কন্যায় নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু তোমায় কন্যায় নমঃ।

রাখাল কন্যাকে বলিলেন, বল ভগবতী তোমায় পুত্রায় নমঃ।

বালিকা কন্যার উচ্চারণে পাছে ত্রুটি হয় এই জন্য মধু তাহার হইয়া উচ্চারণ করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শিবু-পণ্ডিত দুই হাত তুলিয়া বজ্র-গর্জনে সকলকে চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, ও মন্তরই নয়! বিয়েই হলোনা! পিছনে একটা টান পাইয়া ফিরিয়া দেখি রাজলক্ষ্মী মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। এবং উপস্থিত সমস্ত লোকই একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া [illegible]য়াছে। রাখাল পণ্ডিত লজ্জিত মুখে কি একটা [illegible] গেল, কিন্তু, তাহার কথা কেহ কানেই [illegible]লনা, সকলেই সমস্বরে শিবুকে অনুনয় করিতে লাগিল, পণ্ডিত মশাই, মন্তরটি আপনিই বলিয়ে দিন, নইলে এ বিয়েই হবে না,—সব নষ্ট হয়ে যাবে। সিকি [illegible]ক্ষিণে ওঁকে দিয়ে আপনিই বারো আনা নেবেন [illegible]ত মশাই—

শিবু-পণ্ডিত তখন ঔদার্য দেখাইয়া কহিলেন, [illegible]লের দোষ-নেই, আসল মন্তর আমি ছাড়া এ [illegible] আর কেউ জানেই না। বেশি দক্ষিণে আমি চাইনে, আমি এইখান থেকেই মন্ত্রপাঠ করছি, রাখাল ওদের পড়াক্। এই বলিয়া সেই শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং পরাজিত রাখাল নিরীহ ভালমানুষটির মত বরকন্যাকে আবৃত্তি করাইতে লাগিল।

শিবু কহিলেন, বল, মধু, তোমার কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

বর আবৃত্তি করিল, মধু, তোমার কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ।

শিবু কহিলেন, মধু এবার তুমি বল, ভগবতী তোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ।

সকন্যা মধু ইহাই আবৃত্তি করিল। সকলেই নীরব, স্থির। ভাবে বোধ হইল শিবুর মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে এ অঞ্চলে পদার্পণ করে নাই।

শিবু বরের হাতে ফুল দিয়া কহিল, বিপিন, তুমি বল, যতদিন জীবনং ততদিন ভাত-কাপড় প্রদানং স্বাহা—

বিপিন থামিয়া থামিয়া বহু দুঃখে বহু সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

শিবু কহিলেন, বর-কন্যা দু'জনেই বল, যুগল মিলনং নমঃ।

বর এবং কন্যার হইয়া মধু ইহা আবৃত্তি করিল। ইহার পরে বিরাট হরিধ্বনি সহকারে বর-কন্যাকে বাটীর মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমার চতুষ্পার্শ্বে একটা গুঞ্জন রোল উঠিল, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে লাগিল যে হাঁ, একজন শাস্তর জানা লোক বটে! মন্তর পড়ালে বটে! রাখাল পণ্ডিত এতকাল আমাদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

সমস্ত ক্ষণ আমি গম্ভীর হইয়াই ছিলাম এবং শেষ পর্য্যন্ত এই অসীম গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াই রাজলক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। ওখানে কি করিয়া যে সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বসিয়া ছিল আমি জানিনা, কিন্তু ঘরে আসিয়া হাসির প্রবাহে তাহার যেন দম বন্ধ হইবার যো হইল। বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া সে কেবলই বলিতে লাগিল, হাঁ, একজন মহামহোপাধ্যায় বটে! রাখাল এতদিন এদের কেবল ঠকিয়েই খাচ্ছিল।

প্রথমটা আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, তাহার পরে কহিলাম, মহামহোপাধ্যায় দু'জনেই। অথচ, এম্‌নি কোরেই ত এতকাল এদের মেয়ের মা এবং মেয়ের ঠাকুরমার বিয়ে হয়েছে! রাখালের যাই হোক, শিবু-পণ্ডিতের মন্ত্রগুলোও অবিকৃত বাচ বলে মনে হোলো না, কিন্তু তবু ত এদের কোন মন্ত্রই বিফল হয়নি! এদের দেওয়া বিবাহ-বন্ধন ত আজও তেম্‌নি দৃঢ় তেম্‌নি অটুট আছে!

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া সহসা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, এবং একদৃষ্টে চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া কত কি যেন ভাবিতে লাগিল।

৬

সকালে উঠিয়া শুনিলাম কুশারী মহাশয় মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া গেছেন। ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি একা না কি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, না, আমিও আছি।

যাবে?

যাবো বই কি।

তাহার এই নিঃসঙ্কোচ উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। খাওয়া বস্তুটা যে হিন্দু-ধর্মের কি, এবং সমাজের কতখানি ইহার উপর নির্ভর করে রাজলক্ষ্মী তাহা জানে, এবং কতবড় নিষ্ঠার সহিত ইহাকে সে মানিয়া চলে আমিও তাহা জানি, অথচ এই তাহার জবাব। কুশারী মহাশয় সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না, তবে বাহির হইতে তাঁহাকে যতটা দেখা গিয়াছে, মনে হইয়াছে তিনি আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ। এবং ইহাও নিশ্চিত যে রাজলক্ষ্মীর ইতিহাস তিনি অবগত নহেন, কেবল মনিব বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া গেছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে আজ সেখানে গিয়া কি করিয়া কি করিবে আমিও ভাবিয়াই পাইলাম না। অথচ, আমার প্রশ্নটা বুঝিয়াও সে যখন কিছুই কহিল না, তখন ইহারই নিহিত-কুণ্ঠা আমাকেও নির্ব্বাক করিয়া রাখিল।

যথাসময়ে গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া।

কহিলাম, যাবেনা?

সে কহিল, যাবার জন্যেই ত দাঁড়িয়ে আছি। এই বলিয়া সে গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিল।

রতন সঙ্গে যাইবে, সে আমার পিছনে ছিল; ঠাকুরাণীর সাজ সজ্জা দেখিয়া সে যে নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিলাম। আমিও আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, কিন্তু সেও যেমন প্রকাশ করিল না, আমিও তেমনি নীরব হইয়া রহিলাম। বাড়ীতে সে কোন কালেই বেশি গহনা পরেনা, কিছুদিন হইতে তাহাও কমিতেছিল; কিন্তু আজ দেখা গেল গায়ে তাহার কিছুই প্রায় নাই। যে হারটা সচরাচর তাহার গলায় থাকে, সেইটি এবং হাতে একজোড়া বালা। ঠিক মনে নাই, তবুও যেন মনে হইল কাল রাত্রি পর্য্যন্ত যে চুড়ি কয়গাছি দেখিয়াছিলাম সেগুলিও যেন সে আজ ইচ্ছা করিয়াই খুলিয়া ফেলিয়াছে। পরণের কাপড়খানিও নিতান্ত সাধারণ, বোধ হয় সকালে স্নান করিয়া যাহা পরিয়াছিল তাহাই। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া আস্তে-আস্তে বলিলাম, একে একে যে সমস্তই ছাড়লে দেখ্‌চি। কেবল আমিই বাকি রয়ে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, এমন ত হ'তে পারে এই একটার মধ্যেই সমস্ত রয়ে গেছে। তাই যেগুলো বাড়[ি] ছিল সেই-গুলোই একে-একে ঝরে যাচ্ছে। এ[ই] বলিয়া সে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিল, রত[ন] কাছাকাছি আছে কিনা; তার পরে গাড়োয়ানটা না শুনিতে পায় এমনি অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, বে[শ] ত, সে আশীর্ব্বাদই করনা তুমি। তোমার বড় আ[র] ত আমার কিছুই নেই, তোমাকেও যার বদ[লে] অনায়াসে দিতে পারি আমাকে সেই আশীর্ব্বাদ তুমি কর।

চুপ করিয়া রহিলাম। কথাটা এমন একদিকে চলিয়া গেল, যাহার জবাব দিবার কোন সাধ্য আমার ছিল না। সেও আর কিছু না বলিয়া মোট[া] বালিশটা টানিয়া লইয়া গুটি-সুটি হইয়া আমা[র] পায়ের কাছে শুইয়া পড়িল। আমাদের গঙ্গামা[টি] হইতে পোড়ামাটিতে যাইবার একটা অত্যন্ত সোজ[া] পথ আছে। সম্মুখের শুষ্ক-জল খাদটার উপরে ... সঙ্কীর্ণ বাঁশের সাঁকো আছে, তাহার উপর দিয়া গেলে মিনিট দশেকের মধ্যেই যাওয়া যায়, কিন্তু গোরু[র] গাড়ীতে অনেকখানি রাস্তা ঘুরিয়া ঘণ্টা দুই বিল[ম্বে] পৌঁছিতে হয়। এই দীর্ঘ পথটায় দু'জনের মধ্যে আ[র] কোন কথাই হইলনা। সে কেবল আমার হাতখা[না] তাহার গলার কাছে টানিয়া লইয়া [illegible] করিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

কুশারী মহাশয়ের দ্বারে আসিয়া যখন গো[রুর গাড়ী] থামিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। ক[ুশারী] এবং গৃহিণী উভয়েই একসঙ্গে বাহির হইয়া আমাদে[র] অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং অতি[শয়] সম্মানিত অতিথি বলিয়াই বোধ হয় সদরে না বসাই[য়া] একেবারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তা ছাড়া, অল্প [বি]লম্বেই বুঝা গেল সহর হইতে দূরবর্ত্তী এই ... সামান্য পল্লী-অঞ্চলে অবরোধের সেরূপ কঠোর ... প্রচলিত নাই। কারণ, আমাদের শুভাগমন প্রচারি[ত] হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের অনেকেই যাহারা খুড়া, জ্যাঠা, মাসিমা ইত্যাদি প্রীতি ও আত্মী[য়] সম্বোধনে কুশারী ও তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিয়া একে-একে, দুইয়ে-দুইয়ে প্রবেশ করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলেই অবলা নহেন। রাজলক্ষ্মীর ঘোমটা দিবার অভ্যাস ছিলনা, সেও আমারই মত সম্মুখের বারান্দায় একখানি আসনের উপর বসিয়া ছিল; এই অপরিচিত রমণীর সাক্ষাতেও এই অনাহূতের দল বিশেষ কোন সঙ্কোচ অনুভব করিলেননা। তবে সৌভাগ্য এইটুকু যে আলাপ করিবার ঔৎসুক্যটা নিতান্তই

াহার প্রতি না হইয়া আমার প্রতিই প্রদর্শিত ইতে লাগিল। কর্ত্তা অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার হ্মণীও তেমনি, কেবল বিধবা মেয়েটিই রাজলক্ষ্মীর াশে স্থির হইয়া বসিয়া একটা তাল-পাখা লইয়া াহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিল। আর ামি কেমন আছি, কি অসুখ, কতদিন থাকিব, শটা ভাল মনে হইতেছে কিনা, জমিদারী াজে না দেখিলে চুরি হয় কিনা, ইহার নূতন কোন ন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি কিনা, ত্যাদি অর্থ ও ব্যর্থ নানাবিধ প্রশ্নোত্তর-মালার াকে-ফাঁকে কুশারী মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থাটা কটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। বাটীতে নেকগুলি ঘর, এবং সেগুলি মাটির; তথাপি মনে ল কাশীনাথ কুশারীর অবস্থা সচ্ছল ত বটেই, াধ হয় একটু বিশেষ রকমই ভাল। প্রবেশ রিবার সময় বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের একধারে একটা নের মরাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলাম, ভিতরের াঙ্গণেও দেখিলাম তেমনি আরও গোটা দুই ইয়াছে। ঠিক সম্মুখেই বোধ করি ওটা রান্নাঘরই বে, তাহারই উত্তরে একটা চালার মধ্যে পাশাপাশি টা-দুই ঢেঁকি, বোধ হইল অনতিকাল পূর্ব্বেই [illegible] কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। একটা [illegible]-বৃক্ষতলে ধান সিদ্ধ করিবার কয়েকটা চুলী [illegible] করিতেছে এবং সেই পঙ্কি [illegible]ক্ষানটুকুর উপরে ছায়াতলে দু'টি পরিপুষ্ট গো-স ঘাড় কাৎ করিয়া আরামে নিদ্রা দিতেছে। াদের মায়েরা কোথায় বাঁধা আছে চোখে ানা, সত্য, কিন্তু এটা বুঝা গেল কুশারী-[illegible]রে অন্নের মত দুধেরও বিশেষ কোন অনাটন [illegible] দিকের বারান্দায় দেয়াল ঘেঁসিয়া ছয় সাতটা [illegible] মাটির কলসী বিড়ার উপর বসানো আছে। [illegible] গুড় আছে, কি, কি আছে জানিনা, কিন্তু যত্ন খিয়া মনে হইলনা যে, তাহারা শূন্যগর্ভ কিম্বা হেলার বস্তু। কয়েকটা খুঁটির গায়েই দেখিলাম রা সমেত পাট এবং শণের গোছা বাঁধা রহিয়াছে,— তরাং বাটীতে যে বিস্তর দড়ি-দড়ার আবশ্যক হয়, া অনুমান করা অসঙ্গত জ্ঞান করিলাম না। শারী-গৃহিণী খুব সম্ভব আমাদের অভ্যর্থনার কাজেই দ্র নিযুক্তা,—কর্ত্তাটিও একবার মাত্র দেখা দিয়াই র্দ্ধান করিয়াছিলেন; তিনি অকস্মাৎ ব্যস্ত-সমস্ত য়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ রিয়া অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ আর একপ্রকারে দিয়া লেন, মা, এইবার যাই, আহ্নিকটা সেরে এসে একেবারে বসি। বছর পনর ষোলর একটি সুন্দর সবলকায় ছেলে উঠানের একধারে দাঁড়াইয়া গভীর মনোযোগের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল; কুশারী মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার প্রতি পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, বাবা হরিপদ, নারায়ণের অন্ন বোধ করি এতক্ষণে প্রস্তুত হল, একবার ভোগটি দিয়ে এসোগে বাবা। আহ্নিকের বাকিটুকু শেষ করতে আর আমার দেরী হবে না। আমার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আজ মিছাই আপনাদের কষ্ট দিলাম—বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া আমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আর দেরী না করিয়া চক্ষের পলকে নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এইবার যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পরে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঠাঁই করার খবর পৌঁছিল। বাঁচা গেল। কেবল অতিরিক্ত বেলার জন্য নয়, এইবার আগন্তুকগণের প্রশ্নবাণের বিরতি অনুভব করিয়াই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অব্যাহতি দিয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিন্তু খাইতে বসিলাম কেবল আমি একা। কুশারী মহাশয় সঙ্গে বসিলেন না, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। হেতুটা তিনি সবিনয়ে এবং সগৌরবে নিজেই ব্যক্ত করিলেন। উপবীত ধারণের দিন হইতে ভোজনকালে সেই যে মৌনী হইয়াছিলেন, সে ব্রত আজও ভঙ্গ করেন নাই; সুতরাং একাকী নির্জ্জন গৃহে এই কাজটা তিনি এখনও সম্পন্ন করেন। আপত্তিও করিলাম না আশ্চর্য্যও হইলাম না। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে [illegible] শুনিলাম আজ তাহারও নাকি কি একটা ব্রত [illegible], —পরান্ন গ্রহণ করিবেনা, তখনও আশ্চর্য্য হই নাই, এই ছলনায় মনে-মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, এবং ইহার কি যে প্রয়োজন ছিল তাহা ভাবিয়া পাইলামনা। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আমার মনের কথা চক্ষের পলকে বুঝিয়া লইয়া কহিল, তার জন্যে তুমি দুঃখ কোরোনা, ভাল করে খাও। আমি যে আজ খাবোনা, এঁরা সবাই জানতেন।

বলিলাম, অথচ, আমি জানতামনা। কিন্তু এই যদি, কষ্ট স্বীকার করে আসার কি আবশ্যক ছিল?

ইহার উত্তর রাজলক্ষ্মী দিলনা, দিলেন কুশারী-গৃহিণী। কহিলেন, এ কষ্ট আমিই স্বীকার করিয়েছি বাবা। মা যে এখানে খাবেন না তা' জানতাম; তবু আমরা যাঁদের দয়ায় দু'টি অন্ন পাই, তাঁদের

পায়ের ধূলো বাড়ীতে পড়বে এ লোভ সামলাতে পারলাম না। কি বল মা? এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিলেন। রাজলক্ষ্মী বলিল, এর জবাব আজ নয় মা, আর একদিন আপনাকে দেব। এই বলিয়া সে হাসিল।

আমি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কুশারী-গৃহিণীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিলাম। পল্লীগ্রামে, বিশেষ এইরূপ সুদূর পল্লীতে ঠিক এমনি সহজ সুন্দর কথাগুলি যেন কোন রমণীর মুখেই শুনিবার কল্পনা করি নাই। কিন্তু এখনও যে এই পল্লী-অঞ্চলেই আরও একটি ঢের বেশি আশ্চর্য্য নারীর পরিচয় পাইতে বাকি ছিল, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার পরিবেশনের ভার বিধবা কন্যার উপর অর্পণ করিয়া কুশারী-গৃহিণী তালপাখা হাতে আমার সুমুখে বসিয়াছিলেন। বোধ হয় বয়সে আমার অনেক বড় হইবেন বলিয়াই মাথার উপর অঞ্চলখানি ছাড়া মুখে কোন আবরণ ছিল না। তাহা সুন্দর কিম্বা অসুন্দর, মনেই হইল না, কেবল এইটুকুই মনে হইল ইহা সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। দ্বারের কাছে কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাহির হইতে তাঁহার মেয়ে ডাকিয়া কহিল, বাবা, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। বেলা অনেক হইয়াছিল, এবং এই খবরটুকুর জন্যই বোধ হয় তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তথাপি একবার বাহিরে ও একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এখন একটু থাক্ মা, বাবুর খাওয়াটা—

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না তুমি যাও, মিথ্যে ওসব নষ্ট কোরোনা। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার খাওয়া হয় না আমি জানি।

কুশারী সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, কহিলেন, নষ্ট আর কি হবে,—বাবুর খাওয়াটা হয়েই যাক্‌না।

গৃহিণী কহিলেন, আমি থাকতেও যদি খাওয়ার ত্রুটি হয় ত তোমার দাঁড়িয়ে থাকলেও সারবেনা। তুমি যাও,—কি বল বাবা? এই বলিয়া তিনি আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। আমিও হাসিয়া বলিলাম, হয়ত বা ত্রুটি বাড়বে। আপনি যান কুশারী মশায়, অমন অভুক্ত চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন পক্ষেই সুবিধে হবে না। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনে হইল সম্মানিত অতিথির আহারের স্থানে উপস্থিত না থাকিবার সঙ্কোচটা সঙ্গে লইয়াই গেলেন। কিন্তু এইটাই যে আমার মস্ত ভুল হইয়াছিল তাহা কিছুক্ষণ পরেই আর অবিদিত রইল না। তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, নিরিমিষ আলো চালের ভাত খান; জুড়িয়ে গেলে আর খাওয়াই হয়না, তাই জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাও বলি বাবা, যাঁরা অন্নদাতা তাঁদের পূর্ব্বে নিজের বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করাও বড় কঠিন।

কথাটায় মনে মনে আমার লজ্জা করিতে লাগিল, বলিলাম, অন্নদাতা আমি নয়। কিন্তু, তাও যদি সত্য হয়, সেটুকু এত কম যে এটুকু বাদ গেলে বোধ করি আপনারা টেরও পেতেন না।

কুশারী-গৃহিণী ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানি ধীরে ধীরে যেন অতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। তার পরে কহিলেন, তোমার কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয় বাবা, ভগবান আমাদের কিছু কম দেননি, কিন্তু এখন মনে হয় এত যদি তিনি নাই দিতেন, হয়ত, এর চেয়ে তাঁর বেশি দয়াই প্রকাশ পেত। বাড়ীতে ওই ত কেবল একটা বিধবা মেয়ে,—কি হবে আমাদের গোলা-ভরা ধানে, কড়া-ভরা দুধে, আর কলসী কলসী গুড় নিয়ে? এ সব ভোগ করবার যারা ছিল, তারা ত আমাদের ত্যাগ করেই চলে গেছে।

কথাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ ছলছল্ করিয়া আসিল এবং ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, অনেক গভীর বেদনাই এই কয়টি কথার মধ্যে নিহিত আছে এবং ভাবিলাম, হয়ত তাঁহার কোন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, এবং ওই যে ছেলেটিকে ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তাহাকে অবলম্বন করিয়া হতভাগ্য পিতামাতা আর কোন সান্ত্বনাই পাইতেছেন না। আমি নীরব হইয়া রহিলাম, রাজলক্ষ্মীও কোন কথা না কহিয়া কেবল তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আমারই মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিল তাঁহার পরের কথায়। তিনি আপনাকে আপনি সম্বরণ করিয়া লইয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমাদের মত তাদেরও ত তোমরাই অন্নদাতা। কর্ত্তাকে বল্‌লাম, মনিবকে দুঃখের কথা জানাতে লজ্জা নেই, আমাদের মাকে বাবাকে নিমন্ত্রণের ছল করে একবার ধরে আনো, আমি তাঁদের কাছে কেঁদে-কেটে দেখি যদি তাঁরা এর কোন বিহিত করে দিতে পারেন। এই বলিয়া এইবার তিনি অঞ্চল তুলিয়া নিজের অশ্রুজল মোচন করিলেন। সমস্তা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম সেও

আমারই মত সংশয়ে পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্বের মত এখনও দুজনে মৌন হইয়া রহিলাম। কুশারী-গৃহিণী এইবার তাঁহাদের দুঃখের ইতিহাস ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া বহুক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা বাহির হইল না, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ রহিলনা যে, এ কথা বিবৃত করিয়া বলিতে ঠিক এতখানি ভূমিকারই প্রয়োজন ছিল। রাজলক্ষ্মী পরান্ন গ্রহণ করিবেনা শুনিয়াও এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ হইতে সুরু করিয়া কর্ত্তাটিকে অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেওয়া চলিতনা। কিন্তু সে যাই হোক, কুশারী-গৃহিণী তাঁহার চক্ষের জল ও অস্ফুট বাক্যের ভিতর দিয়া ঠিক কতখানি যে ব্যক্ত করিলেন, তাহা জানিনা, এবং ইহার কতখানি যে সত্য তাহাও একপক্ষ শুনিয়া নিশ্চয় করা কঠিন; কিন্তু আমাদের মধ্যস্থতায় যে সমস্যা আজ তাঁহারা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে সনির্ব্বন্ধ আবেদন করিলেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর ও তেমনি কঠোর।

কুশারী-গৃহিণী যে দুঃখের ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন তাহার মোট কথাটা এই যে, গৃহে তাঁহাদের খাওয়া-পরার যথেষ্ট সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও শুধু যে কেবল সংসারটাই তাঁহাদের বিষ হইয়া গেছে তাই নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁহারা লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছেননা এবং সমস্ত দুঃখের মূল হইতেছে তাঁহার একমাত্র ছোট যা সুনন্দা। এবং যদিচ তাঁহার দেবর যদুনাথ ন্যায়রত্নও তাঁহাদের কম শত্রুতা করেন নাই, কিন্তু আসল অভিযোগটা তাঁহার সেই সুনন্দার বিরুদ্ধে। এবং এই বিদ্রোহী সুনন্দা ও তাহার স্বামী যখন সম্প্রতি আমাদেরই প্রজা, তখন যেমন করিয়াই হোক ইহাদের বশ করিতেই হইবে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এইরূপ। তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী যখন স্বর্গগত হন তখন তিনি এ বাটীর বধূ। যদু কেবল ছয় সাত বছরের বালক। এই বালকটিকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহারই উপরে পড়ে এবং সেদিন পর্য্যন্ত এ ভার তিনি বহন করিয়াই আসিয়াছেন। পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে একখানি মাটীর ঘর, বিঘা দুই তিন ব্রহ্মোত্তর জমী এবং ঘর কয়েক যজমান। মাত্র এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার স্বামীকে সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে হয়। আজ এই যে প্রাচুর্য্য, এই যে সচ্ছলতা, এ সকল সমস্তই তাঁহার স্বকৃত উপার্জ্জনের ফল। ঠাকুরপো কোন সাহায্যই করেন নাই, সাহায্য কখনও তাহার কাছে প্রার্থনাও করা হয় নাই।

আমি কহিলাম, এখন বুঝি তিনি অনেক দাবী করিতেছেন?

কুশারী-গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, দাবী কিসের বাবা, এ তো সমস্তই তার। সমস্তই সে নিত, সুনন্দা যদি না মাঝে পড়ে আমার সোণার সংসার ছার খার করে দিত।

আমি কথাটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আপনার এই ছেলেটি।

তিনিও প্রথমটা বুঝিতে পারিলেননা, পরে বুঝিয়া বলিলেন, ওই বিজয়ের কথা বোল্‌চ? ও ত আমাদের ছেলে নয় বাবা, ও একটি ছাত্র। ঠাকুরপোর টোলে পড়ত, এখনও তার কাছেই পড়ে, শুধু আমার কাছে থাকে। এই বলিয়া তিনি বিজয়-সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিয়া কহিতে লাগিলেন, কত দুঃখে যে ঠাকুরপোকে মানুষ করি, সে শুধু ভগবান জানেন এবং পাড়ার লোকেও কিছু কিছু জানে। কিন্তু নিজে সে আজ সমস্ত ভুলেচে, শুধু আমরাই ভুল্‌তে পারিনি। এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু সে সব যাক্ বাবা, সে অনেক কথা। আমি ঠাকুরপোর পৈতে দিলাম, কর্ত্তা তাকে পড়ার জন্যে মিহিরপুরে শিবু তর্কালঙ্কারের টোলে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা, ছেলেটাকে ছেড়ে থাকিতে পারিনি বলে আমি নিজে কতদিন গিয়ে মিহিরপুরে বাস করে এসেছি,—সে আজ আর তার মনে পড়েনা। যাক,—এমন করে কত বছরই না কেটে গেল। ঠাকুরপোর পড়া সাঙ্গ হল, কর্ত্তা তাকে সংসারী করবার জন্যে মেয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লেন: এমন সময়ে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে সুনন্দাকে বিয়ে করে এনে উপস্থিত। আমাকে না বলুক বাবা, অমন দাদার পর্য্যন্ত একটা মত নিলেনা।

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মত না নেওয়ার কি বিশেষ কারণ ছিল?

গৃহিণী কহিলেন, ছিল বই কি। ওরা আমাদের ঠিক স্ব-ঘরও নয়, কুল-শীলে মানেও ঢের ছোট। কর্ত্তা রাগ করলেন, দুঃখে লজ্জায় বোধ করি এমন মাসখানেক কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কইলেন না; কিন্তু আমি রাগ করিনি। সুনন্দার মুখখানি দেখেই প্রথম থেকেই যেন গলে গেলাম। তার ওপর যখন শুন্‌তে পেলাম, তার মা মারা গেছে, বাপ ঠাকুরপোর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে সন্ন্যাসী হ'

বেরিয়ে গেছেন, তখন ওই ছোট মেয়েটিকে পেয়ে আমার কি যে হোল তা' তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবনা। কিন্তু সে যে একদিন তার এত শোধ দেবে, এ কথা তখন কে ভেবেছিল? এই বলিয়া তিনি হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বুঝিলাম এইখানে ব্যথাটা অতিশয় তীব্র; কিন্তু নীরবে রহিলাম। রাজলক্ষ্মীও এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁরা কোথায়?

প্রত্যুত্তরে তিনি ঘাড় নাড়িয়া যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে বুঝা গেল ইঁহারা আজও এই গ্রামেই আছেন। ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা হইল না, তাঁহার সুস্থ হইতে একটু বেশি সময় গেল। কিন্তু আসল বস্তুটা এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝাই গেল না। এ দিকে আমার খাওয়াটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কারণ কান্নাকাটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। সহসা তিনি চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, এবং আমার থালার দিকে চাহিয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থাক্ বাবা, সমস্ত দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে শেষও হবে না, তোমাদেরও ধৈর্য্য থাকবেনা। আমার সোণার সংসার যারা চোখে দেখেচে, কেবল তারাই জানে ছোট বৌ আমার কি সর্ব্বনাশ করে গেছে। কেবল সেই লঙ্কাকাণ্ডটাই তোমাদের সংক্ষেপে বল্‌ব।

যে সম্পত্তিটার উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর, সেটা এক সময়ে একজন তাঁতির ছিল। বছরখানেক পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন সকালে তার বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেটিকে সঙ্গে করে বাড়ীতে এসে উপস্থিত। রাগ করে কত কি যে বলে গেল তার ঠিকানা নেই, হয়ত তার কিছুই সত্য নয়, হয়ত তার সমস্তই মিথ্যে,—ছোট বৌ স্নান করে যাচ্ছিল রান্নাঘরে; সে যেন সেই সব শুনে একেবারে পাথর হয়ে গেল। তারা চলে গেলেও তার সে ভাব আর ঘুচতে চাইলেনা। আমি ডেকে বোল্‌লাম, সুনন্দা দাঁড়িয়ে রইলি, বেলা হয়ে যাচ্চেনা? কিন্তু, জবাবের জন্য তার মুখের পানে চেয়ে আমার ভয় হ'ল! তার চোখের চাহনিতে কিসের যেন একটা আলো ঠিক্‌রে পড়চে, কিন্তু শ্যামবর্ণ মুখখানি একেবারে ফ্যাকাশে,—বিবর্ণ। তাঁতি-বউয়ের প্রত্যেক কথাটি যেন বিন্দু বিন্দু করে তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। সে তখ্‌খনি আমায় জবাব দিলেনা, কিন্তু আস্তে আস্তে কাছে এসে বললে, দিদি, তাঁতি-বৌ'কে তার স্বামীর বিষয় তোমরা ফিরিয়ে দেবেনা। তার ঐটুকু নাবালক ছেলেকে তোমরা সর্ব্বস্ব বঞ্চিত করে সারাজীবন পথের ভিখারী করে রাখ্‌বে?

আশ্চর্য্য হয়ে বোল্‌লাম, শোন কথা একবার! কানাই বসাকের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেলে, ইনি কিনে নিয়েছেন। নিজের কেনা বিষয় কে কবে পরকে ছেড়ে দেয় ছোট-বৌ?

ছোট-বৌ বল্‌লে, কিন্তু বঠ্‌ঠাকুর এত টাকা পেলেন কোথায়?

রাগ করে জবাব দিলাম, সে কথা জিজ্ঞাসা করগে যা তোর বঠ্‌ঠাকুরকে—বিষয় যে কিনেছে। এই বলে আহ্নিক করতে চলে গেলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সত্যই ত। যে বিষয় নিলাম হয়ে বিক্রী হয়ে গেছে তা ফিরিয়ে দিতেই বা ছোট-বৌ বলে কি করে?

কুশারী-গৃহিণী কহিলেন, বল ত বাছা। কিন্তু এ কথা বলা সত্ত্বেও তাঁহার মুখের উপর লজ্জার যেন একটা কালো ছায়া পড়িল। কহিলেন, তবে, ঠিক নিলাম হয়েই ত বিক্রী হয়নি কি না তাই। আমরা হোলাম তাদের পুরুত-বংশ। কানাই বসাক মৃত্যুকালে এঁর ওপরেই সমস্ত ভার দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন ত আর ইনি জানতেন না, সেই সুজে একরাশ দেনাও রেখে গিয়েছিল!

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমি উভয়েই কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কি যেন একটা নোঙ্‌রা জিনিস আমার মনের ভিতরটা এক মুহূর্ত্তেই একেবারে মলিন করিয়া দিয়া গেল। কুশারী-গৃহিণী বোধ করি ইহা লক্ষ্য করিলেননা। বলিলেন, জপ, আহ্নিক সমস্ত সেরে ঘণ্টা দুই পরে ফিরে এসে দেখি সুনন্দা সেইখানে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে। কোথাও একটা পা পর্য্যন্ত বাড়ায়নি। কর্ত্তা কাছারি সেরে এখুনি এসে পড়বেন, ঠাকুরপো বিনুকে নিয়ে আমার দেখ্‌তে গেছে, তারও ফিরতে দেরি নেই, [illegible] নাইতে গেছে, এখুনি এসে ঠাকুর পূজায় বস্‌বে,—রাগের পরিসীমা রইল না, বোল্‌লাম, তুই কি রান্নাঘরে আজ আর ঢুক্‌বিনে? ওই বজ্জাত তাঁতি-বেটীর ছেঁড়া কথা নিয়েই সারাদিন বসে থাক্‌বি?

সুনন্দা মুখ তুলে বল্‌লে, না দিদি, যে বিষয় আমাদের নয়, সে যদি তোমরা ফিরিয়ে না দাও ত আর আমি রান্নাঘরে ঢুক্‌বোনা। ওই নাবালক ছেলেটার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমার স্বামী পুত্রকেও খাওয়াতে পারবনা, ঠাকুরের ভোগ রেঁধেও দিতে পারবনা। এই বলে সে তার নিজের

ঘরে চলে গেল। সুনন্দাকে আমি চিনতাম। সে যে মিথ্যা কথা বলে না, সে যে তার অধ্যাপক সন্ন্যাসী বাপের কাছে ছেলেবেলা থেকে অনেক শাস্ত্র পড়েচে, তাও জানতাম ; কিন্তু সে যে মেয়েমানুষ হয়েও এমন পাষাণ-কঠিন হতে পারবে তাই কেবল তখনো জানতামনা। আমি তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধতে গেলাম, পুরুষরা সব বাড়ী ফিরে এলেন—কর্ত্তার খাবার সময় সুনন্দা দরজার বাহিরে এসে দাঁড়াল। আমি দূর থেকে হাত জোড় করে বোল্‌লাম, সুনন্দা, একটু ক্ষমা দে, ওঁর খাওয়াটা হয়ে যাক্। সে এটুকু অনুরোধও রাখলেনা। গণ্ডূষ করে খেতে বসছিলেন, জিজ্ঞাসা করলে, তাঁতিদের সম্পত্তি কি আপনি টাকা দিয়ে নিয়েছিলেন? ঠাকুর ত কিছুই রেখে যাননি, এ তো আপনাদের মুখেই অনেকবার শুনেচি, তবে, এত টাকা পেলেন কোথায়?

যে কখনো কথা কয়না, তার মুখে এই প্রশ্ন শুনে কর্ত্তা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, তার পরে বল্লেন, এ সব কথার মানে কি বউমা?

সুনন্দা উত্তর দিলে, এর মানে যদি কেউ জানে ত সে আপনি। আজ তাঁতি বউ তার ছেলে নিয়ে এসেছিল, তার সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি করা আপনার কাছে নিষ্প্রয়োজন,—কিছুই আপনার অজানা নেই। এ বিষয় যার তাকে ফিরিয়ে না দেন, ত, আমি বেঁচে থেকে এই মহাপাপের একটা অন্নও আমার স্বামি-পুত্রকে খেতে দিতে পারবনা।

আমার মনে হল বাবা, হয় আমি স্বপন দেখচি, না হয় সুনন্দাকে ভূতে পেয়েচে। যে ভাশুরকে সে দেবতার বেশি ভক্তি করে, তাঁকেই এই কথা! উনি খানিকক্ষণ কাঠপুত্তলের মত বসে রইলেন ; তার পরে জলে উঠে বল্লেন, বিষয় পাপের হোক্ পুণ্যের হোক্, সে আমার, তোমার স্বামি-পুত্রের নয়। তোমাদের না পোষায়, তোমরা আর কোথাও যেতে পারো! কিন্তু বউমা, তোমাকে চিরকাল সর্ব্বগুণময়ী বলেই জানতাম, কখনো এমন ভাবিনি। এই বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। সে দিন সমস্ত দিন আর কারও মুখে ভাত জল গেলনা। কেঁদে গিয়ে ঠাকুরপোর কাছে পড়লাম ; বোল্‌লাম, ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি কোলে করে মানুষ করেছি,—তার এই প্রতিফল! ঠাকুরপোর চোখ দু'টো জলে ভরে গেল, বল্লে, বৌঠান্, তুমিই আমা'র মা, দাদাও আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু তোমাদেরও বড় যে, সে ধর্ম্ম। আমারও বিশ্বাস সুনন্দা একটা কথাও অন্যায় বলেনি। শ্বশুর মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণের দিন তাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, মা, ধর্ম্মকে যদি সত্যিই চাও, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমি তাকে এতটুকু বয়স থেকে চিনি বৌঠান, সে কখখনো ভুল করেনি।

হারে, পোড়া কপাল! তাকেও যে পোড়ারমুখী ভেতরে ভেতরে এত বশ করে রেখেছিল, আজ আমার তার চোখ খুল্‌ল। সে দিন ভাদ্রের সংক্রান্তি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—থেকে থেকে ঝর্ ঝর্ জল পড়চে, কিন্তু হতভাগী একটা রাত্তির জন্যেও আমাদের মুখ রাখলেনা, ছেলের হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আমার শ্বশুরের কালের একঘর প্রজা মরে হেজে বছর দুই হল চলে গেছে, তাদেরই ভাঙা ঘর একখানি তখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল ; শিয়াল-কুকুর সাপ-ব্যাঙের সঙ্গে তাতেই গিয়ে এই দুর্দ্দিনে আশ্রয় নিলে। উঠনের জল-কাদা-মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলাম, সর্ব্বনাশী, এই যদি তোর মনে ছিল, এ-সংসারে ঢুকেছিলি কেন? বিনুকে পর্য্যন্ত যে নিয়ে চল্‌লি, তুই কি শ্বশুর-কুলের নামটা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকতে দিবিনে প্রতিজ্ঞা করেছিস? কিন্তু কোন উত্তর দিলে না। বোল্‌লাম, খাবি কি? জবাব দিলে, ঠাকুর যে তিন বিঘে ব্রহ্মোত্তর রেখে গেছেন, তার অর্দ্ধেকটাও ত আমাদের। কথা শুনে মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছা হ'ল ; বোল্‌লাম, হতভাগী, তাতে যে একটা দিনও চল্‌বে না। তোরা না হয় না খেয়ে মর্‌তে পারিস্, কিন্তু আমার বিনু? বল্লে, একবার কানাই বসাকের ছেলের কথা ভেবে দেখ দিদি। তার মত একবেলা এক সন্ধ্যে খেয়েও যদি বিনু বাঁচে, ত সেই ঢের!

তারা চলে গেল। সমস্ত বাড়ীটা যেন হাহাকার করে কাঁদতে লাগল। সে রাত্রিতে আলো জ্বল্‌ল না, হাঁড়ি চড়ল না ; কর্ত্তা অনেক রাত্রে ফিরে এসে সমস্ত রাত ওই খুঁটিটা ঠেস্ দিয়ে বসে কাটালেন। হয়ত বিনু আমার ঘুমোয়নি, হয়ত বাছা আমার ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করচে ; ভোর না হতেই রাখালকে দিয়ে গোরু-বাছুর পাঠিয়ে দিলাম কিন্তু রাক্ষুসী ফিরিয়ে দিয়ে তারই হাতে বলে পাঠালে, বিনুকে আমি দুধ খাওয়াতে চাইনে, দুধ না খেয়ে বেঁচে থাক্‌বার শিক্ষা দিতে চাই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়া কেবল একটা সুগভীর নিঃশ্বাস পড়িল ; গৃহিণীর সেই দিনের সমস্ত বেদনা ও অপমানের স্মৃতি উদ্বেল হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া

দিল, এবং আমার হাতের ডাল-ভাত শুকাইয়া একেবারে চামড়া হইয়া উঠিল। কর্ত্তার খড়মের শব্দ শুনা গেল, তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা হইয়াছে। আশা করি তাঁহার মৌনব্রত অক্ষুণ্ণ-অটুট থাকিয়া তাঁহার সাত্বিক আহারের আজ কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই, কিন্তু, এ দিকের ব্যাপারটা জানিতেন বলিয়াই বোধ করি আমার তত্ব লইতে আর আসিলেন না। গৃহিণী চোখ মুছিয়া নাক ঝাড়িয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, তার পর গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে মুখে কি দুর্নাম, কি কেলেঙ্কারি বাবা, সে আর তোমাদের কি বল্ব! কর্ত্তা বল্লেন দু'দিন যাক্, দুঃখের জ্বালায় তারা আপনিই ফিরবে। আমি বোল্লাম, তাকে চেনোনা, সে ভাঙ্বে কিন্তু নুইবে না। আর তাই হল। একটার পর একটা করে আজ আট মাস কেটে গেল, কিন্তু তাকে হেঁট করতে পারলেনা। কর্ত্তা ভেবে ভেবে আর আড়ালে কেঁদে কেঁদে যেন কাঠ হয়ে উঠ্তে লাগলেন। ছেলেটা ছিল তাঁর প্রাণ, আর ঠাকুরপোকে ভালবাসতেন ছেলের চেয়ে বেশি। আর সহ্য করতে না পেরে লোক দিয়ে বলে পাঠালেন, তাঁতিদের যাতে কষ্ট না হয়, তিনি করবেন; কিন্তু সর্ব্বনাশী জবাব দিলে, যা তাদের ন্যায্য পাওনা সমস্ত মিটিয়ে দিলেই তবে ঘরে ফিরবো। তার এক ছটাক কোথাও বাকি থাকতে যাবোনা। অর্থাৎ তার মানে নিজেদের অবধারিত মৃত্যু!

আমি গেলাশের জলে হাতখানা একবার ডুবাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তাঁদের কি করে চলে?

কুশারী-গৃহিণী কাতর হইয়া বলিলেন, এর জবাব আর আমাকে দিতে বোলোনা বাবা। এ আলোচনা কেউ করতে এলে আমি কানে আঙুল দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাই,—মনে হয় বুঝি বা আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আট মাস এ বাড়ীতে মাছ আসেনা, দুধ ঘি'র কড়া চড়েনা। সমস্ত বাড়ীটার ওপর সে যেন এক মর্ম্মান্তিক অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তিন জনেই আমরা স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আবার যখন গাড়ীতে গিয়া বসিলাম, কুশারী-গৃহিণী সজল কণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর কানে কানে বলিলেন, মা, তারা তোমারই প্রজা। আমার শ্বশুরের দরুণ যে জমিটুকুর ওপর তাদের নির্ভর, সেটুকু তোমার গঙ্গামাটিতেই।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা।

গাড়ী ছাড়িয়া দিতে তিনি পুনশ্চ বলিয়া উঠিলে মা, তোমার বাড়ী থেকেই চোখে পড়ে। মা এ-দিকে যে ভাঙা পোড়ো ঘরটা দেখা যায়, সেইটে।

রাজলক্ষ্মী তেম্নি মাথা নাড়িয়া জানাইল, আ গাড়ী মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। অনেক পর্য্যন্ত আমি কোন কথাই কহিলাম না। চা দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কহিলাম, লক্ষ্মী, যার কে নেই, যে চায়না, তাকে সাহায্য করতে যাও মত বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, সে আমি জানি। তো কাছে আমার আর কিছুই না হোক এ শিক্ষা হয়ে

৭

আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিলে দেখি পাই, যে কয়টি নারীচরিত্র আমার মনের উ গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি কুশারী মহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃ-জায়া। এই স্থ জীবনে সুনন্দাকে আমি আজও ভুলি নাই। মানু এত শীঘ্র এবং এত সহজে রাজলক্ষ্মী আপনার কা লইতে পারে, যে, সুনন্দা যে একদিন আমাকে বলিয়া ডাকিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার নাই। না হইলে এই আশ্চর্য্য মেয়েটিকে জানি সুযোগ আমার কখনও ঘটিত না। অধ্যাপক তর্কালঙ্কারের ভাঙা-চোরা দু-তিনখান ঘর আমা বাড়ীর পশ্চিমে মাঠের একপ্রান্তে চাহিলেই সে চোখে পড়ে, এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই প্রত্যহ কেবল এক বিদ্রোহিনী যে ওইখানে তার স্বামি- লইয়া বাসা বাঁধিয়াছে ইহাই জানিতামনা। বাঁ পুল পার হইয়া একটা কঠিন অনুর্ব্বর মাঠের উ মিনিট দশেকের পথ; মাঝখানে গাছপ প্রায় কিছুই নাই, অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্টই যায়। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া জানা মধ্যে দিয়া যখন ওই জীর্ণ শ্রীহীন ঘরগুলি চো পড়িল, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক প্রকার অদ্ভুত ব্যথা ও আগ্রহের সহিত চাহিয়া রহিলাম। যে বস্তু অনেকদিন অনেক উপলক্ষ্যে দেখিয়াও বার ভুলিয়াছি, সেই কথাই মনে পড়িল যে, সংস কোন-কিছুরই কেবলমাত্র বাহিরটা দেখিয়া কি বলিবার যো নাই। কে বলিবে ওই পো বাড়ীটা শিয়াল কুকুরের আশ্রয়স্থল নহে?

অনুমান করিবে, এই কয়খানা ভাঙা ঘরের মধ্যে কুমার-রঘু-শকুন্তলা-মেঘদূতের অধ্যাপনা চলে, বৃহৎ স্মৃতি ও ন্যায়ের মীমাংসা ও বিচার লইয়া ছাত্র পরিবৃত এক নবীন অধ্যাপক মগ্ন হইয়া থাকেন! কে জানিবে উহারই মধ্যে এই বাঙ্‌লা দেশের এক তরুণী নারী ধর্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে স্বেচ্ছায় অশেষ দুঃখ বহন করিতেছে! দক্ষিণের জানালা দিয়া বাটীর মধ্যে দৃষ্টি পড়ায় মনে হইল উঠানের উপর কি যেন একটা হইতেছে,—রতন আপত্তি করিতেছে এবং রাজলক্ষ্মী তাহা খণ্ডন করিতেছে। সুতরাং কণ্ঠস্বরটা তাহারই কিছু প্রবল। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে কিছু অপ্রতিভ হইয়া গেল। কহিল, ঘুম ভেঙে গেল বুঝি? যাবেই ত। রতন, তুই গলাটা একটু খাটো কর্ বাবা, নইলে আমি ত আর পারিনে।

এই প্রকার অনুযোগ এবং অভিযোগ কেবল রতনই একা নয়, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, অতএব, সেও যেমন চুপ করিয়া রহিল, আমিও তেমনি কথা কহিলামনা। দেখিলাম একটা বড় চাঙারীতে চাল-ডাল-ঘি-তেল প্রভৃতি, এবং আর একটা ছোট্ট পাত্রে তজ্জাতীয় নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য সজ্জিত হইয়াছে; মনে হইল এইগুলির পরিমাণ ও তাহাদিগকে বহন করিবার শক্তি সামর্থ্য লইয়াই রতন প্রতিবাদ করিতেছিল। ঠিক তাই। রাজলক্ষ্মী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল, শোন এর কথা। এই ক'টা চাল-ডাল আর বয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা! এ যে আমি নিয়ে যেতে পারি রতন! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া স্বচ্ছন্দে বড় ঝুড়িটা তুলিয়া ধরিল।

বাস্তবিক, ভার হিসাবে মানুষের পক্ষে, এমন কি রতনের পক্ষেও এগুলি বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন ছিলনা. কিন্তু কঠিন ছিল আর একটা দিক। ইহাতে তাহার মর্য্যাদা হানি হইবে, কিন্তু মনিবের কাছে লজ্জায় এই কথাটাই সে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না; আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া অত্যন্ত সহজেই এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম। হাসিয়া কহিলাম, তোমার যথেষ্ট লোকজন আছে, প্রজারও অভাব নেই,—তাদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, রতন না হয় খালি হাতে সঙ্গে যাক্।

রতন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, রাজলক্ষ্মী একবার আমার ও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, হতভাগা আধঘণ্টা ধরে ঝগড়া করলে, তবু বল্‌লেনা যে মা, ও সব ছোট কাজ রতন-বাবুর নয়। যা' কাউকে ডেকে আনুগে।

সে চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সকালে উঠেই এ সব যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মানুষের খাবার জিনিস সকালেই পাঠাতে হয়।

কিন্তু কোথায় পাঠানো হচ্চে? এবং তার হেতু?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হেতু মানুষে খাবে। এবং, যাচ্চে বামুন বাড়ীতে।

কহিলাম, বামুনটি কে?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, বোধ হয় ভাবিল নামটা বলিবে কি না। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, দিয়ে বল্‌তে নেই, পুণ্যি কমে যায়। যাও, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এস,—তোমার চা তৈরি হয়ে গেছে।

আমি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দশটা, বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া কাজের অভাবে একখানা পুরানো সাপ্তাহিক কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম, একটা অচেনা কণ্ঠস্বরের সম্ভাষণে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, আগন্তুক অপরিচিতই বটে। কহিলেন, নমস্কার বাবু মশায়।

আমিও হাত তুলিয়া প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলাম, বসুন।

ব্রাহ্মণের অতিশয় দীন বেশ, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মলিন উত্তরীয়। পরিধানের বস্ত্রখানিও তেমনি মলিন, উপরন্তু দু'তিন স্থান গ্রন্থি বাঁধা। পল্লীগ্রামে ভদ্র ব্যক্তির আচ্ছাদনের দীনতা বিস্ময়ের বস্তুও নয়, কেবল মাত্র ইহার উপরেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থা অনুমান করাও চলেনা। তিনি সম্মুখে বাঁশের মোড়াটার উপর উপবেশন করিয়া কহিলেন, আমি আপনার একজন দরিদ্র প্রজা,—ইতিপূর্ব্বেই আমার আসা কর্ত্তব্য ছিল,—ভারি ত্রুটি হয়ে গেছে।

আমাকে জমিদার মনে করিয়া কেহ আলাপ করিতে আসিলে আমি মনে মনে যেমন লজ্জিত হইতাম, তেমনি বিরক্ত হইতাম; বিশেষতঃ ইহারা যে সকল নিবেদন ও আবেদন লইয়া উপস্থিত হইত, এবং যে সকল বহুমূল উৎপাত ও অত্যাচারের প্রতি-বিধান প্রার্থনা করিত তাহাতে আমার কোন হাতই ছিলনা। ইহার প্রতিও প্রসন্ন হইতে পারিলামনা, কহিলাম, বিলম্বে আমার জন্যে আপনি দুঃখিত

করবেননা, কারণ একেবারে না এলেও আমি ত্রুটি নিতামনা,—ও রকম আমার স্বভাব নয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজন ?

ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, অসময়ে এসে আপনার কাজে হয়ত ব্যাঘাত করলাম, আমি আর একদিন আসব, এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি বিরক্ত হইয়া কহিলাম, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন বলুন ?

আমার বিরক্তিটা তিনি অনায়াসে লক্ষ্য করিলেন। একটু মৌন থাকিয়া শান্ত ভাবে বলিলেন, আমি সামান্য ব্যক্তি, প্রয়োজনও যৎসামান্য। মা ঠাকরুণ আমাকে স্মরণ করেছেন, হয়ত তাঁর আবশ্যক থাকতে পারে—আমার কিছু নেই।

জবাবটা কঠোর কিন্তু সত্য। এবং আমার প্রশ্নের তুলনায় অসঙ্গতও নয়; কিন্তু এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত নাকি এরূপ জবাব শুনাইবার কেহ লোক ছিলনা, তাই ব্রাহ্মণের প্রত্যুত্তরে কেবল বিস্ময়াপন্ন নয়, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। অথচ মেজাজ আমার স্বভাবতঃ রুক্ষও নয়, অন্যত্র কোথাও এ কথায় কিছু মনেও হইতনা। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের ক্ষমতা জিনিসটা এতই বিশ্রী যে—সেটা পরের ধার করা হলেও তাহার অপব্যবহারের প্রলোভন মানুষে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারেনা। অতএব, অপেক্ষাকৃত ঢের বেশী রূঢ় উত্তরই হঠাৎ মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঝাঁজটা তার উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দেখিলাম পাশের দরজাটা খুলিয়া গেল, এবং রাজলক্ষ্মী তাহার পূজার আসন হইতে অসমাপ্ত আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়াই উঠিয়া আসিল। দূর হইতে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কহিল, এরই মধ্যে উঠবেননা, আপনি বসুন। আপনার কাছে আমার অনেক কথা আছে।

ব্রাহ্মণ পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, মা, আপনি ত আমার সংসারের অনেক দিনের দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন, এতে প্রায় আমাদের পোনর দিনের খাওয়া চলে যাবে। কিন্তু সম্প্রতি ত অকাল চলচে, ব্রত নিয়ম কিছুরই দিন নেই। ব্রাহ্মণী আশ্চর্য্য হয়ে তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন—

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, আপনার ব্রাহ্মণী কেবল বারব্রতের দিনক্ষণগুলোই শিখে রেখেছেন, কিন্তু প্রতিবেশীর তত্ত্ব নেবার কালাকাল বিচারটা আমার কাছে শিখে যেতে বলে দেবেন!

ব্রাহ্মণ কহিলেন, এতবড় সিধেটা কি তাহলে মা—

প্রশ্নটা তিনি শেষ করিতে পারিলেননা, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করিলেননা, কিন্তু আমি এই দাম্ভিক ব্রাহ্মণের অনুক্ত বাক্যের মর্ম্মটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু ভয় হইল আমারই মত না বুঝিয়া রাজলক্ষ্মীও হয়ত একটা শক্ত কথা শুনিবে। লোকটির একদিকের পরিচয় এখনও অজ্ঞাত থাকিলে আর একদিকের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, সুতরাং এমন ইচ্ছা হইলনা যে আমারই সম্মুখে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু একটা সাহস এই ছিল যে কেহ কোনদিন মুখোমুখি রাজলক্ষ্মীকে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারিতনা। ঠিক তাহাই হইল। এই বিশ্রী প্রশ্নটাকেও সে অত্যন্ত সহজে পাশ কাটাইয়া গিয়া হাসিয়া বলিল, তর্কালঙ্কার মশাই, শুনেছি আপনার ব্রাহ্মণী ভারি রাগী মানুষ,—বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে পড়লে হয়ত চটে যাবেন, না হলে এ কথার জবাব তাঁকেই দিয়ে আসতাম।

এতক্ষণে বুঝিলাম ইনিই যদুনাথ কুশারী। অধ্যাপক মানুষ, প্রিয়তমার মেজাজের উল্লেখে নিজের মেজাজ হারাইয়া ফেলিলেন; হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, না মা রাগী হবে কেন, নিতান্তই সোজা মানুষ। আমরা দরিদ্র, আপনি গেলে ত তার উপযুক্ত সম্মান করতে পারবনা, তিনিই আসবেন। একটু সময় পেলে আমিই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, তর্কালঙ্কার মশাই, আপনার ছাত্র ক'টি ?

কুশারী বলিলেন, পাঁচটি। এ দেশে বেশী ছাত্র পাবার যো নেই,—অধ্যাপনা কেবল নাম মাত্র।

সব ক'টিকেই খেতে পরতে দিতে হয় ?

না। বিজয় ত দাদার ওখানেই থাকে, একটির বাড়ী গ্রামের মধ্যেই; কেবল তিনটি ছাত্র আমার কাছে থাকে। রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, এই দুঃসময়ে এ তো সহজ নয় তর্কালঙ্কার মশাই!

ঠিক এই কণ্ঠস্বরেরই প্রয়োজন ছিল। না হইলে অভিমানী অধ্যাপকের উত্তপ্ত হইয়া উঠার কিছুমাত্র বাধা ছিলনা। অথচ, এবার তাঁহার মনটা একেবারে ও-দিক দিয়াই গেলনা। অতি সহজেই গৃহের দুঃখ দৈন্য স্বীকার করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, কি করে যে চলে সে কেবল আমরা দু'টি প্রাণীই জানি। কিন্তু তবু ত ভগবানের উদরান্ন আটকে থাকেনা মা! তাছাড়া উপায়ই বা কি? অধ্যয়ন অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণেরই কাজ। আচার্য্য দেবের কাছে যা' পেয়েছি, সে ত কেবল ন্যস্তধন,—আর একদিন সে ত ফিরিয়ে দিতেই হবে মা। একটু থেমে

থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, একদিন এই ভার ছিল দেশের ভূস্বামীর উপর, কিন্তু এখন দিন কাল সমস্তই বদ্‌লে গেছে। সে অধিকারও তাঁদের নেই, সে দায়িত্বও গেছে। প্রজার রক্ত শোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন কর্ত্তব্যই নেই। তাঁদের ভূস্বামী বলে মনে করতেই এখন ঘৃণা বোধ হয়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, কিন্তু এদের মধ্যে কেউ যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তাকে যেন আবার বাধা দেবেননা!

কুশারী লজ্জা পাইয়া নিজেও হাসিলেন, কহিলেন, বিমনা হয়ে আপনার কথাটা আমি মনেই করিনি। কিন্তু বাধা দেব কেন? সত্যই ত এ আপনাদেরই কর্ত্তব্য।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমরা পূজা-আচ্ছা করি, কিন্তু একটা মন্ত্রও হয়ত শুদ্ধ আবৃত্তি করতে পারিনে,—এও কিন্তু আপনার কর্ত্তব্য, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

কুশারী হাসিয়া বলিলেন, তাই হবে মা। এই বলিয়া তিনি বেলার দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রাজলক্ষ্মী তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, যাইবার সময় আমিও কোন মতে একটা নমস্কার সারিয়া লইলাম।

তিনি চলিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী কহিল, আজ তোমাকে একটু সকাল সকাল নাওয়া খাওয়া সেরে নিতে হবে।

কেন বল ত?

দুপুর বেলা একবার সুনন্দার বাড়ীতে যেতে হবে।

একটু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে কেন? তোমার বাহন রতন আছে ত?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, ও বাহনে আর কুলোবে না। তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আর কোথাও আমি এক পাও নড়্‌চিনে।

বলিলাম, আচ্ছা তাই হবে।

৮

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একদিন সুনন্দা আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহাকে পরমাত্মীয়ের মত কাছে পাইয়াছিলাম। ইহার সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত করিয়া না বলিলেও কথাটাকে প্রত্যয় না করিবার বিশেষ কোন হেতু নাই। কিন্তু আমাদের প্রথম পরিচয়ের ইতিহাসটা বিশ্বাস করানো শক্ত হইবে হয়ত। অনেকেই মনে করিবেন ইহা অদ্ভুত; হয়ত, অনেকেই মাথা নাড়িয়া কহিবেন, এ সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙালি, বাঙ্‌লা দেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এমন হয় তাহা ত কখনো দেখি নাই! তা বটে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এ দেশেরই মানুষ, এবং একটির অধিক সুনন্দা এ দেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তথাচ ইহা সত্য।

রাজলক্ষ্মী ভিতরে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদের ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া কোথায় একটু ছায়া আছে খোঁজ করিতেছি, একটি সতেরো আঠারো বছরের ছোক্‌রা আসিয়া কহিল, আসুন, ভেতরে আসুন!

তর্কালঙ্কার মশাই কোথায়? বিশ্রাম করছেন বোধ হয়?

আজ্ঞে, না, তিনি হাটে গেছেন। মা আছেন, আসুন। বলিয়া সে অগ্রবর্ত্তী হইল, এবং যথেষ্ট দ্বিধাভরেই আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। একদা কোন কালে হয়ত এ বাটীর সদর দরজা কোথাও ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। অতএব, ভূতপূর্ব্ব একটা ঢেঁকিশালার পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করায় নিশ্চয়ই ইহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করি নাই। প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সুনন্দাকে দেখিলাম। উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে এই বাড়ীটার মতই একেবারে আভরণ-বর্জ্জিত। সম্মুখের অপরিসর বারান্দার একধারে মুড়ি ভাজিতেছিল,—বোধ হয় রাজলক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গেসঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—আমাকে জীর্ণ একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া দিয়া নমস্কার করিল। কহিল, বসুন। ছেলেটিকে বলিল, অজয়, উনুনে আগুন আছে, একটু তামাক সেজে দাও বাবা। রাজলক্ষ্মী বিনা আসনে পূর্ব্বেই উপবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সলজ্জ হাস্যে কহিল, আপনাকে কিন্তু পান দিতে পারবনা। পান আমাদের বাড়ীতে নেই।

আমরা কে, অজয় বোধ হয় তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে তাহার গুরু-পত্নীর কথায় সহসা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, নেই? তা'হলে পান বুঝি আজ হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে মা?

সুনন্দা তাহার মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত মুখ টিপিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ওটা হঠাৎ আজ ফুরিয়ে গেছে, না, কেবল হঠাৎ একদিনই ছিল অজয়? এই বলিয়া সহসা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, ও রবিবারে ছোট মহন্ত ঠাকুরের আস্‌বার কথায় এক পয়সার পান কেনা হয়েছিল,—সে প্রায় দিন দশেকের কথা। এই! এতেই আমার অজয় একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, পান হঠাৎ ফুরোলো

কি করে? এই বলিয়া সে আবার হাসিয়া ফেলিল। অজয় মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল,—বাঃ—এই বুঝি! তা' বেশ ত হোলোই বা,—ফুরোলোই বা—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে সদয় কণ্ঠে কহিল, তা সত্যিই ত ভাই, ও পুরুষ মানুষ, ও কি করে জানবে কি তোমার সংসারে ফুরিয়েছে!

অজয় একজনকেও তাহার অনুকূলে পাইয়া কহিতে লাগিল, দেখুন ত! দেখুন ত! অথচ মা ভাবেন—

সুনন্দা তেম্‌নি সহাস্যে বলিল, হাঁ, মা ভাবেন বই কি!" না দিদি, আমার অজয়ই হল বাড়ীর গিন্নী;—ও সব জানে। কেবল এখানে যে কোন কষ্ট আছে, মায় বাবুগিরী পর্য্যন্ত; এইটেই ও স্বীকার করতে পারেনা।

কেন পারবনা! বাঃ—বাবুগিরী কি ভাল! ও ত আমাদের—এই বলিতে বলিতে কথাটা আর শেষ না করিয়াই সে বোধ করি আমার জন্য তামাক সাজিতেই বাহিরে প্রস্থান করিল। সুনন্দা কহিল, বামুন পণ্ডিতের ঘরে হত্তুকিই যথেষ্ট, খুঁজলে এক আধটা সুপুরিও হয়ত পাওয়া যেতে পারে,—আচ্ছা, দেখ্‌চি—এই বলিয়া সেও যাইবার উদ্যোগ করিতেই রাজলক্ষ্মী সহসা তাহার আঁচল ধরিয়া কহিল, হত্তুকি আমার সইবেনা ভাই, সুপুরিতেও কাজ নেই। তুমি একটুখানি আমার কাছে স্থির হয়ে বোসো, দু'টো কথা কই। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে পার্শ্বে বসাইল।

আতিথ্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই নীরব রহিল। এই অবকাশে আমি আর একবার নূতন করিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া লইলাম। প্রথমেই মনে হইল, বস্তুতঃ, এই দারিদ্র্য জিনিসটা সংসারে কতই না অর্থহীন একজন যদি তাহাকে স্বীকার না করে! এই যে আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের সামান্য একটি মেয়ে বাহিরে হইতে যাহার কোন বিশেষত্ব নাই; না আছে রূপ না আছে বস্ত্র-অলঙ্কার; এই ভগ্ন-গৃহের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, কেবল অভাব অনাটনের ছায়া,—কিন্তু, তবুও সে যে ওই ছায়া মাত্রই, তার বেশি কিছু নয়, সে কথাও যেন সঙ্গেসঙ্গেই চোখে পড়িতে বাকি থাকেনা। অভাবের দুঃখটাকে এই মেয়েটি কেবল মাত্র যেন চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দূরে রাখিয়াছে,—জোর করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করে, এত বড় সাহস তাহার নাই। অথচ মাস কয়েক পূর্ব্বেও ইহার সমস্তই ছিল,—ঘর বাড়ী, লোক জন, আত্মীয় বন্ধু—স্বচ্ছল সংসার, কোন বস্তুরই অভাব ছিলনা,—শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে, একখণ্ড জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগ করার মত, মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ, কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার কোন চিহ্ন নাই!

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি ভেবেছিলুম সুনন্দার বয়স হয়েছে। ও হরি! একেবারে ছেলেমানুষ!

অজয় বোধ হয় তাহার গুরুদেবের হুঁকাতেই তামাক সাজিয়া আনিতেছিল, সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ছেলেমানুষ কি রকম! ওই অত বড় বড় ছেলে যার তার বয়স বুঝি কম? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। চমৎকার স্বচ্ছন্দ সরল হাসি। অজয় নিজে উনুন হইতে আগুন লইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় পরিহাস করিয়া কহিল, কি জানি কি জাতের ছেলে বাবা তুমি, কাজ নেই তোমার উনুন ছুঁয়ে। আসল কথা, জ্বলন্ত অঙ্গার চুল্লী হইতে উঠানো শক্ত বলিয়া সে আপনি গিয়া আগুন তুলিয়া কলিকাটার উপরে রাখিয়া দিয়া অজয়ের হাতে দিল, এবং হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিল। সাধারণ পল্লী-রমণী-সুলভ হাসি তামাসা হইতে আরম্ভ করিয়া কথায় বার্ত্তায় আচরণে কোনখানে কোন বিশেষত্ব ধরিবার যো নাই, অথচ, ইতিমধ্যে যে সামান্য পরিচয়টুকু তাহার পাইয়াছি তাহা কতই না অসামান্য। এই অসাধারণতার হেতুটা পরক্ষণেই আমাদের দুজনের কাছেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অজয় আমার হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, মা, ওটা তা'হলে তুলে রেখে দি?

সুনন্দা ইঙ্গিতে সায় দেওয়ায় তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম আমারই অদূরে একখণ্ড কাঠের পীঁড়ার উপর মস্ত মোটা এক পুঁথি এলোমেলো ভাবে খোলা পড়িয়া আছে। এতক্ষণ কেহই উহা দেখি নাই; অজয় তাহার পাতাগুলি গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে ক্ষুণ্ণ-স্বরে কহিল, মা, 'উৎপত্তি প্রকরণটা' ত আজো শেষ হলনা, কবে আর হবে! ও আর হবেই না।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কিসের পুঁথি অজয়?

যোগবাশিষ্ঠঃ।

তোমার মা মুড়ি ভাজছিলেন আর তুমি, শোনাচ্ছিলে?

না, আমি মা'র কাছে পড়ি।

অজয়ের এই সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুনন্দা হঠাৎ যেন লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কহিল, পড়াবার মত বিদ্যে ত ওর মায়ের ছাই আছে। না দিদি, দুপুরবেলা একলা সংসারের কাজ করি, উনি প্রায়ই থাকতে পারেন না, ছেলেরা বই নিয়ে কে যে কখন কি বকে যায় তার বারো আনা আমি শুনতেই পাইনে। ওর কি, যা হোক একটা বলে দিলে।

অজয় তাহার যোগবাশিষ্ঠ লইয়া প্রস্থান করিল, রাজলক্ষ্মী গম্ভীর মুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মুহূর্ত কয়েক পরে সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাড়ীটা আমার কাছাকাছি হলে আমিও তোমার চেলা হয়ে যেতুম ভাই। একে ত জানিনে কিছুই, তাতে আহ্নিক-পূজোর কথাগুলোও যদি ঠিক মত বল্‌তে পারতুম।

মন্ত্রোচ্চারণ সম্বন্ধে তাহার সন্দিগ্ধ আক্ষেপ আমি অনেক শুনিয়াছি, ওটা আমার অভ্যাস ছিল, কিন্তু সুনন্দা এই প্রথম শুনিয়াও কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকিয়া একটু হাসিল মাত্র। কি জানি সে কি মনে করিল। হয়ত ভাবিল, যে তাৎপর্য্য বুঝেনা, প্রয়োগ জানেনা, শুধু অর্থহীন আবৃত্তির পরিশুদ্ধতায় এত দৃষ্টি কেন? হয়ত বা ইহা তাহার কাছেও নূতন নয়,—আমাদের সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়েদের মুখে এম্‌নি সকরুণ লোভ ও মোহের কথা সে অনেক শুনিয়াছে, ইহার উত্তর দেওয়া বা প্রতিবাদ করাও আর প্রয়োজন মনে করে না। অথবা..এ সকল কিছু নাও হইতে পারে, কেবল স্বাভাবিক বিনয় বশেই মৌন হইয়া রহিল। তবুও এ কথাটা ত মনে না করিয়া পারিলাম না, সে যদি আজ তাহার এই অপরিচিত অতিথিটিকে নিতান্তই সাধারণ মেয়েদের সমান ভাবিয়া, ছোট করিয়া দেখিয়া থাকে ত আবার একদিন তাহার অতিশয় অনুতাপের সহিত মত বদলাইবার প্রয়োজন হইবে।

রাজলক্ষ্মী চোখের পলকে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল। আমি জানি কেহ হাঁ করিলে সে তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে, আর সে মন্ত্র-তন্ত্রের ধার দিয়াও গেল না। এবং একটু পরেই নিছক ঘর-কন্না ও গৃহস্থালীর কথা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের মৃদু-কণ্ঠের সমস্ত আলোচনা আমার কানেও গেলনা, কান দিবার চেষ্টাও করিলাম না। বরঞ্চ, তর্কালঙ্কারের থেলো হুঁকায় অজয় দত্ত সুকঠোর তামাকু প্রাণ-পণ করিয়া নিঃশেষ করিতে নিযুক্ত হইলাম।

এই দুটি রমণী অস্পষ্ট মৃদুভাবে সংসার যাত্রা সম্বন্ধে কোন্ জটিল তত্ত্বের সমাধান করিতে লাগিল সে তাহারাই জানে; কিন্তু, তাহাদেরই অদূরে হুঁকা হাতে নীরবে বসিয়া আমার মনে হইতে লাগিল আজ সহসা একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী অভিযোগ আছে, মেয়েদের আমরা হীন করিয়া রাখিয়াছি। এই শক্ত কাজটা যে কেমন করিয়া করিয়াছি, এবং কোথায় উহার প্রতিকার, এ কথা অনেকবার অনেক দিক দিয়া আমি ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আজ সুনন্দাকে ঠিক এমন করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে বোধ করি সংশয় চিরদিন রহিয়াই যাইত। দেশে ও বিদেশে রকমারি স্ত্রী-স্বাধীনতা কতই না দেখিয়াছি। ইহার যে নমুনা বর্ম্মা মুলুকে পা দিয়াই চোখে পড়িয়াছিল তাহা ভুলিবার যো কি! জন তিনেক ব্রহ্ম-সুন্দরী প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া একটা ষণ্ডামার্ক পুরুষকে আক-পেটা করিতেছেন দেখিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিয়াছিলাম। অভয়া মুগ্ধচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল, 'শ্রীকান্তবাবু, আমাদের বাঙালী মেয়েরা যদি এম্‌নি!—' আমার খুড়ামশাই একবার জনদুই মাড়োয়ারী রমণীর নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা রেলগাড়ীতে নাকি খুড়ার নাক ও কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল। শুনিয়া খুড়িমা আমার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা, আমাদের বাঙালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত! থাকিলে আমার খুড়ামশাই নিশ্চয়ই ঘোরতর আপত্তি করিতেন, কিন্তু, ইহাতেই যে নারীজাতির হীন অবস্থার প্রতিবিধান হইত, তাহাও ত অসংশয়ে বলা যায় না। হীনতাই যে কোথায় এবং কিরূপে হয়, সুনন্দার ভগ্ন-গৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া আজ নিঃশব্দে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম। কেবল একটা 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করা ছাড়া সে আমার সহিত দ্বিতীয় বাক্যালাপ করে নাই, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গেও যে কোন বড় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাও নয়; কিন্তু সেই যে অজয়ের মিথ্যা আড়ম্বরের প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে জানাইয়াছিল, এ বাড়ীতে পান নাই, কিনিবার মত সামর্থ্য নাই,—এখানে উহা দুর্ল্লভ বস্তু। তাহার সকল কথার মাঝে এই কথাটা যেন আমার কানে বাজিতেই ছিল। তাহার সঙ্কোচ-লজ্জাহীন এইটুকু পরিহাসে দারিদ্র্যের

সমস্ত লজ্জা কোথায় যে লজ্জায় মুখ লুকাইল, সারা-ক্ষণের মধ্যে আর তাহার দেখাই মিলিল না। এক মুহূর্তেই জানা গেল এই ভাঙা বাড়ী, এই জীর্ণ গৃহ-সজ্জা, এই দুঃখ দৈন্য অনাটন, এই নিরাভরণ মেয়েটি তাহাদের অনেক উপরে। অধ্যাপক পিতা দিবার মধ্যে, কন্যাকে তাঁহার অশেষ যত্নে ধর্ম্ম ও বিদ্যা দান করিয়া শ্বশুরকুলে পাঠাইয়া-ছিলেন; তৎপরে সে জুতা মোজা পরিবে কি ঘোমটা খুলিয়া পথে বেড়াইবে, কিম্বা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে স্বামি-পুত্র লইয়া ভাঙা বাড়ীতে বাস করিবে, তথায় মুড়ি ভাজিবে, কি যোগবাশিষ্ঠ পড়াইবে, সে চিন্তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। মেয়েদের আমরা হীন করিয়াছি কিনা, এ তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এই দিক দিয়া যদি তাহাদের বঞ্চিত করিয়া থাকি ত সে কর্ম্মের ফলভোগ অনিবার্য্য! অজয়ের 'উৎপত্তি প্রকরণ' উঠিয়া না পড়িলে সুনন্দার লেখা পড়ার কথা আমরা জানিতেও পারিতাম না! তাহার মুড়ি ভাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সরল ও সামান্য হাসি তামাসার মধ্যে দিয়া যোগবাশিষ্ঠের ঝাঁজ কোথাও উঁকি মারে নাই; অথচ, স্বামীর অবর্ত্তমানে অপরি-চিত অতিথির অভ্যর্থনা করিতেও তাহার কোনখানে বাধিল না। নির্জ্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলের সে এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গেছে, যে শাসন ও সংশয়ের দড়ি দড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাও বোধ করি কোন দিন তাহার স্বামীর মনে উঠে নাই। অথচ, ইহারই প্রহরা দিতে ঘরে ঘরে কত প্রহরীই না সৃষ্টি হইয়া গেছে!

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া হাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এদিকে বেলা পড়িয়া আসিতেছিল। এই দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীর কত কাজই না পড়িয়া আছে মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল, এবং বিদায় লইয়া কহিল, আজ চল্লুম, যদি বিরক্ত না হও ত আবার আস্‌বো।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমারও কথা কইবার লোক কেউ নেই, যদি অভয় দেন ত মাঝে মাঝে আস্‌ব।

সুনন্দা মুখে কিছু কহিল না, কিন্তু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। পথে আসিতে আসিতে রাজলক্ষ্মী কহিল, মেয়েটি চমৎকার। যেমন স্বামী তেম্‌নি স্ত্রী। ভগবান্ এদের বেশ মিলিয়েছেন।

আমি কহিলাম, হাঁ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এদের ও-বাড়ীর কথাটা আজ আর তুললুম না। কুশারী মহাশয়কে আজও ভাল চিন্‌তে পারিনি, কিন্তু এরা দুটি যা'ই বড় চমৎকার!

বলিলাম, খুব সম্ভব তাই। কিন্তু তোমার ত মানুষ বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা, দেখনা চেষ্টা করে যদি এঁদের আবার মিল করে দিতে পারো।

রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তোমাকে বশ করাটা তার প্রমাণ নয়। চেষ্টা করলে ওটা অনেকেই পারত।

বলিলাম, হতেও পারে। তবে চেষ্টার যখন সুযোগ ঘটেনি, তখন তর্ক করায় ফল হবেনা।

রাজলক্ষ্মী তেম্‌নি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা গো, আচ্ছা। দিন এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেছে ভেবে রেখোনা।

আজ সারাদিনটাই কেমন একটা মেঘলাটে গোছের করিয়াছিল। অপরাহ্ণ সূর্য্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমাদের সাম্‌নের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবর্ত্তী এক ঝাড় বাঁশ ও গোটা দুই তেঁতুলগাছে যেন সোনা-মাখাইয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর শেষ অনুযোগের জবাব দিলাম না, কিন্তু ভিতরের মনটা যেন বাহিরের দশদিকের মতই রাঙিয়া উঠিল। অলক্ষ্যে একবার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম ওষ্ঠাধরে হাসি তখনও সম্পূর্ণ মিলায় নাই, বিগলিত স্বর্ণপ্রভায় এই একান্ত পরিচিত হাসিমুখখানি একেবারে যেন অপূর্ব্ব মনে হইল। হয়ত, এ কেবল আকাশের রঙই নয়; হয়ত, যে আলো আর একটি নারীর কাছ হইতে এইমাত্র আমি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্তি ইহারও অন্তরে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল ত? চাহিয়া দেখিলাম অদূরে ডানদিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে, কহিলাম, বস্তু থাকলে ছায়া পড়ে,—বোধ হয় ওটা আর নেই।

আগে ছিল?

লক্ষ্য করে দেখিনি, ঠিক মনে পড়চে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আমার পড়চে,—ছিল না। এতটুকু বয়স থেকে ওটা দেখতে শিখেছিলাম। এই বলিয়া সে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লেগেছে। মনে

হচ্ছে এতদিন পরে একটি সঙ্গী পেলাম। এই বলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল। আমি কিছু কহিলাম না, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, সে ঠিক সত্য কথাটাই কহিয়াছে।

বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু ধুলা পা ধুইবার অবকাশ মিলিল না, শান্তি ও তৃপ্তি দুই-ই একই সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। দেখি বাহিরের উঠান ভরিয়া জন দশ পনর লোক বসিয়া আছে; আমাদের দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রতন বোধ হয় এতক্ষণ বক্তৃতা করিতেছিল, তাহার মুখ উত্তেজনা ও নিগূঢ় আনন্দে চকচক করিতেছে; কাছে আসিয়া কহিল, মা, বারবার যা বলেচি ঠিক তাই হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী অধীরভাবে কহিল, কি বলেছিলি আমার মনে নেই, আর একবার বল্।

রতন কহিল, নবীনকে পুলিশের লোক হাত-কড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেছে।

বেঁধে নিয়ে গেছে! কখন? কি করেছিল সে?

মালতীকে সে একেবারে খুন করে ফেলেচে!

বলিস্ কি রে! তাহার মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না, না, মা-ঠাকরুণ, একেবারে খুন করেনি। খুব মেরেচে বটে কিন্তু মেরে ফেলেনি।

রতন চোখ রাঙাইয়া কহিল, তোরা কি জানিস্? তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্চেনা। গেল কোথা? তোদের শুদ্ধ হাতে দড়ি পড়তে পারে জানিস্? শুনিয়া সকলের মুখ শুকাইল। কেহ কেহ সরিবার চেষ্টাও করিল। রাজলক্ষ্মী রতনের প্রতি কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুই ওধারে দাঁড়াগে যা। যখন জিজ্ঞাসা কোরব বলিস্। ভিড়ের মধ্যে মালতীর বুড়া বাপ পাংশুমুখে দাঁড়াইয়া ছিল; আমরা সবাই তাহাকে চিনিতাম, ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে সত্যি বল ত বিশ্বনাথ! লুকোলে কিম্বা মিছে কথা কইলে বিপদে পড়তে পার।

বিশ্বনাথ যাহা কহিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কাল রাত্রি হইতে মালতী তাহার পিতার বাটীতে ছিল। আজ দুপুরবেলা সে পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহার স্বামী নবীন কোথায় লুকাইয়া ছিল, একাকী পাইয়া বিষম প্রহার করিয়াছে—এমন কি মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথমে এখানে আসে, কিন্তু আমাদের দেখা না পাইয়া কুশারী মহাশয়ের সন্ধানে কাছারী-বাটীতে যায়, সেখানে তাঁহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া সোজা থানায় গিয়া সমস্ত মার-ধরের চিহ্ন দেখাইয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনিয়া নবীনকে ধরাইয়া দেয়। সে তখন ঘরেই ছিল, নিজের হাতে দুটো চাল সিদ্ধ করিয়া খাইতে বসিতেছিল, সুতরাং পলাইবার সুযোগ পায় নাই। দারোগাবাবু লাথি মারিয়া ভাত ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া গেছেন।

ব্যাপার শুনিয়া রাজলক্ষ্মী অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। সে মালতীকে যেমন দেখিতে পারিত না, নবীনের প্রতিও তেমনি প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু তাহার সমস্ত রাগ পড়িল গিয়া আমার উপরে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একশ বার বলেচি ছোট লোকদের এ সব নোংরা কাণ্ডের মধ্যে তুমি যেয়ো না। যাও এখন সামলাও গে,—আমি কিছু জানিনে। এই বলিয়া সে আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, নবীনের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আর ও হারামজাদী যদি মরে থাকে ত আপদ গেছে!

কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমরা সবাই যেন আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। বকুনি খাইয়া মনে হইতে লাগিল কাল এমনি সময়ে মধ্যস্থ হইয়া ইহাদের যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা ভাল হয় নাই। না করিলে এ দুর্ঘটনা হয় ত আজ ঘটিত না। কিন্তু আমার মতলব ভাল ছিল। ভাবিয়াছিলাম প্রেম-লীলার যে অদৃশ্য চাপা স্রোতটা অন্তরালে বহিয়া সমস্ত পাড়াটাকে নিরন্তর ঘুলাইয়া তুলিতেছে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলে হয়ত ভাল হইবে। দেখিতেছি ভুল করিয়াছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে সমস্ত ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা প্রয়োজন। মালতী নবীন ডোমের স্ত্রী বটে, কিন্তু এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত দেখিতেছি সমস্ত ডোমপাড়ার মধ্যে সে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিশেষ। কখন কোন্ পরিবারের মাঝে সে যে অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিবে, এ লইয়া কোন মেয়ের মনেই শান্তি নাই। এই যুবতী মেয়েটা যেমন সুশ্রী তেমনি চপল। সে কাঁচপোকার টিপ পরে, নেবুর তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, পরণে তার মিলের চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী, তাহার মাথার ঘোমটা পথে-ঘাটে ঘাড়ে নামিয়া পড়িবার কোন বাধা নাই। এই মুখরা মেয়েটাকে মুখের সামনে বলিবার কাহারো সাহস নাই, কিন্তু অগোচরে তাহার নামের সঙ্গে যে বিশেষণ পাড়ার মেয়েরা যোগ করিয়া দেয়, তাহা লেখা চলে না। প্রথমে নাকি মালতী নবীনের ঘর করিতে চাহে নাই, বাপের বাড়ীতেই থাকিত।

বলিত, ও আমাকে খাওয়াইবে কি? এবং এই ধিক্কারেই নাকি নবীন দেশত্যাগী হইয়া কোথায় কোন্ সহরে গিয়া পিয়াদাগিরী চাকরি করিয়া বছর খানেক হইল গ্রামে ফিরিয়াছে। আসিবার সময় মালতীর রূপার পৈঁচা, মিহি সুতার শাড়ী, রেশমের ফিতা, এক বোতল গোলাপ-জল এবং একটা টিনের তোরঙ্গ সঙ্গে আনিয়াছে, এবং এইগুলির পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে শুধু ঘরে আনা নয়, তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এ সকল আমার শোনা কথা। আবার কবে হইতে যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জাগিল, ঘাটে যাবার পথে আড়ি পাতিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, এবং অতঃপর যাহা হয় সুরু হইয়া গেল, আমি ঠিক জানি না। আমরা ত আসিয়া অবধি দেখিতেছি ইহাদের বাক্ ও হাত-যুদ্ধ কোন দিন কামাই যায় না। মাথা কাটা-কাটি কেবল আজ নয়, আরও দিন দুই হইয়া গেছে;—বোধ করি এই জন্যও আজ নবীন মোড়ল স্ত্রীর মাথা ভাঙ্গিয়া আসিয়াও নিশ্চিন্ত চিত্তে আহারে বসিতেছিল, কল্পনাও করে নাই পুলিস ডাকিয়া মালতী তাহাকে বাঁধিয়া চালান দিবে! কাল সকালেই প্রভাতী রাগিণীর ন্যায় মালতীর তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ যখন গগনভেদ করিয়া উঠিল, রাজলক্ষ্মী ঘরের কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া কহিল, বাড়ীর পাশে রোজ এ হাঙ্গামা সহ্য হয় না,—না হয় কিছু টাকা কড়ি দিয়ে হতভাগীকে তুমি দূর করে দাও।

বলিলাম, নবীনটাও কম পাজি নয়। কাজ কর্ম্ম করবে না, কেবল টেরি কেটে আর মাছ ধরে বেড়াবে, আর হাতে পয়সা পেলেই তাড়ি খেয়ে মারপিট সুরু করবে। বলা বাহুল্য এ সকল সে সহরে শিখিয়া আসিয়াছিল।

দুই-ই সমান! বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল, কাজ-কর্ম্ম করবেই বা কখন্? হারামজাদী তার সময় দিলে ত!

বস্তুতঃ, অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল ইহাদের গালি-গালাজ ও মারামারির মকদ্দমা আরও বার দুই করিয়াছি,—কোন ফল হয় নাই; আজ ভাবিলাম খাওয়া দাওয়ার পরে ডাকাইয়া আনিয়া এইবার শেষ মীমাংসা করিয়া দিব। কিন্তু ডাকিতে হইল না, দুপুর-বেলা পাড়ার মেয়ে পুরুষে বাড়ী ভরিয়া গেল। নবীন কহিল বাবু মশায়, ওকে আর আমি চাইনে,—নষ্ট মেয়ে মানুষ। ও আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাক।

মুখরা মালতী ঘোমটার ভিতর হইতে কহিল, ও আমার শাঁখা-নোয়া খুলে দিক্।

নবীন বলিল, তুই আমার রূপোর পৈঁচে ফিরিয়ে দে।

মালতী তৎক্ষণাৎ হাত হইতে সে দুই গাছা টানিয়া খুলিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল।

নবীন কুড়াইয়া লইয়া কহিল, আমার টিনের তোরঙ্গ তুই নিতে পাবিনে।

মালতী কহিল, আমি চাইনে। এই বলিয়া সে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া তাহার পায়ের কাছে ছুড়িয়া দিল।

নবীন তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া মালতীর শাঁখা পট্ পট্ করিয়া ভাঙিয়া দিল এবং নোয়াগাছটা টানিয়া খুলিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, যা, তোকে বিধবা করে দিলাম।

আমি ত অবাক্ হইয়া গেলাম। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তখন বুঝাইয়া বলিল যে, এরূপ না হইলে মালতীর নিকা করা আর হইত না—সমস্তই ঠিক-ঠাক্ আছে।

কথায় কথায় ব্যাপারটা আরও বিশদ হইল। বিশ্বেশ্বরের বড় জামাইয়ের ভাই আজ ছয় মাস ধরিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে। তাহার অবস্থা ভাল, বিশুকে সে কুড়ি টাকা নগদ দিবে, এবং মালতীকে পায়ে মল, হাতে রূপার চুড়ি এবং নাকে সোনার নথ দিবে বলিয়াছে, এমন কি এগুলি সে বিশুর কাছে জমা রাখিয়া পর্য্যন্ত দিয়াছে।

শুনিয়া সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল। কিছু দিন হইতে যে একটা কদর্য্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহা নিঃসন্দেহ, এবং না জানিয়া হয়ত আমি তাহার সাহায্যই করিলাম। নবীন কহিল, আমি ত এই চাই। সহরে গিয়ে এবার মজা করে চাকরি কোরব,—তোর মত অমন দশ গণ্ডা বিয়ে কোরব। রাঙামাটির হরি মোড়ল ত তার মেয়ের জন্য মাথামাথি করচে,—তার পায়ের নোখেও তুই লাগিস্‌নে। এই বলিয়া সে তাহার রূপার পৈঁচা ও তোরঙ্গর চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া চলিয়া গেল। এই আস্ফালন সত্ত্বেও কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার সহরের চাকরি, কিম্বা হরি মোড়লের মেয়ে কোনটার আশাই তার ভবিষ্যৎকে বেশ উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছে।

রতন আসিয়া কহিল, বাবু, মা বল্‌চেন এসব নোংরা কাণ্ড বাড়ী থেকে বিদায় করুন।

আমাকে করিতে কিছু হইল না, বিশ্বেশ্বর মোড়ল তাহার মেয়েকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পাছে আমার পায়ের ধূলা লইতে আসে এই ভয়ে

তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, যাক্, যা হইল তা ভালই হইল। মন যখন ভাঙিয়াছে এবং উপায় যখন আছে, তখন ব্যর্থ আক্রোশে নিত্য-নিয়ত মারামারি কাটা-কাটি করিয়া মর করার চেয়ে এ ভাল।

কিন্তু আজ সুনন্দার বাটী হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, গত কল্যর নিষ্পত্তি অমন নিছক ভালেই হয় নাই। সদ্যবিধবা মালতীর উপর নবীন স্বামিত্বের দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও মারপিটের অধিকার ছাড়ে নাই। সে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় গিয়া হয়ত সমস্ত সকালটা লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়াছে এবং এক সময়ে একাকী পাইয়া বিষম কাণ্ড করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটাই বা গেল কোথায়?

সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিমের জানালা দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, খুব সম্ভব মালতী পুলিশের ভয়ে কোথায় লুকাইয়া আছে,—কিন্তু নবীনকে সে যে ধরাইয়া দিয়াছে ভালই করিয়াছে। হতভাগার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে,—মেয়েটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যার প্রদীপ হাতে ঘরে ঢুকিয়া ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। নীরবে বাহির হইয়া পাশের ঘরের চৌকাটে পা দিয়াই কিন্তু কি একটা ভারি জিনিস পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া দেখি মস্ত একটা কাপড়ের পুঁটুলি দুই হাত বাড়াইয়া তাহার পা ধরিয়া তাহারি উপর মাথা খুঁড়িতেছে। রাজলক্ষ্মীর হাতের প্রদীপটা পড়িয়া গেলেও জ্বলিতেছিল, তুলিয়া ধরিতেই সেই মিহি সূতার চওড়া কালাপেড়ে শাড়ী চোখে পড়িল।

বলিলাম, এ মালতী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হতভাগী, সন্ধ্যাবেলায় আমায় ছুঁলি? ইস্! এ কি বল্ ত?

প্রদীপের আলোকে ঠাহর করিয়া দেখিলাম তাহার মাথার ক্ষত হইতে পুনরায় রক্ত ঝরিয়া অপরের পা দু'খানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই হতভাগিনীর কান্না যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িল; কহিল, মা আমাকে বাঁচাও—

রাজলক্ষ্মী কটু কণ্ঠে কহিল, কেন, তোর আবার হ'ল কি?

সে কাঁদিয়া কহিল, দারোগা বল্‌চে কাল সকালেই তাকে চালান দেবে,—তিনেই পাঁচ বচ্ছরের জেল হয়ে যাবে।

আমি কহিলাম, যেমন কর্ম তেমনি শাস্তি হ ত চাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হোলই বা জেল, ত তোর কি?

মেয়েটার কান্না যেন দম্‌কা ঝড়ের মত তা বুক ফাটিয়া উঠিল; বলিল, বাবু বলেন বলুন, মা, কথা তুমি বোলো না—তার মুখের ভাত আমি খে দিই নি। বলিতে বলিতে সে আবার মাথা কুটি লাগিল,—কহিল, মা আমাদের তুমি এই বা বাঁচিয়ে দাও, আমরা বিদেশে কোথাও চলে গি ভিক্ষে করে খাবো। নইলে তোমারি পুকুরে গি ডুব দিয়ে মরব।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া বড় বড় জলে ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল; ধীরে ধীরে তাহার এলো চুলের উপর হাত রাখিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা আচ্ছা, তুই চুপ কর,—আমি দেখ্‌চি।

দেখিতেও হইল। রাজলক্ষ্মীর বাক্স হইতে শ'দু টাকা সেই রাত্রেই কোথায় গিয়া অন্তর্হিত হইল, তাহ বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু, নবীন মোড়ল কিম্ব মালতী কাহাকেও সকাল হইতে গঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া গেল না।

৯

তাহাদের সম্বন্ধে সবাই ভাবিল যাক, বাঁচা গেল। রাজলক্ষ্মীর তুচ্ছ কথায় মন দিবার সময় ছিলনা; সে উহাদের দুই চারি দিনেই বিস্মৃত হইল; মনে পড়িলেও কি যে মনে করিত সেই জানে। তবে, পাড়া হইতে যে একটা পাপ বিদায় হইয়াছে, তাহা অনেকেই ভাবিত। কেবল রতন খুসি হইলনা। সে বুদ্ধিমান সহজে মনের কথা ব্যক্ত করেনা, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইত জিনিসটা সে একেবারেই পছন্দ করে নাই। তাহার মধ্যস্থ হইবার, কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ গেল, ঘরের টাকা গেল—এত-বড় একটা সমারোহ কাণ্ড রাতারাতি কোথা দিয়া কেমন করিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল,—সবশুদ্ধ জড়াইয়া সে যেন নিজেকেই অপমানিত, এমন কি আহত জ্ঞান করিল। তথাপি সে চুপ করিয়াই রহিল। আর বাটীর যিনি কর্ত্রী, তাঁহার ত কোন দিকে খেয়াল মাত্র নাই। যত দিন কাটিতে লাগিল সুনন্দা ও তাহার কাছে হইতে মন্ত্রতন্ত্রের উচ্চারণ-শুদ্ধির লোভ তাহাকে যেন পাইয়া বসিতে লাগিল। কোনদিন তথায় যাওয়ার তাহার বিরাম ছিলনা। সেখানে সে কি পরিমাণে যে ধর্ম্মতত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতেছিল তাহা

আমি জানিব কি করিয়া ? আমি কেবল জানিতে-ছিলাম তাহার পরিবর্তন। তাহা যেমন দ্রুত, তেমনি অভাবিত। দিনের বেলায় আহারটা আমার চির-কাল একটু বেলাতেই সাঙ্গ হইত। রাজলক্ষ্মী বরাবর আপত্তি করিয়াই আসিয়াছে, অনুমোদন কখনও করে নাই,—সে ঠিক ; কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধনের জন্য কখনও আমাকে লেশমাত্র চেষ্টা করিতেও হয় নাই। কিন্তু আজকাল দৈবাৎ কোনদিন অধিক বেলা হইয়া গেলে মনে মনে লজ্জা বোধ করি। রাজ-লক্ষ্মী বলিত, তুমি রোগা মানুষ, তোমার এত দেরি করা কেন ? নিজের শরীরের পানে না চাও, দাসী-চাকরদের মুখের দিকেও ত চাইতে হয় ? তোমার কুড়েমিতে তারা যে মারা যায় ! কথাগুলো ঠিক সেই আগেকার, তবুও ঠিক তা নয়। সেই সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুর যেন আর বাজে না,—বাজে বিরক্তির এমন একটা কুশাগ্র সূক্ষ্ম কটুতা, যাহা চাকর-দাসী কেন, হয়ত, আমি ছাড়া ভগবানের কানেও তাহার নিগূঢ় রেশটুকু ধরা পড়েনা। তাই ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও দাসী-চাকরদের মুখ চাহিয়া তাড়া-তাড়ি কোনমতে স্নানাহারটা সারিয়া লইয়া তাহাদের চুটি করিয়া দিতাম। কিন্তু, এই অনুগ্রহের প্রতি চাকর দাসী যাহারা তাহাদের আগ্রহ ছিল কি উপেক্ষা ছিল, সে তাহারাই জানে ; কিন্তু, রাজলক্ষ্মী দেখিতাম ইহার মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। কোন দিন রতন, কোন দিন বা দরওয়ান সঙ্গে যাইত,—কোনদিন বা দেখিতাম সে একাই চলিয়াছে, ইহাদের কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবার সময় পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রথমে দুই চারি দিন আমাকে সঙ্গে যাইতে সাধিয়াছিল, কিন্তু ওই দুই চারি দিনেই বুঝা গেল, কোন পক্ষ হইতেই তাহাতে সুবিধা হইবেনা। হইলও না। অতএব আমি আমার নিরালা ঘরে পুরাতন আলস্যের মধ্যে এবং সে তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও মন্ত্র-তন্ত্রের নবীন উদ্দীপনার মধ্যে ক্রমশঃই যেন পৃথক হইয়া পড়িতে লাগিলাম ! আমার খোলা জানালা দিয়া দেখিতে পাইতাম সে রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের পথ দিয়া দ্রুত পদক্ষেপে মাঠ পার হইয়া যাইতেছে। একাকী সমস্ত দুপুর বেলাটা যে আমার কি করিয়া কাটে, এ দিকে খেয়াল করিবার সময় তাহার ছিলনা,—সে আমি বুঝিতাম ; তবুও যতদূর পর্য্যন্ত তাহাকে চোখ দিয়া অনুসরণ করা যায়, না করিয়া পারিতাম না। পায়ে হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথের উপর তাহার বিলীয়-মান দেহলতা ধীরে ধীরে দূরান্তরালে কোন্ এক সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত,—অনেকদিন সেই সময়টু যেন চোখে আমার ধরা পড়িতনা,—মনে হ ওই একান্ত সুপরিচিত চলনখানি যেন তখনও (হয় নাই—সে যেন চলিয়াই চলিয়াছে। হঠাৎ চে হইত। হয়ত চোখ মুছিয়া আর একবার ভা করিয়া চাহিয়া দেখিয়া তার পরে বিছানায় শু পড়িতাম। কর্ম্মহীনতার দুঃসহ ক্লান্তি বশতঃ ক বা কোনদিন ঘুমাইয়া পড়িতাম,—নয়ত বা নির্নী চক্ষে নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতাম। অদূরব কয়েকটা খর্ব্বাকৃতি বাবলাগাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকি এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতা কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশ ঝাড় এম একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত করিতে থাকিত যে মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বু বা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতে ভয় হইত, এমন বুঝি বা আর বেশি দিন সহি পারিবনা। রতন বাড়ী থাকিলে মাঝে মাঝে টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে বলিত, ব একবার তামাক দেব কি ? এমন কতদিন হইয়া জাগিয়াও সাড়া দিই নাই, ঘুমানোর ভাণ করিয়া ভয় হইয়াছে পাছে সে আমার মুখের উপর বেদ ক্ষুণাগ্র আভাসও দেখিতে পায়। প্রতিদিনের সেদিনও দুপুর বেলায় রাজলক্ষ্মী সুনন্দার বাটি চলিয়া গেলে সহসা আমার বর্ম্মার কথা পড়িয়া বহুকালের পরে অভয়াকে একখানা লিখিতে বসিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যে অফিসে ব করিতাম, তাহার বড় সাহেবকেও একখানা লিখিয়া খবর লইব। কি খবর লইব, কেন লইয়া কি হইবে, এত কথা তখনও ভাবি নাই সহসা মনে হইল জানালার সুমুখ দিয়া যে র ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ত্বরিত-পদে সরিয়া গেল, সে চেনা,—কে যেন মালতীর মত। উঠিয়া গিয়া মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু, দেখা গেল সেই মুহূর্ত্তেই তাহার আঁচলের রাঙা পাড়টুকু আ দের প্রাচীরের কোণটায় অন্তর্হিত হইল।

মাসখানেকের ব্যবধানে ডোমেদের সেই লক্ষ্ম মেয়েটাকে সবাই এক প্রকার ভুলিয়াছে, আ কেবল তাহাকে ভুলিতে পারি নাই। জানিনা আমার মনের একটা কোণে ওই উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে সেই সন্ধ্যাবেলাকার চোখের জলের এক ফোঁটা দাগ তখন পর্য্যন্তও মিলায় নাই। প্রায়ই মনে কি জানি কোথায় তাহারা আছে। জানিতে সাধ এই গঙ্গামাটির অসৎ প্রলোভন ও কুৎসিত ষড়য

গাঁয়ের বাহিরে মেয়েটার স্বামীর কাছে থাকিয়া কি ভাবে দিন কাটিয়েছে! ইচ্ছা করিতাম এখানে তাহারা আর যেন শীঘ্র না আসে। ফিরিয়া গিয়া চিঠিটা শেষ করিতে বসিলাম; দুত্র কয়েক লেখার পরেই পদ-শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, রতন। তাহার হাতে সাজা কলিকা; গুড়গুড়ির মাথায় বসাইয়া দিয়া নলটি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, বাবু, তামাক খান্।

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, আচ্ছা।

রতন কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেলনা। নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, বাবু, এই রতন পরামানিক যে কবে মরবে তাই কবল সে জানেনা!

তাহার ভূমিকার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল; রাজলক্ষ্মী হইলে বলিত, জান্‌লে লাভ ছিল, কিন্তু কি বলতে এসেছিস্ বল্। আমি কিন্তু শুধু মুখ তুলিয়া হাসিলাম। রতনের গাম্ভীর্য্যের পরিমাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলনা; কহিল, মাকে সেদিন বলে-ছিলাম কি না ছোটলোকের কথায় ভজবেন না! চাদের চোখের জলে ভুলে দু' দু'শ টাকা জল দেবেন না। বলুন, বলেছিলুম কিনা! আমি জানি, সে বলে নাই। এ সদভিপ্রায় তাহার অন্তরে ছিল বিচিত্র নয়,—কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলা সে কেন, বোধ হয় আমারও সাহস হইত না। কহিলাম, ব্যাপার কি রতন?

রতন কহিল, ব্যাপার যা' বরাবর জানি,—তাই।

কহিলাম, কিন্তু আমি যখন এখনও জানিনে, তখন একটু খুলেই বল।

রতন খুলিয়াই বলিল। সমস্ত শুনিয়াই মনের মধ্যে যে কি হইল বলা কঠিন। কেবল মনে আছে ইহার নিষ্ঠুর কদর্য্যতা ও অপরিসীম বীভৎসতার ভারে, সমস্ত চিত্ত একেবারে তিক্ত বিবশ হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল, রতন সবিস্তারে ইহার ইতিবৃত্ত এখনও সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যেটুকু সত্য সে ছাঁকিয়া বাহির করিয়াছে, তাহা এই যে নবীন যোড়শ সম্প্রতি জেল খাটিতেছে এবং মালতী তাহার ভগিনীপতির সেই বড়লোক ছোটভাইকে ত্যাগ করিয়া উভয়ে তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতে ইস্কুলবাড়িতে কাল ফিরিয়া আসিয়াছে। মালতীকে একপ্রকার স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ করি বিশ্বাস করাই কঠিন হইত যে রাজলক্ষ্মীর টাকাগুলার যথার্থ-ই এই দোষে সদ্গতি হইয়াছে।

সেই রাত্রে আমাকে খাওয়াইতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী এ সংবাদ শুনিল। শুনিয়া কেবল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বলিস্ কি রতন, সত্যি না কি? ছুঁড়িটা সে দিন আচ্ছা তামাসা কর্‌লে ত! টাকাগুলো গেল,—অবেলায় আমাকে নাইয়ে মার্‌লে! ও কি তোমার খাওয়া হয়ে গেল নাকি, তার চেয়ে খেতে না বস্‌লেই ত হয়?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোনদিনই আমি বৃথা চেষ্টা করিনা—আজও চুপ করিয়া রহিলাম। তবে, একটা বস্তু উপলব্ধি করিলাম। আজ নানা কারণে আমার একেবারে ক্ষুধা ছিলনা, প্রায় কিছুই খাই নাই,—তাই আজ সেটা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু কিছুকাল হইতে যে আমার খাওয়া ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছিল, সে তাহার চোখে পড়ে নাই। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে তাহার নজর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে ইহার লেশমাত্র কমবেশি লইয়া তাহার আশঙ্কা ও অভিযোগের অবধি থাকিতনা,—কিন্তু, আজ যে কারণেই হোক একজনের সেই শ্যেন-দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেছে বলিয়াই সে অপরের গভীর বেদনাকেও হা-হুতাশের দ্বারা প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করিয়া তুলিবে, সে-ও আমি নই। তাই, উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিয়া লইয়া নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার দিনগুলা একভাবেই আরম্ভ হয়, একভাবেই শেষ হয়। আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, অথচ বিশেষ কোন দুঃখ কষ্টের নালিশও নাই। শরীর মোটের উপর ভালই আছে। পরদিন প্রভাত হইল, বেলা বাড়িয়া উঠিল, যথারীতি স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিলাম। সুমুখের সেই খোলা জানালা এবং তেমন বাধাহীন, উন্মুক্ত শুষ্ক মাঠ। পাঁজিতে আজ বোধ হয় বিশেষ কোন উপবাসের বিধি ছিল; রাজলক্ষ্মীর তাই আজ সেটুকু সময় অপব্যয় করিতে হইলনা,—যথা সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সুনন্দার উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল। অভ্যাসমত বোধ করি বহুক্ষণ তেম্‌নিই চাহিয়াছিলাম, হঠাৎ স্মরণ হইল কালকার অসমাপ্ত চিঠি দু'টা আজ শেষ করিয়া বেলা তিনটার পূর্ব্বেই ডাক বাক্সে ফেলা চাই। অতএব আর মিথ্যা কালহরণ না করিয়া অবিলম্বে তাহাতেই নিযুক্ত হইলাম। চিঠি দু'খানা সম্পূর্ণ করিয়া যখন পড়িতে লাগিলাম, তখন কোথায় যেন ব্যথা বাজিতে লাগিল, কি যেন একটা না লিখিলেই ভাল হইত; অথচ নিতান্তই সাধারণ লেখা, তাহার কোথায় যে ত্রুটি, বারবার পড়িয়াও ধরিতে পারিলামনা। একটা কথা আমার মনে আছে।

অতঃপর পত্রে রোহিণী দাদাকে নববর্ষের জানাইয়া শেষের দিকে লিখিয়াছি, তোমাদের অনেকদিন খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ, কেমন করিয়া তোমাদের দিন কাটিতেছে, কেবলমাত্র কল্পনা করা ছাড়া জানিবার চেষ্টা করি নাই। হয়ত সুখেই আছ, হয়ত নাই, কিন্তু তোমাদের জীবনযাত্রার এই দিকটাকে সেই যে একদিন ভগবানের হাতে ফেলিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় পর্দা টানিয়া দিয়াছিলাম, আজও সে তেমনি ঝুলানো আছে; তাহাকে কোনদিন তুলিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তও করি নাই। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার দীর্ঘকালের নয়, কিন্তু যে অত্যন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া একদিন আমাদের পরিচয় আরম্ভ এবং আর একদিন সমাপ্ত হয়, তাহাকে সময়ের মাপ দিয়া মাপিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি নাই। যেদিন নিদারুণ রোগাক্রান্ত হই, সেদিন সেই আশ্রয়হীন সুদূর বিদেশে তুমি ছাড়া আমার যাইবার স্থান ছিলনা। তখন একটি মুহূর্তের জন্যও তুমি দ্বিধা কর নাই,—সমস্ত হৃদয় দিয়া পীড়িতকে গ্রহণ করিয়াছিলে। অথচ তেমনি রোগে, তেমনি সেবা করিয়া আর কখনো যে কেহ আমাকে বাঁচায় নাই, এ কথা বলিনা; কিন্তু আজ অনেক দূরে বসিয়া উভয়ের প্রভেদটাও অনুভব করিতেছি। উভয়ের সেবার মধ্যে নির্ভরের মধ্যে অন্তরের অকপট শুভকামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় স্নেহের মধ্যে গভীর ঐক্য রহিয়াছে; কিন্তু তোমার মধ্যে এমন একটি স্বার্থলেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা, এমন অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র সেবা করিয়াই আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়াছে, আমার আরোগ্যের মধ্যে এতটুকু চিহ্ন রাখিতে একটি পাও কখনও বাড়ায় নাই তোমার এই কথাটাই আজ বারম্বার মনে পড়িতেছে। হয়ত, অত্যন্ত স্নেহ আমার সহেনা বলিয়াই,—হয়ত বা, স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি, তাহারই জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ, তোমাকে আর একবার মুখো-মুখি না দেখা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। সাহেবের চিঠিখানাও শেষ করিয়া ফেলিলাম। একসময়ে তিনি আমার সত্য সত্যই বড় উপকার করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছি। প্রার্থনা কিছুই করিনাই, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে সহসা গায়ে পড়িয়া এমন ধন্যবাদ দিবার ঘটা দেখিয়াও নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করিতে লাগিল। ঠিকানা লিখিয়া খামে বন্ধ করিতে গিয়া দেখি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, এত তাড়াতাড়ি করিয়াও তাকে দেওয়া গেলনা, কি মন তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন স্বস্তি অনুভব করিল মনে হইল এ ভালই হইল যে কাল আর একব পড়িয়া দেখিবার সময় মিলিবে।

রতন আসিয়া জানাইল কুশারী-গৃহি আসিয়াছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসি ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি কিছু ব্যতিব্যস্ত হই উঠিলাম, কহিলাম, তিনি ত বাড়ী নেই, ফিরে আস বোধ করি সন্ধ্যা হবে।

তা' জানি, এই বলিয়া তিনি জানালার উপর হই একটা আসন টানিয়া লইয়া নিজেই মেঝের উ পাতিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, কহিলেন, কে সন্ধ্যা কেন, ফিরে আসতে ত প্রায় রাত হয়েই যায়

লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিলাম ধনি-গৃহি বলিয়া ইনি অতিশয় দাম্ভিকা। কাহারও বাড়ী ব একটা যাননা। এ বাড়ীর সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যবহার অনেকটা এইরূপ; অন্ততঃ এতদিন ঘনিষ্ঠতা করি ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মাত্র ব দুই আসিয়াছিলেন। মনিববাড়ী বলিয়া একব নিজেই আসিয়াছিলেন এবং আর একবার নিম রাখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেন আজ অকস্মাৎ স্বেচ্ছায় আগমন করিলেন এবং বাটী কেহ নাই জানিয়াও—আমি ভাবিয়া পাইলামনা।

আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আজকাল ছো গিন্নীর সঙ্গে ত একেবারে এক-আত্মা।

না জানিয়া তিনি একটা ব্যথার স্থানেই আঘা করিলেন, তথাপি ধীরে ধীরে বলিলাম, হাঁ, প্রা ওখানে যান বটে। কুশারী-গৃহিণী কহিলেন, প্রায় রোজ, রোজ! প্রত্যহ! কিন্তু ছোট-গিন্নী কি ক আসে? একটি দিনও না। মানীর মান রাখ সুনন্দা সে মেয়েই নয়! এই বলিয়া তিনি আমার মুখে প্রতি চাহিলেন। আমি একজনের নিত্য যাওয়ার কথা কেবল ভাবিয়াছি, কিন্তু আর একজনের আসার ক মনেও করি নাই; সুতরাং, তাঁহার কথায় হঠ একটু যেন ধাক্কা লাগিল। কিন্তু ইহার উত্তর আ কি দিব? শুধু মনে হইল ইঁহার আসার উদ্দেশ্য কিছু পরিষ্কার হইয়াছে, এবং একবার এমনও ম হইল যে মিথ্যা-সঙ্কোচ ও চক্ষু-লজ্জা পরিত্যাগ করি বলি, আমি নিতান্তই নিরুপায়, অতএব, এই অসু ব্যক্তিটিকে শত্রু-পক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করি কোন লাভ নাই। বলিলে, কি হইত জানিনা, কি না বলার ফলে দেখিলাম সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজ তাঁহার চক্ষের পলকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

...দে, কাহার কি ঘটিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহা রূপান্তর হইয়াছিল, ইহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাঁহার কুরুকুলের বহুর মধ্যেকের ইতিহাস প্রায় রোজ-নামচার আকারে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাঁহার গোটাকয়েক কথার পরেই কেমন যেন অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণও ছিল। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, একদিকে আত্মপক্ষের স্তুতিবাদ, দয়া দাক্ষিণ্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি যাহা কিছু শাস্ত্রোক্ত সদ্গুণাবলী মনুষ্য-জন্মে সম্ভবপর সমস্তগুলিরই বিস্তৃত আলোচনা—এবং, অন্যদিকে যত কিছু ইহারই বিপরীত তাহারই বিশদ বিবরণ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া সন, তারিখ, মাস, বার প্রতিবেশী সাক্ষীদের নামধাম সমেত আবৃত্তি করা ভিন্ন তাঁহার এই বলার মধ্যে আর কিছুই থাকিবেনা। প্রথমটা ছিলওনা,—কিন্তু হঠাৎ একসময়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল কুশারী-গৃহিণীর কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে। একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয়েচে? তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তার পরে ধরা গলায় বলিয়া উঠিলেন, হবার আর কি বাকি রইল বাবু? শুনলাম, কাল নাকি ঠাকুরপো হাটের মধ্যে নিজের হাতে বেগুন বেচ্‌তেছিলেন?

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হইলনা, এবং মন ভাল থাকিলে হয়ত হাসিয়াই ফেলিতাম। কহিলাম, অধ্যাপক মানুষ তিনি হঠাৎ বেগুনই বা পেলেন কোথায়, আর বেচতেই বা গেলেন কেন?

কুশারী-গৃহিণী বলিলেন, ওই হতভাগীর জ্বালায়। বাড়ীর-কাছেই নাকি গোটাকয়েক গাছে বেগুন ফলেছিল, তাই পাঠিয়ে-দিয়েছিল হাটে বেচতে—এমন করে শত্রুতা করলে আমরা গাঁয়ে বাস করি কি করে?

বলিলাম, কিন্তু একে শত্রুতা করা বলচেন কেন? তাঁরা ত আপনাদের কিছুর মধ্যেই নেই। অভাব হয়েছে, নিজের জিনিস বিক্রী করতে গেছেন, তাতে আপনার নালিশ কি?

আমার জবাব শুনিয়া কুশারী-গৃহিণী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, এই বিচারই যদি করেন, তাহলে আমার বলবারও আর কিছু নেই, মনিবের কাছে নালিশ জানাবারও কিছু নেই,—আমি উঠলাম।

শেষের দিকে তাঁহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল দেখিয়া, ধীরে ধীরে কহিলাম, দেখুন, এর চেয়ে বরঞ্চ আপনার মনিব-ঠাকরুণকে জানাবেন, তিনি হয়ত সকল কথা বুঝতেও পারবেন, আপনার উপকার করতেও পারবেন।

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, আর আমি কাউকে বল্‌তেও চাইনে, আমার উপকার করেও কারও কাজ নেই। এই বলিয়া তিনি সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আগে আগে কর্ত্তা বল্‌তেন, দু'মাস যাগ, আপনিই ফিরে আস্‌বে। তার পরে সাহস দিতেন, থাকোনা আরও মাস দুই চেপে, সব শুধ্‌রে যাবে,—কিন্তু এমনি করে মিথ্যে আশায় আশায় প্রায় বছর ঘুরে এলো। কিন্তু কাল যখন শুন্‌লাম সে উঠানের দু'টো বেগুন পর্য্যন্ত বেচতে পেরেচে, তখন কারও কথায় আর আমার কোন ভরসা নেই। হতভাগী সমস্ত সংসার ছার-খার করে দেবে, কিন্তু ও বাড়ীতে আর পা দেবে না। বাবু, মেয়ে মানুষে যে এমন শক্ত পাষাণ হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তিনি কহিতে লাগিলেন, কর্ত্তা ওকে কোনদিন চিন্‌তে পারেননি, কিন্তু আমি চিনেছিলাম। প্রথম প্রথম এর-ওর-তার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিস-পত্র পাঠাতাম, উনি বলতেন সুনন্দা জেনে-শুনেই নেয়—কিন্তু অমন করলে তাদের চৈতন্য হবেনা। আমিও ভাবতাম হবেও বা! কিন্তু একদিন সব ভুল ভেঙ্গে গেল। কি করে সে জান্‌তে পেরে যতদিন যা কিছু দিয়েছি, একটা লোকের মাথায় সমস্ত টান মেরে আমাদের উঠানের মাঝখানে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে কর্ত্তার তবুও চৈতন্য হলনা—হল আমার।

এতক্ষণে আমি তাঁর মনের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম। সদয় কণ্ঠে কহিলাম, এখন আপনি কি করতে চান? আচ্ছা, তাঁরা কি আপনাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বা কোন প্রকার শত্রুতা করবার চেষ্টা করেন?

কুশারী-গৃহিণী আর একদফা কাঁদিয়া ফেলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, পোড়া কপাল! তা হলে ত একটা উপায় হোতো। সে আমাদের এমনি ত্যাগ করেছে যে কোনদিন যেন আমাদের চোখেও দেখেনি, নামও শোনেনি, এমনি কঠিন, এমনি পাষাণ মেয়ে! আমাদের দু'জনকে সুনন্দা তার বাপ-মায়ের বেশি ভালবাস্‌ত; কিন্তু যেদিন থেকে শুনেচে তার ভাশুরের বিষয় পাপের বিষয়, সেই দিন থেকে তার সমস্ত মন যেন একেবারে পাথর হয়ে গেছে! স্বামি-পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মর্‌বে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবেনা! কিন্তু এতবড় সম্পত্তি কি আমরা ফেলে দিতে পারি বাবু? সে যেন

দয়া-মায়া-হীন,—ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতেও পারে, কিন্তু আমরা ত তা পারিনে।

কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলামনা, শুধু আস্তে আস্তে কহিলাম, আশ্চর্য্য মেয়ে-মানুষ।

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, কুশারী-গৃহিণী নীরবে কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সত্যি বল্‌চি বাবু, এদের মাঝে পড়ে আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতে চায়। কিন্তু শুন্‌তে পাই আজকাল সে নাকি বড় বাধ্য—কোন একটা উপায় হয়না? আমি যে আর সইতে পারিনে!

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনিও আর কিছু বলিতে পারিলেননা—তেম্‌নি অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

১০

মানুষের পরকালের চিন্তার মধ্যে নাকি পরের চিন্তার ঠাঁই নাই, না হইলে আমার খাওয়া-পরার চিন্তা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিতে পারে এতবড় বিস্ময় সংসারে আর কি আছে? এই গঙ্গামাটিতে আমরা কতদিনই বা আসিয়াছি, এই ক'টা দিনের মধ্যে হঠাৎ সে কতদূরেই না সরিয়া গেল! আমার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসে এখন বামুন ঠাকুর, আমাকে খাওয়াইতে বসে রতন। একপক্ষে বাঁচিয়াছি সে দুর্লভ্য পীড়াপীড়ি আর নাই। রোগা শরীরে ওগারোটার মধ্যে না খাইলে এখন আর অসুখ করেনা। এখন যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা খাই। শুধু রতনের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় ও বামুন ঠাকুরের সখেদ আত্মভৎসনায় স্বল্পাহারের বড় সুযোগ পাইনা,—সে বেচারা ম্লানমুখে কেবলি মনে করিতে থাকে তাহারই রান্নার দোষে আমার খাওয়া হইলনা। কোনমতে ইহাদের সন্তুষ্ট করিয়া বিছানায় গিয়া বসি। সম্মুখের সেই খোলা জানালা, আর সেই উষর প্রান্তরের তীব্র তপ্ত হাওয়া। মধ্যাহ্নের দীর্ঘ দিনমান কেবল মাত্র এই ছায়াহীন শুষ্কতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া যখন আর কাটিতে চাহিতনা, তখন একটা প্রশ্ন সবচেয়ে আমার বেশি মনে পড়িত সে আমাদের সম্বন্ধের কথাটা। ভাল আমাকে সে আজও বাসে, ইহলোকে আমি তার একান্ত আপনার, কিন্তু লোকান্তরে তার কাছে আমি ততবড়ই পর। তাহার ধর্ম্মজীবনের আমি যে সঙ্গী নই, সেখানে দাবী করিবার আমাকে যে তাহার কোন দলিল নাই, হিন্দুঘরের মেয়ে হইয়া এ কথা সে ভুলে নাই। এই পৃথিবীটাই শুধু নয়, ইহারও অতীত যে স্থানটা আছে পাথেয় তাহার শুধু আমাকে কেবল ভালবাসিয়া অর্জ্জন করা যাইবেনা, এ সংশয় বোধকরি খুব বড় করিয়াই তাহার মনে উঠিয়াছে।

সে রহিল এই লইয়া, আর আমার দিনগুলা কাটিতে লাগিল এম্‌নি করিয়া। কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনের দিবারম্ভ হয় শ্রান্তিতে, অবসান হয় অবসন্ন গ্লানিতে। নিজের আয়ুষ্কালটাকে নিজের হাত দিয়া প্রতিনিয়ত হত্যা করিয়া চলা ব্যতীত সংসারে আর যেন আমার কিছু করিবার নাই। রতন আসিয়া মাঝে মাঝে তামাক দিয়া যায়, সময় হইলে চা আনিয়া দেয়,—কিছু বলেনা। কিন্তু মুখ দেখিয়া তাহার বোধ হয় সে পর্য্যন্ত আমাকে যেন কৃপার চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছে। কখনো বা হঠাৎ আসিয়া বলে, বাবু জানালাটা বন্ধ করে দিন আগুনের হল্‌কা আসচে। আমি বলি থাক্‌। মনে হয়, কত লোকের গায়ের স্পর্শ এবং কত না অচেনা লোকের তপ্ত শ্বাসের আমি যেন ভাগ পাই। হয়ত, আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু ইন্দ্রনাথ আজিও বাঁচিয়া আছে, এই উষ্ণ বায়ু হয়ত তাহাকে এইমাত্র ছুঁইয়া আসিল। হয়ত, সে আমারই মত তাহার অনেকদিন সুখ-দুঃখের শিশু সঙ্গীটিকে স্মরণ করিতেছে। আর আমাদের উভয়ের সেই অন্নদা-দিদি। ভাবিতাম হয়ত, এতদিনে তাঁহার সকল দুঃখের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কখনো মনে হয়, এই কোণেই ত বর্ম্মাদেশ, বাতাসের ত বাধা নাই, কে বলিবে সমুদ্র পার করিয়া অভয়ার স্পর্শ টুকু সে আমার কাছে বহিয়া আনিতেছেনা! অভয়াকে মনে পড়িলে সহজে সে আমার মন ছাড়িয়া যাইতে চাহিতনা। রোহিণীদা' এখন কাজে গিয়াছেন আর তাঁহাদের ছোট্ট বাসাবাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের মেঝেতে বসিয়া অভয়া তাহার সেলাই লইয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলা আমার মত সে ঘুমাইতে পারেনা, এতদিনে,—হয়ত কোন ছোট্ট শিশুর কাঁথা, কিম্বা তেম্‌নি ছোট বালিশের অড়, কিম্বা এম্‌নি কিছু তাহার ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র গৃহিণীপনা!

বুকের মাঝখানে গিয়া যেন তীরের মত বিঁধে। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত সংস্কার, যুগ-যুগান্তরের ভাল-মন্দ বিচারের অভিমান আমারও ত রক্তের মধ্যে প্রবহমান,—কেমন করিয়া অকপটে তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি! কিন্তু, মন যে সরমে সঙ্কোচে একেবারে ছোট হইয়া আসিতে চায়!

কর্ম্মনিরতা অভয়ার শান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমি

মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। তাহারি পাশে নিষ্কলঙ্ক সুষুপ্ত বালক। যেন সদ্য-ফোটা পদ্মের মত শোভায় সম্পদে, গন্ধে মধুতে টল্ টল্ করিতেছে! একখানি অমৃত-বস্তুর জগতে কি সত্যই প্রয়োজন ছিলনা? মানব-সমাজে মানব-শিশুর মর্য্যাদা নাই, নিমন্ত্রণ নাই,—স্থান নাই বলিয়া ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে হইবে? কল্যাণের ধনকেই চির অকল্যাণের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের বৃহত্তর ধর্ম্ম আর নাই?

অভয়াকে আমি চিনি। এইটুকুকে পাইতে সে যে তাহার জীবনের কতখানি দিয়াছে তাহা আর কেহ না জানে ত আমি ত জানি! হৃদয়হীন বর্ব্বরতার কেবলমাত্র অশ্রদ্ধা ও উপহাসের দ্বারাই সংসারে সকল প্রশ্নের জবাব হয়না। ভোগ! অত্যন্ত মোটা রকমের লজ্জাকর দেহের ভোগ! তাই বটে! অভয়াকে ধিক্কার দিবার কথাই বটে!

বাহিরের তপ্ত বাতাসে চোখের তপ্ত অশ্রু আমার নিমিষে শুকাইত। বর্ম্মা হইতে চলিয়া আসার কথাটা মনে পড়িত। ঠিক সেই সময়টায় তখন রেঙ্গুনে মরণের ভয়ে ভাই বোনকে, ছেলে বাপ-মাকেও ঠাঁই দিতনা। মৃত্যু উৎসবের উদ্দণ্ড মৃত্যু-লীলা সহরময় চলিয়াছে,—তেমনি সময়ে যখন আমি মৃত্যু-দূতের কাঁধে চড়িয়া তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন, নূতন-পাতা ঘর-কন্নার মোহ ত তাহাকে একটা মুহূর্ত্তও দ্বিধায় ফেলে নাই! সে কথা ত শুধু আমার আখ্যায়িকার এই কয়টা লাইন পড়িয়াই বুঝা যাইবেনা,—কিন্তু, আমি ত জানি সে কি! আরও অনেক-বেশি আমি জানি। আমি জানি কিছুই অভয়ার কঠিন নয়,—মৃত্যু,—সেও তাহার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এই সব প্রাচীন ও মামুলি বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয়না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায়না।

কাজের জন্য পুরাণো মনিবের কাছে দরখাস্ত করিয়াছি, ভরসা আছে আবেদন নামঞ্জুর হইবে না। সুতরাং আবার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে। ইতিমধ্যে দুই তরফেই অনেক অঘটন ঘটিয়াছে। ইহার ভারও সামান্য নয়, কিন্তু সে-ভার যে জমা হইয়াছে আপনার অসামান্য সরলতায় ও স্বেচ্ছায়, আর আমার জমিয়া উঠিয়াছে তেমনি অসাধারণ দুর্ব্বলতায় ও ইচ্ছা-শক্তির অভাবে। কি জানি, ইহাদের রঙ ও চেহারা সেদিন মুখোমুখি কেমনতর দেখিতে হইবে।

একাকী সমস্ত দিন প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠিত, তখন, বেলা পড়িলে একটুখানি বেড়াইতে বাহির হইতাম। দিন পাঁচ-সাত হইতে ইহা একপ্রকার অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল। ধূলাময় যে পথটা দিয়া একদিন আমরা গঙ্গামাটিতে আসিয়াছিলাম, সেই পথ ধরিয়া কোন-কোন দিন অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতাম। অন্যমনে আজও তেমনি চলিয়াছিলাম, সহসা দেখিতে পাইলাম সম্মুখে ধূলার পাহাড় সৃষ্টি করিয়া কে একজন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। সভয়ে রাস্তা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইলাম। ঘোড়-সওয়ার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ঘোড়া থামাইল, ফিরিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার নাম শ্রীকান্ত বাবু না? আমাকে চিনিতে পারেন?

বলিলাম, নাম আমার তাই বটে, কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলামনা।

লোকটি ঘোড়া হইতে নামিল। পরনে তাহার ছিন্ন ও মলিন সাহেবী পোষাক, মাথায় জরা-জীর্ণ সোলার হ্যাট খুলিয়া হাতে লইয়া কহিল, আমি সতীশ ভরদ্বাজ। থার্ডক্লাস থেকে প্রোমোশন না পেয়ে সার্ভে-ইস্কুলে পড়তে যাই মনে পড়েনা?

মনে পড়িল। খুসি হইয়া কহিলাম, তাই বল, তুমি আমাদের ব্যাঙ্! এখানে সাহেব সেজে যাচ্ছো কোথায়?

ব্যাঙ্ হাসিয়া কহিল, সাহেব কি আর সাধে সাজি ভাই, রেলওয়ে কনষ্ট্রাক্‌শনে সাব-ওভারসিয়ারি চাকরি করি, কুলি তাড়াতেই জীবন যায়, হ্যাট কোট না থাকলে কি আর রক্ষা ছিল? একদিন তারাই আমাকে তাড়াতো। সোপলপুরে [illegible] বরাত সেরে ফিরচি,—মাইলটাক দূরে আমার তাঁবু, সাঁইথিয়া থেকে যে নতুন লাইন বসচে তাতেই কাজ। যাবে আমার ওখানে? চা খেয়ে আসবে?

অস্বীকার করিয়া কহিলাম, আজ নয়, আর কোনদিন যদি সুযোগ হয় আসবো।

ব্যাঙ্ তখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শরীর কেমন, কোথায় থাকি, এখানে কি সূত্রে আসা, ছেলে-মেয়ে কয়টি, তাহারা কে কেমন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

জবাবে বলিলাম, শরীর ভাল নয়, থাকি গঙ্গামাটিতে, যে সূত্রে এখানে আসা তাহা অত্যন্ত

[illegible] ছেলে মেয়ে নাই, অতএব, তাহারা কে কেমন আছে এ প্রশ্ন নিরর্থক।

ব্যাণ্ড, শাদা-সিধা গোছের লোক। আমার উত্তরগুলা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অপরের ব্যাপার বুঝিতেই হইবে এরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্প ব্যক্তি সে নয়। সে নিজের কথাই বলিতে লাগিল। যায়গাটা স্বাস্থ্যকর, তরিতরকারি মেলে, মাছ এবং দুধ চেষ্টা করিলে পাওয়া যায় তবে, লোকজন নাই, সঙ্গী সাথীর অভাব, কিন্তু কষ্ট বিশেষ হয়না, কারণ, সন্ধ্যার পরে একটু নেশা-ভাঙ্‌ করিলেই বেশ চলিয়া যায়। সাহেবরা হাজার হৌক বাঙালীর চেয়ে ঢের ভাল,—টেম্পোয়ারি গোছের তাড়ির শেড একটা খোলা হইয়াছে,—যত ইচ্ছা খাও, তাহার নিজের ত একরকম পয়সা লাগেনা বলিলেই হয়,—সবই ভাল,—কন্ট্রাক্‌টরদের দু'পয়সা আছেও বটে, এবং আমার জন্য বড় সাহেবকে ধরিয়া, চাকরি একটা অনায়াসে করিয়া দিতে পারে—এম্‌নি সব তাহার সৌভাগ্যের ছোট বড় কাহিনী। ব্যাণ্ড্‌ তাহার বেতো ঘোড়ার মুখ ধরিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে বকিতে বকিতে চলিল; বারবার জিজ্ঞাসা করিল আমি কি নাগাইদ তাহার ক্যাম্পে পায়ের ধূলা দিতে পারি, এবং ভরসা দিয়া জানাইল যে পোড়ামাটিতে প্রায় তাহার কাজ থাকে, ফিরিবার পথে একদিন আমার গঙ্গামাটিতে সে নিশ্চয় গিয়া উপস্থিত হইবে।

সেদিন বাড়ী ফিরিতে আমার একটু রাত্রি হইল। পাচক আসিয়া জানাইল আহার প্রস্তুত। হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়াছি, এমন সময়ে রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘরে ঢুকিয়া চৌকাটের কাছে বসিয়া পড়িল, হাসিমুখে কহিল, তুমি কিন্তু কিছুতেই অমত করতে পাবেনা বলে রাখ্‌চি।

কহিলাম, না, আমার অমত নেই।

কি তা' না শুনেই?

কহিলাম, আবশ্যক মনে হয় বোলো একসময়।

রাজলক্ষ্মীর হাসি-মুখ গম্ভীর হইল, কহিল, আচ্ছা—হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল, আমার থালার উপরে। কহিল, ভাত খাচ্চো যে বড়? তুমি জানো রাত্রে তোমার ভাত সহ্য হয়না,—তুমি কি তোমার অসুখটা আমাকে সারাতে দেবেনা ঠিক করেচ?

ভাত আমার ভালই সহ্য হইতেছিল, কিন্তু সে কথা বলিয়া লাভ নাই। রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল, মহারাজ? পাচক দ্বারের কাছে আসিতেই তাহাকে থালা দেখাইয়া ততোধিক তীব্রস্বরে কহিল, কি এ? তোমাকে বোধ হয় একহাজার বার বলেচি ভাত বাবুকে কিছুতেই রাত্রে দেবেনা,—তোমাকে একমাসের মাইনে আমি জরিমানা করলুম। অবশ্য টাকার দিক দিয়া জরিমানার কোন অর্থ নাই তাহা সকল চাকরেই জানে, কিন্তু তিরস্কারের দিক দিয়া তাহার অর্থ আছে বই কি! মহারাজ রাগ করিয়া কহিল, ঘি নেই আমি কি কোরব?

নেই কেন তাই শুনি?

সে জবাব দিল, দু-তিন দিন জানিয়েছি আপনাকে ঘি ফুরিয়েছে, লোক পাঠান্‌। আপনি না পাঠালে আমার দোষ কি?

সংসার খরচের সাধারণ ঘি এইখানেই পাওয়া যাইত, কিন্তু আমার জন্য আসিত সাঁইথিয়ার নিকট-বর্ত্তী কি একটা গ্রাম হইতে। তাহা লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইতে হইত। কথাটা রাজলক্ষ্মীর অন্য-মনস্ক কর্ণরন্ধ্রে হয় প্রবেশ করে নাই, না হয় ত সে ভুলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কবে থেকে নেই মহারাজ?

তা' হবে পাঁচ সাত দিন।

এই পাঁচ সাত দিন ওঁকে ভাত খাওয়াচ্চো? রতনকে ডাকিয়া কহিল, আমিই যেন ভুলেছিলাম, কিন্তু তুই কি আনিয়ে দিতে পারতিসনে বাবা! এম্‌নি করেই কি সবাই মিলে আমাকে জব্দ করতে হয়?

রতন মনে মনে তাহার ঠাকুরাণীর উপর খুসি ছিলনা। দিবারাত্রি বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকায় এবং বিশেষ করিয়া আমার প্রতি ঔদাসীন্যে তাহার বিরক্তির একশেষ হইয়াছিল, কর্ত্রীর অনুযোগের উত্তরে ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি জানি মা, তুমি গেরাহ্যি করলেনা দেখে ভাবলুম ভাল দামী ঘি বোধ হয় আর চাইনে। নইলে পাঁচ ছ দিন ধরে রোগা মানুষকে আমি ভাত খেতে দিই।

রাজলক্ষ্মীর বলিবার কিছুই ছিলনা, তাই ভৃত্যের কাছে এতবড় খোঁচা খাইয়াও সে কিছুক্ষণ নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছটফট্‌ করিয়া বোধ করি সেইমাত্র তন্দ্রা আসিয়াছিল, রাজলক্ষ্মী দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং আমার পায়ের কাছে আসিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে থাকিয়া ডাকিল, তুমি কি ঘুমোলে?

বলিলাম, না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তোমাকে পাবার জন্যে আমি যা করেছি, তার অর্দ্ধেক করলেও বোধ হয় ভগবানকে এতদিনে পেতুম। কিন্তু তোমাকে পেলুমনা।

বলিলাম, হতে পারে মানুষকে পাওয়া আরও শক্ত।

মানুষকে পাওয়া? রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, যাই হোক্ ভালবাসাটাও ত এক-রকমের বাঁধন, বোধ হয় এও তোমার সয়না,—গায়ে লাগে।

এ অভিযোগের জবাব নাই, এ অভিযোগ শাশ্বত ও সনাতন। আদিম মানব-মানবী হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এ কলহের মীমাংসক কেহ নাই,—এ বিবাদ যেদিন মিটিবে, সংসারের সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য্য সেদিন তিক্ত, বিষ হইয়া উঠিবে। তাই উত্তর দিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া নীরব হইয়া রহিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে উত্তরের জন্য রাজলক্ষ্মী পীড়াপীড়ি করিলনা, জীবনের এতবড় সর্ব্বব্যাপী প্রশ্নটাকেও সে যেন এক নিমিষে আপনা-আপনিই ভুলিয়া গেল। কহিল, ন্যায়রত্নঠাকুর বল্‌ছিলেন একটা ব্রতের কথা,—কিন্তু একটু কঠিন বলে সবাই নিতে পারেনা, আর এত সুবিধেই বা ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

অসমাপ্ত প্রস্তাবের মাঝখানে মৌন হইয়া রহিলাম, সে বলিতে লাগিল, তিন দিন একরকম উপোস করেই থাকতে হয়, সুনন্দারও ভারি ইচ্ছে,—দু'জনের একসঙ্গেই তা'হলে হয়ে যায়,—কিন্তু—এই বলিয়া সে নিজেই একটু হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু তোমার মত না হলে ত আর—

জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার মত না হলে কি হবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা' হ'লে হবেনা।

কহিলাম, তবে এ মৎলব ত্যাগ কর, আমার মত নেই।

যাও—তামাসা করতে হবেনা।

তামাসা নয়, সত্যিই আমার মত নেই,—আমি নিষেধ করচি।

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমরা যে সমস্ত স্থির করে ফেলেচি। জিনিস-পত্র কিনতে লোক গেছে,—কাল হবিষ্যি করে পরশু থেকে যে—না: এখন বারণ করলে হবে কেন? সুনন্দার কাছে আমি মুখ দেখাব কি করে? ছোটঠাকুর—না:! এ কেবল তোমার চালাকি। আমাকে মিছিমিছি রাগাবার জন্যে—না, সে হবেনা, তুমি বল তোমার মত আছে?

বলিলাম, আছে। কিন্তু, তুমি কোনদিনই বা আমার মতামতের অপেক্ষা করনা লক্ষ্মী, আজই বা হঠাৎ কেন তামাসা করতে এলে? আমার আদেশ মান্‌তে হবে এ দাবী আমি ত কখনো তোমার কাছে করিনি।

রাজলক্ষ্মী আমার পায়ের উপর হাত রাখিয়া কহিল, আর কখনো হবেনা, এই বারটি শুধু প্রসন্ন মনে আমাকে হুকুম দাও।

কহিলাম, আচ্ছা। কিন্তু ভোরেই তোমাকে হয়ত যেতে হবে, আর রাত কোরোনা শুতে যাও।

রাজলক্ষ্মী গেলনা, আস্তে আস্তে আমার পায়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার কেবলি মনে হইতে লাগিল সে স্নেহস্পর্শ আর নাই। সেও ত বেশিদিনের কথা নয়, আরা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে আমাকে যেদিন সে কুড়াইয়া বাড়ী আনিয়াছিল সেদিন এম্‌নি করিয়াই পায়ে হাত বুলাইয়া আমাকে সে ঘুম পাড়াইতে ভালবাসিত। ঠিক এম্‌নিই নীরবে কিন্তু মনে হইত তাহার দশ অঙ্গুলি যেন দশ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়া নারী-হৃদয়ের যাহা কিছু আছে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আমার এই পা দু'টার উপরে উজাড় করিয়া দিতেছে। অথচ, এ আমি চাহি নাই এই লইয়াই যে কেমন করিয়া কি করিব সেও ভাবিয়া পাই নাই। বানের জলের মত। আমার দিনও আমার মত চাহে নাই, হয়ত যাবার দিনেও তেম্‌নি মুখ চাহিবেনা। চোখ দিয়া আমার সহজে জল পড়েনা, ভালবাসার কাঙাল-বৃত্তি করিতেও আমি পারিনা। জগতে কিছুই নাই, কাহারো কাছে কিছু পাই নাই, দাও দাও বলিয়া হাত বাড়াইয়া থাকিতে আমার লজ্জা করে। বইয়ে পড়িয়াছি, এই লইয়া কত বিরোধ, কত জ্বালা, মান-অভিমানের কতই না প্রমত্ত আক্ষেপ—স্নেহের সুধা গরল হইয়া উঠার কত না বিক্ষুব্ধ কাহিনী! এ সকল মিথ্যা নয় জানি, কিন্তু আমার মনের যে বৈরাগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বলিতে লাগিল, ছি ছি ছি!

বহুক্ষণ পরে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া রাজলক্ষ্মী যখন সাবধানে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, তখন জানিতেও পারিলনা যে নিদ্রাবিহীন নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। অশ্রু পড়িতেই লাগিল, কিন্তু আজিকার আয়ত্তাতীত ধন একদিন আমারই ছিল বলিয়া ব্যর্থ হাহাকারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আমার প্রবৃত্তি হইলনা।

১১

সকালে উঠিয়া শুনিলাম অতি প্রত্যূষেই রাজলক্ষ্মী ন করিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেছে। এবং দিনের মধ্যে যে বাড়ী আসিতে পারিবেনা এ রও পাইলাম। হইলও তাহাই। সেখানে বিরাট ও কিছু যে চলিতে লাগিল তাহা নয়, তবে দু-দশজন ণ-সজ্জনের যে গতি-বিধি হইতেছে, কিছু-কিছু ওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হইয়াছে তাহার আভাস মার জানালায় বসিয়াই অনুভব করিতাম। কি ত, কিরূপ তাহার অনুষ্ঠান, সম্পন্ন করিলে স্বর্গের কতখানি সুগম হয়, ইহার কিছুই জানিতামনা, জানার কৌতূহলও ছিলনা। রতন প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিত। বলিত, আপনি একবারও গেলেননা বাবু?

জিজ্ঞাসা করিতাম, তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

রতন একটু মুস্কিলে পড়িত। সে এইভাবে জবাব দিত যে, আমার একেবারে না যাওয়াটা লোকের চোখে যেন কেমন-কেমন ঠেকে। হয়ত বা কেউ মনে করে, এতে আমার অনিচ্ছা। বলা যায়না তো?

না, বলা কিছুই যায়না। প্রশ্ন করিতাম, তোমার মনিব কি বলেন?

রতন বলিত, তাঁর ইচ্ছে ত জানেন, আপনি না থাকলে কিছুই তাঁর ভাল লাগেনা। কিন্তু কি করবেন, তাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, রোগা শরীর, এতখানি হাঁটলে অসুখ করতে পারে। আর এসে হবেই বা কি!

বলিলাম, সে তো ঠিক। তা'ছাড়া তুমি ত জানো রতন, এই সব পূজা-অর্চ্চা, ধর্ম্মকর্ম্মের মাঝখানে আমি ভয়ানক বে-মানান্ হয়ে পড়ি। যাগ-যজ্ঞের ব্যাপারে আমার একটু গা-আড়াল দিয়ে থাকাই ভাল। ঠিক না?

রতন সায় দিয়া বলিত, সে ঠিক! কিন্তু আমি বুঝিতাম রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়া, আমার উপস্থিতি তথায়—কিন্তু থাক্ সে।

হঠাৎ মস্ত একটা সুখবর পাইলাম। মনিবের সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিবার অজুহাতে গমস্তা কাশীনাথ কুশারী মহাশয় সস্ত্রীক গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বলিস্ কি রতন, একেবারে সস্ত্রীক?

আজ্ঞে হাঁ। তাও আবার বিনা নেমতন্নে।

বুঝিলাম ভিতরে রাজলক্ষ্মীর কি একটা কৌশল আছে। সহসা এমনও মনে হইল, হয়ত এই জন্যই সে নিজের বাটীতে না করিয়া অপরের গৃহে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছে।

রতন কহিতে লাগিল, বড় গিন্নীর বিনকে কোলে নিয়ে সে কি কান্না! ছোট মা'ঠাকরুণ স্বহস্তে তাঁর পা ধুইয়ে দিলেন, খেতে চাননি বলে আসন পেতে ঠাঁই করে ছোট মেয়ের মত তাঁকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিলেন। মা'র চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্লো, ব্যাপার দেখে বুড়ো কুশারী-ঠাকুরমশাই ত একেবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠ্লেন,—আমার ত বোধ হয়, বাবু, কাজ-কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলে ছোট মাঠাকরুণ এবার ওই ভাঙা কুঁড়েটার মায়া কাটিয়ে নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্বেন। তা যদি হয় ত গাঁ শুদ্ধ সবাই খুসি হবে। আর এ কীর্ত্তি যে আমার মায়ের সেও কিন্তু আপনাকে আমি বলে দিচ্চি বাবু!

সুনন্দাকে যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এতখানি আশান্বিত হইতে পারিলামনা, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর উপর হইতে আমার অনেকখানি অভিমান শরতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত দেখিতে দেখিতে সরিয়া গিয়া চোখের সুমুখটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

এই দু'টি ভাই ও জায়েদের মধ্যে বিচ্ছেদ যেখানে সত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, মনের মধ্যে এতটুকু চিহ্ন্ না থাইয়াও বাহিরে যেখানে এতবড় ভাঙন ধরিয়াছে,—সেই ফাটল জোড়া দিবার মত হৃদয় ও কৌশল যাহার আছে তাহার মত শিল্পী আর আছে কোথায়? এই উদ্দেশ্যে কতদিন হইতেই না সে গোপনে উদ্যোগ করিয়া আসিতেছে! একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম এই সদিচ্ছা যেন তাহার পূর্ণ হয়। কিছুদিন হইতে আমার অন্তরের মধ্যে নিভৃতে যে ভার সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অনেকখানি হাল্কা হইয়া গিয়া আজিকার দিনটা আমার বড় ভাল কাটিল। কোন্ শাস্ত্রীয় ব্রত রাজলক্ষ্মী নিয়াছে আমি জানিনা, কিন্তু আজ তাহার তিনদিনের মিয়াদ পূর্ণ হইয়া কাল আবার দেখা হইবে, এই কথাটা বহুদিন পরে আবার যেন নূতন করিয়া স্মরণ হইল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী আসিতে পারিলনা, কিন্তু অনেক দুঃখ করিয়া রতনের মুখে খবর পাঠাইল যে, এমনি অদৃষ্ট একবার দেখা করিয়া যাইবারও সময় নাই,—দিন-ক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। নিকটে কোথায় বক্রেশ্বর বলিয়া তীর্থ আছে, সেখানে জাগ্রত দেবতা এবং গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহাতে অবগাহন স্নান করিলে শুধু কেবল সেই নয়, তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের তিনকোটি জন্মের

...লোকালের পরিচয়, অতএব বাল্যবন্ধু ত বটেই। ...র বছর পনেরো খবরা-খবর ছিলনা, হঠাৎ চিনিতে ...রি নাই। কিন্তু দিন দুয়ের মধ্যেই অকস্মাৎ এ... ঘোরতর মাখামাখি! তাঁহার কলেরায় ...কিৎসার ভার, শুশ্রূষার ভার, মায় তাঁর পঁদেড়েক ...টিকাটা কুলির খবরদারির ভার গিয়া পড়িল ...মার উপর। বাকি রহিল শুধু তাহার সোনার ...টি এবং টাট্টু ঘোড়াটা। আর বোধ হয় যেন ওই ...ই ঘোড়াটাও তাহার মানসচক্ষের অনির্বচনীয় ...টিরী ভাবার অধিকাংশই ঢেকিতে লাগিল, কেবল ...টুকু ঠেকিলনা যে মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই সে ...মাকে পাইয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছে। যাই, ...র ত্রুটী রাখি কেন, ঘোড়াটিকে একবার দেখিয়া ...সিগে।

ভাবিলাম আমার অদৃষ্টই এমনি। না হইলে ...কলখাই বা আসিত কিরূপে, অতগুলাই বা আমাকে ...া তাহার দুঃখের বোঝা বহাইত কেমন করিয়া? ...র এই বাক্স এবং তাহার কুলি গাড়ু। কোন ...দির পক্ষেই ত এ সকল ঝাড়িয়া ফেলিতে এক ...র্তের অধিক সময় লাগিতনা। আর আমিই বা ...রাজীবন বহিয়া বেড়াই কিসের জন্য?

তাঁবুটা রেল কোম্পানির। সতীশের নিজস্ব ...দির একটা তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিয়া ...ইলাম। কয়েকটা এনামেলের বাসন, একটা ...াঙ্ক, একটা লোহার তোরঙ্গ, একটা কেরোসিন ...লের বাক্স, এবং তাহার শয়ন করিবার ক্যাম্বিশের ...াট, বহু ব্যবহারে ডোঙার আকার ধারণ করিয়াছে। ...ীণ চালাক লোক, এ খাটে বিছানার প্রয়ো... ...ন হয়না, একখানা ঢাকা হইলেই চলিয়া যায়, ...াই ডোরাকাটা একখানা সতরঞ্চি ছাড়া আর ...ছুই সে কেনে নাই। ভবিষ্যতে কলেরা হওয়ার ...নি ব্যবস্থাই তাহার ছিলনা। কেম্বিশের খাটে ...রোগী করার অত্যন্ত অসুবিধা, এবং একমাত্র ...তরঞ্চি অতিশয় নোংরা হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, ...াহাকে নীচে শোয়ানো ছাড়া উপায় নাই।

আমি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠিলাম ...রেটির নাম কালিদাসী, জিজ্ঞাসা করিলাম, কালী ...রও দু'একখানা বিছানা পাওয়া যাবে?

কালী কহিল, না।

কহিলাম, দুটি খড়-টড় যোগাড় করে আনতে ...রিস?

কালী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া যাহা বলিল ...াহার অর্থ এই যে এখানে কি গোরু আছে?

কহিলাম, বাবুকে তা'হলে শোয়াই কোথায়?

কালী নির্ভয়ে মাটি দেখাইয়া কহিল হেথাকে। উ কি বাঁচ্‌বেক্।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া মনে হইল, এমন নির্বিকল্প প্রেম জগতে সুদুর্লভ। মনে মনে বলিলাম, কালী, তুমি ভক্তির পাত্র। তোমার কথাগুলি শুন্‌লে আর মোহ-মুদ্গর পাঠের আবশ্যকতা থাকেনা। কিন্তু আমার সেরূপ বিজ্ঞান-ময় অবস্থা নয়, লোকটা এখনও বাঁচিয়া; কিন্তু একটা পাতা চাই-ই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুর পরণের একখানা কাপড় চোপড়ও কি নাই?

কালী ঘাড় নাড়িল। তাহার মধ্যে দ্বিধা সঙ্কোচ ছিলনা। সে 'বোধ হয়' বলেনা। কহিল, কাপড় নেই, পেণ্টুলুন আছে।

পেণ্টুলুন সাহেবি জিনিস, মূল্যবান বস্তু, কিন্তু তাহাদ্বারা শয্যারচনার কাজ চলে কিনা ভাবিয়া পাইলামনা। সহসা মনে পড়িল আসিবার সময় অদূরে একটা ছিন্ন জীর্ণ ত্রিপল দেখিয়াছিলাম, কহিলাম, চলনা যাই, দুজনে ধরা-ধরি করে সেটা নিয়ে আসি। পেণ্টুলুন পাতার চেয়ে সে ভাল হবে।

কালী রাজি হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তখনও তাহা পড়িয়া ছিল, আনিয়া তাহাতেই সতীশ ভরদ্বাজকে শোয়াইয়া দিলাম। তাহারই একধারে কালী অত্যন্ত সবিনয়ে স্থান লইল, এবং দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ধারণা ছিল, মেয়েদের নাক ডাকেনা। কালী তাহাও অপ্রমাণ করিয়া দিল।

আমি একাকী সেই কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া। এদিকে সতীশের হাতে-পায়ে ঘন ঘন খিল ধরিতেছে, সেক তাপের প্রয়োজন, বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া কালীকে তুলিলাম, সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া জানাইল, কাট-কুটা নাই, সে আগুন জ্বালিবে কি দিয়া? নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতাম, কিন্তু আলোর মধ্যে সম্বল এই হারিকেন লণ্ঠনটি। তথাপি একবার তাহার রান্নাঘরে গিয়া খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কালী মিথ্যা বলে নাই। এই কুটীরটা ছাড়া অগ্নি সংযোগ করিতে পারি এরূপ দ্বিতীয় বস্তু নাই। কিন্তু সাহস হইলনা, পাছে প্রাণ বাহির হইবার পূর্বেই তাহাকে সৎকার করিয়া ফেলি! ক্যাম্পখাট এবং কেরোসিনের বাক্স বাহিরে আনিয়া দেশলাই জ্বালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইলাম, নিজের জামা খুলিয়া পুঁটুলির মত করিয়া কিছু কিছু সেক দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া রোগীর কোন উপকারই তাহাতে হইলনা।

রাত্রি দুটোই হইবে কি তিনটাই হইবে খবর আসিল জন দুই কুলির ভেদ-বমি হইতেছে। তাহারা আমাকে ডাক্তারবাবু বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহাদেরই আলোর সাহায্যে ঔষধপত্র লইয়া কুলি-লাইনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মালগাড়ীতে তাহারা থাকে। ছাদ-বিহীন, খোলা ট্রেকের সারি লাইনের উপর দাঁড়াইয়া আছে, মাটিকাটার প্রয়োজন হইলে ইঞ্জিন জুড়িয়া দিয়া তাহাদের গম্য স্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

বাঁশের মই দিয়া ট্রেকের উপরে উঠিলাম। একধারে একজন বুড়াগোছের লোক শুইয়া আছে, তাহার মুখের পরে আলো পড়িতেই বুঝা গেল রোগ সহজ নয়, ইতিমধ্যেই অনেকদুর অগ্রসর হইয়া গেছে। অন্য ধারে জন পাঁচসাত লোক, স্ত্রী পুরুষ দুইই আছে, কেহ বা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কাহারও বা তখন পর্য্যন্ত সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে নাই।

ইহাদের জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেশ বাঙলা বলিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিলাম, আর একজন রোগী কই?

সে অন্ধকারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আর একখানা ট্রেক্ দেখাইয়া কহিল, উখানে।

পুনরায় মই দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, এবার একজন স্ত্রীলোক: বয়স পচিশ ত্রিশের অধিক নয়, দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাহার পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। স্বামী নাই, সে গত বৎসর আড়কাঠির পাল্লায় পড়িয়া অপর একটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্ত্রীলোক লইয়া আসামে চা বাগানে কাজ করিতে গিয়াছে।

এ গাড়ীতেও আরও জন পাঁচ-ছয় স্ত্রী-পুরুষ ছিল, তাহারা একবাক্যে উহার পাষণ্ড স্বামীর নিন্দা করা ছাড়া আমার বা রোগিণীর কোন সাহায্যই করিল না। পাঞ্জাবী ডাক্তারের শিক্ষামত উভয়কেই ঔষধ দিলাম, শিশু দু'টাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও তাহাদের ভার লইতে স্বীকার করাইতে পারিলাম না।

সকাল নাগাদ আর একটা ছেলের ভেদ-বমি সুরু হইল, ওদিকে সতীশ ভরদ্বাজের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইয়াই আসিতেছে। বহু সাধ্যসাধনায় একজনকে পাঠাইলাম সাঁইথিয়া ষ্টেসনে পাঞ্জাবী ডাক্তারকে খবর দিতে। সে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল তিনি আর কোথায় গিয়াছেন রোগী দেখিতে।

আমার সব চেয়ে মুস্কিল হইয়াছিল সঙ্গে টাকা ছিলনা। নিজে ত কাল হইতে উপবাসে আ নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে না হয় হই কিন্তু জল না খাইয়া বাঁচি কিরূপে? ঐ তুমুখের খাদে জল ব্যবহার করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিলা কিন্তু কেহই কথা শুনিলনা। মেয়েরা মৃদু হা জানাইল, এ ছাড়া জল আর আছে কোথায় ডাক্তার কিছুদূরে গ্রামের মধ্যে জল ছিল, কিন্তু বায় কে তাহারা মরিতে পারে, কিন্তু বিনা পয়সায় এই ব কাজ করিতে রাজী নয়।

এমনি করিয়া ইহাদের সঙ্গে এই ট্রেকের উপরে আমাকে দুই দিন তিন রাত্রি বাস করিতে হই কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলামনা, সব কয়টাই ম কিন্তু মরাটাই এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় ব্যাপার ন মানুষ জন্মাইলেই মরে, কেহ দু'দিন আগে, কে দু'দিন পরে,—এ আমি সহজে এবং অত্যন্ত অনায়া বুঝিতে পারি। বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাইনা এ মোটা বুঝিবার জন্য এত শাস্ত্রালোচনা, এত বৈরাগ সাধনা, এত প্রকারের তত্ত্ববিচারের প্রয়োজ হয় মানুষের কিসের জন্য? সুতরাং মানুষে মরণ আমাকে বড় আঘাত করেনা, ক মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতে পারিনা।

পরদিন সকালে ভরদ্বাজের দেহত্যাগ হই লোকাভাবে দাহ করা গেলনা, মা ধরিত্রী তাহা কোলে স্থান দিলেন।

ওদিকের কাজ মিটাইয়া ট্রেকে ফিরিয়া আসিলা না আসিলেই ছিল ভাল, কিন্তু পারিয়া উঠিলামনা। জনারণ্যের মাঝখানে রোগীদের লইয়া আমি নিছক একাকী। সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে এ দু'টা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সার জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। প্রথম সূর্য্যতাপে চারিদিকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহারই মাঝে ত্রিপলের নীচে রোগীদের লইয়া আমি একা। ছোট ছেলেটা যে কি দুঃখই পাইতে লাগিল তাহার অবধি নাই, অথচ এক ভাঁড় জল দিবার পর্য্যন্ত কেহ নাই সরকারি কাজ, মাটি-কাটা বন্ধ থাকিতে পারেনা হপ্তার শেষে মাপ করিয়া তাহার মজুরি মিলিবে অথচ তাহাদেরই স্বজাতি, তাহাদেরই ত ছেলে গ্রামের মধ্যে দেখিয়াছি, কিছুতেই ইহারা এমন ধারা নয়। কিন্তু, এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে সর্ব্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলাকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটিকাটার জন্যই

সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রেকের উপর জমা করা হইয়াছে, সেইখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকি নাই। শুধু মাটি কাটা, শুধু মজুরি। শুধু মানুষে এ কথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায়না।

ভরদ্বাজ গিয়াছে, কিন্তু তাহার অমর-কীর্তি তাড়ির দোকান অক্ষয় হইয়া আছে। সন্ধ্যাবেলায় নরনারী দিনের শেষে মাতাল হইয়া দলে দলে ফিরিয়া আসিল, দুপুর বেলার রাঁধা ভাত হাঁড়িতে জল দেওয়া আছে, এ বেলায় কাহারো ভাবনা নাই। তাহার পরে কে বা কাহার কথা শুনে। জমাদারের গাড়ী হইতে ঢোল ও করতাল সহযোগে প্রবল সঙ্গীতচর্চা হইতে লাগিল, সে যে কখন্ থামিবে জানিয়া পাইলামনা। কাহারও জন্য তাহাদের মাথাব্যথা নাই। আমার ঠিক পাশের ট্রেকেই কে একটা জোয়ান বোধ হয় জন দুই প্রণয়ী জুটিয়াছে, সারা রাত্রি ধরিয়া তাহাদের উদ্দাম প্রেমলীলার বিরাম নাই; এদিকে ট্রেকে এক বাটি কিছু অধিক তাড়ি খাইয়াছে; সে এমনি উচ্চ কলরোলে স্ত্রীর কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে লাগিল যে আমার লজ্জার সীমা রহিলনা। দূরের একটা গাড়ী হইতে কে একজন স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে বিলাপ করিতেছিল, তাহার কা ঔষধ চাহিতে আসায় খবর পাইলাম কামিনীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। লজ্জা নাই, সরম নাই, গোপনীয় কোথাও কিছু নাই,—সমস্ত খোলা, সমস্ত অনাবৃত। জীবনযাত্রার অবাধ গতি উদ্দাম প্রকাশ্যতায় অপ্রতিহতবেগে চলিয়াছে! শুধু আমিই কেবল দল ছাড়া। আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী মা ও তাহার ছেলেকে লইয়া গভীর আঁধার রাতে একাকী বসিয়া আছি।

ছেলেটা বলিল, জল?

মুখের উপর ঝুঁকিয়া কহিলাম, জল নেই বাবা, সকাল হোক্।

ছেলেটা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা। তার পরে চোখ বুজিয়া নিশ্চুপে রহিল।

তৃষ্ণার জল না থাক্, কিন্তু আমার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। হায় রে, হায়! শুধু কেবল মানবের সুকুমার হৃদয়-বৃত্তিই নয়, নিজের দুঃসহ যাতনার প্রতিও কি অপরিসীম ঔদাসীন্য! এই ত পশু! এ ধৈর্য্য-শক্তি নয়, জড়তা। এ সহিষ্ণুতা মানবতার ঢের নীচের স্তরের বস্তু।

আমাদের ট্রেকের অন্য লোকগুলা অকাতরে ঘুমাইতেছে। কালী-পড়া হরিকেনের অত্যন্ত মলিন আলোকেও আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম মা ও ছেলে উভয়েরই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া খিল ধরিয়াছে। কিন্তু কি-ই বা আমার করিবার ছিল!

সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে দিকে চাহিয়া আমি বেদনায়, ক্ষোভে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বারবার করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম, আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা,—তোরা মর্। কিন্তু যে নির্ম্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস্না! যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।

১২

সকালে খবর পৌঁছিল আর দুই জন পীড়িত হইয়াছে। ঔষধ দিলাম, জমাদার সাঁইথিয়ায় সম্বাদ পাঠাইয়া দিল। আশা করিলাম, এবার কর্তৃপক্ষের আসন টলিবে।

বেলা নয়টা আন্দাজ ছেলেটা মরিল। ভালই হইল। এই ত ইহাদের জীবন।

সম্মুখের মাঠের পথ দিয়া দুই জন ভদ্রলোক ছাতি মাথায় দিয়া চলিয়াছিলেন; কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে গ্রাম কত দূরে?

যিনি বৃদ্ধ, তিনি মুখটা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন, ঐ যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, খাবার জিনিস কিছু মেলে?

অল্পজন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, মেলেনা কি রকম! ভদ্রলোকের গ্রাম, চাল, ডাল, ঘি, তেল তরি-তরকারি যা খুসি আপনার। আসছেন কোথা থেকে? নিবাস? মশায়, আপনারা?

সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া সতীশ ভরদ্বাজের নাম করিতেই উভয়ে রুষ্ট হইয়া উঠিলেন, বৃদ্ধ বলিলেন, মাতাল, বদমাইস, জোচ্চোর!

তাঁহার সঙ্গী কহিলেন, রেলের লোক আর কত ভাল হবে! কাঁচা পয়সাটা বেশ হাতে ছিল কিনা!

প্রত্যুত্তরে সতীশের টাট্‌কা কবরের ঢিপিটা আমি হাত দিয়া দেখাইয়া জানাইলাম, এখন তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। কাল সে মরিয়াছে, লোকাভাবে দাহ করিতে পারা যায় নাই, ঐখানে মাটি দিতে হইয়াছে।

বলেন কি! বামুনের ছেলেকে—

কিন্তু উপায় কি ?

শুনিয়া উভয়েই ক্ষুব্ধ হইয়া জানাইলেন যে, ভদ্রলোকের গ্রাম, একটুখানি খবর পাইলে যাহোক, একটা উপায় নিশ্চয় হইয়া যাইত। একজন প্রশ্ন করিলেন, আপনি তাঁর কে ?

বলিলাম, কেউ না। সামান্য পরিচয় ছিল মাত্র। বলিয়া কি করিয়া এখানে জুটিলাম সংক্ষেপে তার বিবরণ দিলাম। দুইদিন খাওয়া হয় নাই, অথচ, কুলিদের মধ্যে কলেরা সুরু হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছি না।

খাওয়া হয় নাই শুনিয়া তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং সঙ্গে যাইবার জন্য বারম্বার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং, এই ভয়ানক ব্যাধির মধ্যে খালি পেটে থাকা যে মারাত্মক ব্যাপার তাহাও একজন জানাইয়া দিলেন।

বেশি বলিতে হইল না,—বলার প্রয়োজনই ছিল না, ক্ষুৎপিপাসায় মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছিলাম,—তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। পথে এই বিষয়েই আলাপ হইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের লোক, সহরের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু মজা এই যে, ইংরাজ রাজত্বের খাঁটি পলিটিক্সটুকু তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত নয়। এ যেন দেশের লোকে দেশের মাটি হইতে, জল হইতে, আকাশ হইতে, বাতাস হইতে অস্থি-মজ্জা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

উভয়েই কহিলেন, সতীশ ভরদ্বাজের দোষ নেই মশায়, আমরা হলেও ঠিক অমনি হয়ে উঠতাম। কোম্পানি বাহাদুরের সংস্পর্শে যে আসবে সেই চোর না হয়ে পারবে না। এমনি এঁদের ছোঁয়াচের গুণ।

ক্ষুধার্ত ও একান্ত ক্লান্ত দেহে অধিক কথা কহিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, কি দরকার ছিল মশাই, দেশের বুক চিরে আবার একটা রেলের লাইন পাতবার ? কোন লোকে কি তা' চায় ? চায় না। কিন্তু তবু চাই। দীঘী নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই,—গ্রীষ্মকালে বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায় ;—কোথাও একটু ভালো খাবার জল থাকলে কি সতীশ বাবুই মারা যেতেন ? কখ্খনো না। ম্যালেরিয়া, কলেরা হরেক রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজোড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ! কর্তারা আছেন শুধু রেল গাড়ী চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান্ করে নিয়ে যেতে। কি বলেন মশাই ? ঠিক না ?

আলোচনা করিবার মত গলার জোর ছিল না বলিয়াই শুধু ঘাড় নাড়িয়া নিঃশব্দে সায় দিয়া মনে মনে সহস্রবার বলিতে লাগিলাম, এই এই, এই ! কেবলমাত্র এই জন্যই তেত্রিশ কোটী নর-নারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীয় শাসন-তন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেল-পথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্ব্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম্ম গেল—তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিতেছে,—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার এই চিন্তাতেই যেন বাক্য যোজনা রাখিয়া কহিলেন, মশাই, ছেলেবেলায় মামার বাড়ীতে আমি মানুষ, আগে বিশ ক্রোশের মধ্যে রেল-গাড়ী ছিল না; তখন কি সস্তা, আর কি প্রচুর জিনিস-পত্রই না সেখানে ছিল। তখন কারও কিছু জন্মালে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তার একটু ভাগ পেতো, এখন থোড়, মোচা, উঠানের দু-আটি শাক পর্য্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায়না। বলে, থাক্, সাড়ে আটটার গাড়ীতে পাইকেরের হাতে তুলে দিলে দু'পয়সা আসবে। এখন দেওয়ার নাম হয়েছে অপব্যয়,—মশাই, দুঃখের কথা বলতে কি, পয়সা করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে।

আর আপনারাই কি প্রাণভরে ভোগ করতে পায় ? শুধু ত আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পাওয়াটাই হয়েছে যেন তাদের একটি মাত্র পরমার্থ।

এই সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হচ্চে এই রেলগাড়ী। শিরার মত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলের রাস্তা যদি না ঢুকতে পেতো, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকতো, আর সেই লোভে মানুষে যদি এমন পাগল হয়ে না উঠতো এত দুর্দ্দশা দেশের হোতোনা।

রেলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও কম নহে। বস্তুতঃ, যে ব্যবস্থায় মানুষের জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভার প্রতিদিন অপহৃত হইয়া, সৌখীন আবর্জ্জনায় সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা না জন্মিয়াই

পারে না। বিশেষতঃ দরিদ্র মানবের যে দুঃখ, ও যে হীনতা এইমাত্র চোখে দেখিয়া আসিলাম, কোন যুক্তি-তর্ক দিয়াই তাহার উত্তর মিলে না, তথাপি কহিলাম, আবশ্যকের অতিরিক্ত জিনিসগুলো অপচয় না ক'রে যদি বিক্রী হয়ে অর্থ আসে সে কি নিতান্তই মন্দ?

ভদ্রলোক লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ, নিতান্ত মন্দ, নিছক অকল্যাণ।

ইঁহার ক্রোধ ও ঘৃণা আমার অপেক্ষা ঢের বেশি প্রচণ্ড। বলিলেন, এই অপচয়ের ধারণাটা আপনার বিলাতের আমদানি, ধর্মস্থান ভারতবর্ষের মাটিতে এর জন্ম হয় নি,—জন্ম হতেই পারে না। মশাই, মাত্র নিজের প্রয়োজনটুকুই কি একমাত্র সত্য? যার নেই তার প্রয়োজন মিটানোর কি কোন মূল্যই পৃথিবীতে নেই? সেটুকু বাইরে চালান দিয়ে অর্থ সঞ্চয় না করাই হল অপচয়, হল অপরাধ? এই নির্মম, নিষ্ঠুর উক্তি আমাদের মুখ দিয়ে বার হয়নি, বার হয়েছে তাদের যারা বিদেশ থেকে এসে দুর্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার দেশব্যাপী জালে ফাঁসের পরে ফাঁস যোজনা করে চলেছে।

বলিলাম, দেখুন, দেশের অন্ন বিদেশে বার করে নিয়ে যাবার আমি পক্ষপাতী নই, কিন্তু একের উদ্বৃত্ত অন্নে অপরের চিরদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে থাকবে এইটেই কি মঙ্গলের? তাছাড়া, বাস্তবিক বিদেশ থেকে এসে ত তারা জোর করে কেড়ে নিয়ে যায় না? অর্থ দিয়ে কিনে নিয়েই ত যায়?

ভদ্রলোক তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ, কিনেই বটে! বড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলা যেমন মাছের সাদর নিমন্ত্রণ।

এই ব্যঙ্গোক্তির আর উত্তর দিলাম না। কারণ, একে ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রান্তিতে বাদানুবাদের শক্তি ছিলনা, অপিচ তাঁহার বক্তব্যের সহিত মূলতঃ আমার বিশেষ মতভেদও ছিলনা।

কিন্তু আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং আমাকেই প্রতিপক্ষ জ্ঞানে অত্যন্ত উষ্মার সহিত বলিতে লাগিলেন, মশাই, ওদের উদ্দাম বণিকবুদ্ধির কষাকষিটুকুকেই সার সত্য বলে বুঝে আছেন, কিন্তু আসলে এতবড় অসৎ বস্তু পৃথিবীতে আর নেই। ওরা জানে শুধু ষোল আনার পরিবর্তে চৌষট্টি পয়সা গুণে নিতে,—ওরা বোঝে কেবল দেনা আর পাওনা, ওরা শিখেছে শুধু ভোগটাকেই মানব জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে স্বীকার করতে। তাই ত ওদের পৃথিবী জোড়া সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ব্যসন জগতের সমস্ত কল্যাণ আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। মশাই, এই রেল, এই কল, এই লোহা বাঁধানো রাস্তা,—এই ত হল পবিত্র vested interest,—এর গুরুভারেই ত সংসারে কোথাও গরীবের নিশ্বাস ফেলবার যায়গা নেই!

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি বলছিলেন একের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুটুকু চালান দেবার সুযোগ না থাকলে হয় নষ্ট হোতো, না হয় অভাব-গ্রস্তেরা বিনামূল্যে খেতো। একেই অপচয় বল্‌ছিলেন না?

কহিলাম, হাঁ, তার দিক দিয়ে অপচয় বৈ কি।

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তরে অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এ সব বিলাতি বুলি, অর্ব্বাচীন অধার্ম্মিকের অজুহাত। কারণ, আর একটু যখন বেশি চিন্তা করতে শিখবেন, তখন, আপনারই সন্দেহ হবে বাস্তবিক এইটেই অপচয়, না দেশের শস্য বিদেশে রপ্তানি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমানোটাই বেশি অপচয়। দেখুন মশাই, চিরদিনই আমাদের গ্রামে গ্রামে জনকতক উদ্যমহীন, উপার্জ্জনবিমুখ উদাসীন প্রকৃতির লোক থাকতো, তাদের মুদি-ময়রার দোকানে দাবা পাশা খেলে, মড়া পুড়িয়ে, বড় লোকের আড্ডায় গান-বাজনা করে, বারওয়ারী-তলায় মুরুব্বী করে, আরও—এম্‌নি সব অকাজেই দিন কাটতো। তাদের সকলেরই যে ঘরের মধ্যে অন্ন-সংস্থান থাকতো তা' নয়, তবুও অনেকের উদ্বৃত্ত অংশেই তাদের সুখে দুঃখে দিন চলে যেতো। আপনাদের, অর্থাৎ, ইংরেজি-শিক্ষিতদের যত আক্রোশ তাদের পরেই ত? যাক্, চিন্তার হেতু নেই এই সব অলস, অকেজো পরাশ্রিত মানুষগুলো এখন লোপ পেয়েছে। কারণ, উদ্বৃত্ত বলে ত আর কোথাও কিছু নেই, সুতরাং, হয় অন্নাভাবে মরেছে, না হয়, কোথাও গিয়ে কোন ছোট দাস্য-বৃত্তিতে ভর্ত্তি হয়ে জীবন্মৃত ভাবে পড়ে আছে। ভালই হয়েছে। মেহনতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে,—কিন্তু আমার মত যাদের বেশি বয়স হয়েছে তারাই জানে কি গেছে! জীবন-সংগ্রাম তাদের বিলুপ্ত করেছে—কিন্তু সমস্ত গ্রামের আনন্দটুকুও যেন তাদেরই সঙ্গে সহমরণে গেছে!

এই শেষ কথাটায় চকিত হইয়া তাঁহার মুখে-

ন ? তাই নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া চক্ষের পলকে ন হইল ঐশ্বর্য্যের সেই অপরিমেয় গৌরব যদি চাই আজ মিথ্যা মরীচিকায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে ত গলগ্রহ, ভগ্ন-স্বাস্থ্য, অবাঞ্ছিত গৃহস্বামীর ভাগ্যে ডুখি আহ্বান করিবার বিড়ম্বনা যেন না আর ঘটে।

আমাকে নীরব দেখিয়া আনন্দ তেমনি হাসিমুখে লেন, আচ্ছা, নূতন করে না-ই যেতে বললেন, ার সাবেক নিমন্ত্রণ পুঁজি আছে, আমি সেই তেই হাজির হতে পারবো।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে কাজটা কি নাগাদ ত পারবে ?

আনন্দ হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই দাদা, আপ-দের রাগ পড়বার ভেতরে গিয়ে উত্ত্যক্ত রবনা,—তার পরেই যাবো।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রাগ করিয়া যে সি নাই তাহা বলিতেও ইচ্ছা হইলনা।

পথ কম নহে, গাড়োয়ান ব্যস্ত হইতেছিল, গাড়ী ড়িয়া দিলে তিনি আর একবার নমস্কার করিয়া সরাইয়া লইলেন।

এ অঞ্চলে যান-বাহনের প্রচলন নাই, সে উদ্দেশ্যে তৈরী করিয়াও কেহ রাখে নাই, গো-শকট মাঠ ঙিয়া, উঁচু-নীচু খানা-খন্দ অতিক্রম করিয়া যদৃচ্ছা লতে লাগিল। ভিতরে অর্দ্ধশায়িতভাবে পড়িয়া নন্দ সন্ন্যাসীর কথার সুরটাই আমার কানের ধা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাগ করিয়া আসি ই, ওংবস্তটা লাভেরও নয়,—লোভেরও নয়, কিন্তু বলি মনে হইতে লাগিল এও যদি সত্য হইত। কিন্তু া নয়, সত্য হইবার পথ নাই। মনে মনে বলিতে লাম, রাগ করিব কাহার উপরে ? কিসের ? কি তাহার অপরাধ ? ঝরণার জলধারার কার লইয়াই বিবাদ করা চলে, কিন্তু উৎস-মুখে ই যদি শেষ হইয়া থাকে ত শুষ্ক খাদের বিরুদ্ধে া খুঁড়িয়া মরিব কোন্ ছলনায় ?

এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়াছিল হুঁস্ করি ই। হঠাৎ খাদের মধ্যে গাড়ী গড়াইয়া পড়ায় কানি খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। সুমুখের চটের া সরাইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সন্ধ্যা হয় হয়। ড়ীর চালকটি ছেলেমানুষ, বোধ করি বছর নরোর বেশি হইবেনা। বলিলাম, ওরে, এত যায়গা ছেড়ে খানায় নাম্‌লি কেন ?

ছেলেটি তাহার রাঢ় দেশের ভাষায় তৎক্ষণাৎ াব দিল, নাম্‌বো কিসের তরে ? বলদ আপনি ম গেল।

নেমে গেল কি রে ? তুই কি গোরু ধরতে পারিস্‌নে ?

না। বলদ নতুন যে।

খুব ভালো। কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার হ এলো, গঙ্গামাটি আর কতদূরে ?

তার কি জানি ! গঙ্গামাটি কখনো আস্‌চি না কি

বলিলাম, কখনো যদি আসোনি বাবা, ত আমার উপরেই বা এত প্রসন্ন হলে কেন ? কাউকে জিজ্ঞেসা করনা রে, গঙ্গামাটি আর কতদূরে ?

উত্তরে সে কহিল, এদিকে লোক আছে না কি নেই।

ছেলেটার আর যাই দোষ থাক্ জবাবগুলি যেম সংক্ষিপ্ত তেম্‌নি প্রাঞ্জল ! জিজ্ঞাসা করিলাম, তু গঙ্গামাটির পথ চিনিস্ ত ?

তেম্‌নি সুস্পষ্ট উত্তর। কহিল, না।

তবে এলি কেন রে ?

মামা বললে বাবুকে নিয়ে যা। এই সো দক্ষিণ গিয়ে পুবে বাঁক ধরলেই গঙ্গামাটি। যা আর আস্‌বি।

সমুখে অন্ধকার রাত্রি, আর বেশি বিলম্বও নাই এতক্ষণ ত চোখ বুজিয়া নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলা ছেলেটার কথায় এবার ভয় পাইয়া বলিলাম, এ সোজা দক্ষিণের বদলে উত্তরে গিয়ে পশ্চিমে বাঁ ধরিস্‌নি ত রে ?

ছেলেটা কহিল, তার কি জানি।

বলিলাম, জানিস্‌নে ত চল্ দু'জনে অন্ধকা যমের বাড়ী যাই। হতভাগা, পথ চিনিস্‌নে ত এ কেন ? তোর বাপ আছে ?

না।

মা আছে ?

না, মরে গেছে।

আপদ গেছে। চল্, তা'হলে আজ রাত্রে তাদে কাছেই যাওয়া যাক্। তোর মামার শুধু বু বিবেচনা নয়, দয়া মায়া আছে।

আর খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পরে ছেলে কাঁদিতে লাগিল, জানাইল যে আর সে যাইত পারিবেনা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, থাকিবি কোথায় ? জবাব দিল যে সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু এই অবেলা সন্ধ্যাবেলায় আমার উপায় ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি ছেলেটি স্পষ্টবক্তা কহিল, তুমি বাবু নেমে যাও মামা বলে গেছে ভাড়া পাঁ সিকে। কম দিলে আমাকে মারবে।

ভাবিলাম, আমার জন্য তুমি মার খাইবে সে আবার কেমন কথা? একবার ভাবিলাম, এই গাড়ীতেই স্টেশনে ফিরিয়া যাই। কিন্তু কেমন যেন প্রবৃত্তি হইলনা। রাত্রি আসন্ন, স্থান অপরিচিত, লোকালয় কোথায় এবং কতদূরে বুঝিবার যো নাই; কেবল সম্মুখে একটা বড় আম-কাঁটালের বাগান দেখিয়া অনুমান করিলাম গ্রাম বোধ হয় খুব বেশি দূরে হইবেনা। আশ্রয় হয়ত একটা মিলিবে। আর যদি না-ই মিলে তাহাতেই বা কি? না হয়, এমনি করিয়াই অন্ধকারের যাত্রা শুরু হইবে।

নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিলাম। দেখিলাম, ছেলেটির শুধু কথাই নয়, কাজের ধারাও চমৎকার। নিমিষে গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া লইল, বৃষ-যুগল ক্রত প্রত্যাগমনের ইঙ্গিত মাত্র চোখের পলকে চোখের অদৃশ্য হইয়া গেল।

১০

সন্ধ্যা শেষ হইল বলিয়া, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতে তখনও বিলম্ব ছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে যেমন করিয়া হউক আশ্রয় একটা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এ কাজ আমার পক্ষে নূতনও নহে, কঠিন বলিয়াও কোনদিন ভয় হয় নাই। কিন্তু আজ সেই আম-বাগানের পাশ দিয়া পায়ে-চলা পথের রেখা ধরিয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন কেমন যেন উদ্বিগ্ন লজ্জায় মনের ভিতরটা ভরিয়া আসিতে লাগিল। জীবনের অজ্ঞাত প্রদেশের সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন যে পথে চলিয়াছি সে যে বাঙ্গলার রাঢ় দেশ। ইহার সম্বন্ধে ত কোন অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু, এ কথা স্মরণ হইল না যে সে সকল দেশের সম্বন্ধেও একদিন এমনি অনভিজ্ঞই ছিলাম, জ্ঞান যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা এমনি করিয়াই আপনাকে সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল, অপরে করিয়া দেয় নাই।

আসল কথা, কিসের জন্য যে সেদিন দ্বার আমার সর্বত্রই মুক্ত ছিল, এবং আজ সঙ্কোচ ও দ্বিধায় তাহা অবরুদ্ধপ্রায়, সেই কথাটাই ভাবিয়া দেখিলামনা। সে দিনের সে-বাহিরের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিলনা, কিন্তু আজ যাহা করিতেছি সে শুধু সে-দিনের নকল মাত্র। সেদিন বাহিরের অপরিচিতই ছিল আমার পরমাত্মীয়, তাদের পরে নিজের ভারার্পণ করিতে তখন বাধে নাই; কিন্তু সেই ভার আজ ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি একান্ত ভাবে ন্যস্ত হইয়া সমস্ত ভার-কেন্দ্রটাই অন্যত্র অপসারিত হইয়া গেছে। তাই আজ অজানা-অচেনার মধ্যে চলিবার পা দু'টা আমার প্রতি পদেই ভারি হইয়া আসিতেছে। সেদিনের সেই সব সুখ-দুঃখের ধারণায় আজ কতই না প্রভেদ! তথাপি চলিতে লাগিলাম। এই বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের সাহসও নাই, শক্তিও গেছে,—আজিকার মত কিছু একটা পাইতেই যে হইবে।

ভাগ্য ভাল, খুব বেশি দূর হাঁটিতে হইলনা। পরক্ষণেই কি একটা গাছের ফাঁক দিয়া অট্টালিকার মত দেখা গেল। সেই পথটুকু ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

অট্টালিকাই বটে, কিন্তু মনে হইল জনহীন। সম্মুখে লোহার গেট কিন্তু ভাঙা। শিকগুলার অধিকাংশই লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। খোলা বারান্দা, বড় বড় দু'টো ঘর, একটা বন্ধ এবং যেটা খোলা তাহার দ্বারে আসিবা মাত্র একজন কঙ্কাল-সার মানুষ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, ঘরের চার কোণে চারিটা লোহার খাট—একদিন গদি পাতা ছিল, কিন্তু কালক্রমে চটগুলা লুপ্ত হইয়াছে, আছে শুধু ছোবড়ার কিছু কিছু তখনও অবশিষ্ট, একটা তেপায়া, গোটা কয়েক টিন ও এনামেলের পাত্র, তাহাদের শ্রী ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনাতীত। অনুমান যাহা করিয়াছিলাম, তাহাই বটে। বাড়ীটি হাঁসপাতাল। এই লোকটি বিদেশী, চাকুরী করিতে আসিয়া পীড়িত হইয়া দিন পনেরো হইল ইন্‌ডোর পেশেন্ট হইয়া আছে। লোকটির সহিত প্রথম আলাপ এইরূপ ঘটিল—

বাবু মশায়, গোটা চারেক পয়সা দেবেন?

কেন বল ত?

দিলেন যদি বাবু মুড়ি টুড়ি দু'টো কিনে খাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি রোগী-মানুষ যা' তা খাওয়া তোমার বারণ নয়?

আজ্ঞে, না।

এখানে তোমাকে খেতে দেয়না?

লোকটি কহিল, সকালে একবাটী সাগু দিয়াছিল তাহা সে কোন্‌কালে খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন হইতে সে গেটের কাছে বসিয়া থাকে, ভিক্ষা পায় ত আর একবেলা খাওয়া চলে, না হয় ত উপবাসে কাটে। ডাক্তার একজন আছেন, বোধ হয় যৎসামান্য হাত-খরচা মাত্র বন্দোবস্ত আছে, সকালবেলায় একবার করিয়া তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। আর একটি লোক নিযুক্ত আছে, তাহাকে কম্পাউণ্ডারি হইতে সুরু

রিয়া লণ্ঠনে তেল দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই করিতে হয়। র্বে একজন চাকর ছিল বটে, কিন্তু মাস ছয়েক ইল মাহিনা না পাওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া গেছে, খনও নূতন কেহ ভর্ত্তি হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝাঁট পাট কে দেয়?

লোকটি বলিল, আজকাল আমিই দিই। আমি লে গেলে আবার যে নতুন রুগী আসবে সেই দেবে।

কহিলাম, বেশ ব্যবস্থা। হাঁসপাতালটি কার ানো?

লোকটি আমাকে ও-দিকের বারান্দায় লইয়া গল। কড়ি হইতে একটি টিনের লণ্ঠন ঝুলিতেছে। ম্পাউণ্ডার বাবু বেলা-বেলি সেটি জালিয়া দিয়া কাজ রিয়া ঘরে চলিয়া গেছেন। দেয়ালের গায়ে আঁটা ত একটি মর্ম্মর প্রস্তর-ফলক। সোনার জল দিয়া ংরাজি অক্ষরে আগাগোড়া খোদাই-করা সন তারিখ ঙ্কিত শিলা-লিপি। জেলার যে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট পরিসীম দয়ায় ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া- ছলেন তাঁহার নাম ধাম সর্ব্বাগ্রে, নীচে প্রশস্তি পাঠ। ক একজন রায়বাহাদুর তাঁহার রত্নগর্ভা মাতার স্মৃতি ার্থে জননী-জন্মভূমিতে এই হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা রিয়াছেন। আর শুধু মাতা-পুত্রই নয়, ঊর্দ্ধতন তন-চারি পুরুষের বিবরণ। বোধ করি ছোট-খাটো ল-কারিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। লোকটি যে জ-সরকারের রায় বাহাদুরির যোগ্য তাহাতে লেশমাত্র ন্দেহ নাই। কারণ টাকা নষ্ট করার দিক দিয়া টি ছিলনা। ইঁট ও কাঠ এবং বিলাতের আমদানি দামার কড়ি-বরগার বিল্ মিটাইয়া অবশিষ্ট যদি বা কছু থাকিয়া থাকে, সাহেব শিল্পীর হাতে বংশ- গারব লিখাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। ডাক্তার রোগীর ঔষধ পথ্যাদির ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবার রত টাকাও ছিল না, ফুরসৎও ছিল না।

প্রশ্ন করিলাম, রায় বাহাদুরের বাড়ী কোথায়?

সে কহিল, বেশি দূরে নয়, কাছেই।

এখন গেলে দেখা হবে?

আজ্ঞে না, বাড়ীতে তালাবন্ধ, তাঁরা সব লকাতায় থাকেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কবে আসেন জানো?

লোকটি বিদেশী, সঠিক সম্বাদ দিতে পারিলনা, তবে কহিল যে বছর তিনেক পূর্ব্বে একবার আসিয়া- ছিলেন এ কথা সে ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিয়াছে। সর্ব্বত্র একই দশা, অতএব দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু ছিলনা।

এ দিকে অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেছিল, সুতরাং, রায় বাহাদুরের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করার চেয়ে জরুরি কাজ বাকি ছিল। লোকটিকে কিছু পয়সা দিয়া জানিয়া লইলাম যে নিকটেই একঘর চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের বাটী। তাঁহারা অতিশয় দয়ালু এবং রাত্রিটার মত আশ্রয় মিলিবেই। সে নিজেও রাজী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল, কহিল তাহাকে ও মুদীর দোকানে যাইতেই হইবে, একটু খানি ঘুর-পথ, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায়না।

চলিতে চলিতে, তাহার কথায় বার্ত্তায় বুঝিলাম এই দয়ালু ব্রাহ্মণ পরিবার হইতে সে পথ্যাপথ্য অনেক রাত্রিই গোপনে সংগ্রহ করিয়া খাইয়াছে।

মিনিট দশেক হাঁটিয়া চক্রবর্ত্তীর বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার পথিপ্রদর্শক ডাক দিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই ঘরে আছেন?

কোন সাড়া আসিলনা। ভাবিয়াছিলাম কো সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-বাটীতে আতিথ্য লইতে চলিয়াছি, কি ঘর-দ্বারের শ্রী দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল। ও দিকে সাড়া নাই, এ দিকে আমার সঙ্গীর অধ্যবসায় অপরাজেয়। তা না হইলে এই গ্রাম ও এই হাঁস পাতালে বহুদিন পূর্ব্বেই তাহার রুগ্ন-আত্মা স্বর্গী হইয়া তবে ছাড়িত। সে ডাকের উপর ডাক দিতে লাগিল।

হঠাৎ জবাব আসিল, যা যা, আজ যা। য বলচি।

লোকটি কিছুমাত্র বিচলিত হইলনা, প্রত্যুত্তরে কহিল, কে এসেছে বার হয়ে দেখুননা।

কিন্তু বিচলিত হইয়া উঠিলাম আমি। যে চক্রবর্ত্তীর পরম পূজ্য গুরুদেব গৃহ পবিত্র করিতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছি।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তে মোলায়েম হইয়া উঠি কে রে ভীম? বলিতে বলিতে গৃহস্বামী বাহির দেখা দিলেন। পরণের বস্ত্রখানি মলিন এবং অতিশ ক্ষুদ্র, অন্ধকার প্রায় সন্ধ্যার ছায়ায় তাঁহার বয় অনুমান করিতে পারিলামনা, কিন্তু খুব বেশি বলিয়া মনে হইলনা। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ভীম?

বুঝিলাম আমার সঙ্গীর নাম ভীম। ভী বলিল, ভদ্দর লোক, বামুন। পথ ভুলে হাঁসপাতা গিয়ে হাজির। আমি বোল্লাম, ভয় কি, চলুন ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে রেখে আসি, শুরু আজ থাকবেন।

বস্তুতঃ ভীম অতিশয়োক্তি করে নাই, চক্রব আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। ব

পাড়িয়া দিয়া বসিতে দিলেন, এবং তামাক ইচ্ছা করি কি না জানিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া আনিলেন।

বলিলেন, চাকরগুলো সব জ্বরে পড়ে রয়েছে,—করি কি!

শুনিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এক চক্রবর্ত্তীর গৃহ ছাড়িয়া আর এক চক্রবর্ত্তীর গৃহে আসিয়া পড়িলাম। কে জানে আতিথ্যটা এখানে কিরূপ দাঁড়াইবে। তথাপি, হুঁকাটি হাতে পাইয়া টানিবার উপক্রম করিয়াছি, সহসা অন্তরাল হইতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, হাঁ গাঁ, কে মানুষটি এলো?

অনুমান করিলাম, ইনিই গৃহিণী। জবাব দিতে চক্রবর্ত্তীরই শুধু গলা কাঁপিলনা, আমারও যেন হৃৎকম্প হইল।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, মস্ত লোক গো মস্ত লোক। অতিথি ব্রাহ্মণ—নারায়ণ! পথ ভুলে এসে পড়েছেন,—শুধু রাত্রিটা,—ভোর না হতেই খাবার সকালেই চলে যাবেন।

ভিতর হইতে জবাব আসিল, হাঁ সবাই আসে পথ ভুলে! মুখপোড়া অতিথের আর কামাই নেই। ঘরে না আছে একমুঠো চাল, না আছে একমুঠো ডাল,—খেতে দেবে কি উনুনের পাঁশ?

আমার হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, আহা, কি যে বল তুমি! আমার ঘরে খাবার চাল ডালের অভাব। চল চল, ভেতরে চল সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী ভিতরে যাইবার জন্য বাহিরে আসেন নাই। বলিলেন, কি ঠিক করে দেবে শুনি? আছে ত খালি মুঠো খানেক চাল, ছেলেমেয়ে দুটোকে রাত্তিরের মত সেদ্ধ করে দেব। বাছাদের উপোসি রেখে ওকে দেব গিল্‌তে? মনেও কোরোনা।

মা লক্ষ্মি, ক্ষিধা হও! না না করিয়া কি একটা বলিতে গেলাম, কিন্তু চক্রবর্ত্তীর বিপুল ক্রোধে তাহা ভাসিয়া গেল। তিনি ভূমি ছাড়িয়া তখন ভুঁই দিলেন। এবং অতিথি-সৎকার লইয়া স্বামী স্ত্রীতে যে আলাপ সুরু হইল তাহার ভাষাও যেমন, তীব্রতাও তেমনি। আমি টাকা লইয়া বাহির হই নাই, পকেটে সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছিল। শুধু গলায় সোণার বোতাম ছিল, কিন্তু কে বা কাহার কথা শোনে। ব্যাকুল হইয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে চক্রবর্ত্তী জোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, অতিথি নারায়ণ! বিমুখ হয়ে গেলে গলায় দড়ি দেব।

গৃহিণী কিছুমাত্র ভীত হইলেননা, তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ অ্যাক্‌সেপ্ট করিয়া কহিলেন, তা'হলে ত বাঁচি। ভিক্ষে-শিক্ষে করে বাছাদের খাওয়াই।

এদিকে আমার ত প্রায় হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছিল; হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, চক্রবর্ত্তী মশাই, সে না হয় একদিন ভেবে চিন্তে ধীরে সুস্থে করবেন,—করাই ভাল,—কিন্তু সম্প্রতি আমাকে হয় ছাড়ুন, না হয় একগাছা দড়ি দিন ঝুলে পড়ে আপনার আতিথ্যের দায় থেকে মুক্ত হই।

চক্রবর্ত্তী অন্তঃপুর লক্ষ্য করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন, আক্কেল হল? বলি, শিখলি কিছু?

পাল্টা জবাব আসিল, হাঁ। মুহূর্ত্ত কয়েক পরে ভিতর হইতে শুধু একখানি হাত বাহির হইয়া, দুম্ করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বসাইয়া দিয়া আদেশ হইল, যাও, শ্রীমন্তর দোকানে এটা রেখে চাল ডাল তেল নুন নিয়ে এসোগে। দেখো যেন মিন্‌সে হাতে পেয়ে সব কেটে না নেয়।

চক্রবর্ত্তী খুসি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আরে, না না, এ কি ছেলের হাতের নাড়ু?

চট্ করিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া বার কয়েক টান দিয়া কহিলেন, আগুনটা নিবে গেছে। গিন্নী, দাও দিকি কল্‌কেটা পাল্টে, একবার খেয়েই যাই। যাবো আর আস্‌বো। এই বলিয়া তিনি কলিকাটা হাতে লইয়া অন্দরের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

বাস্, স্বামী স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। গৃহিণী তামাক সাজিয়া দিলেন, কর্ত্তা প্রাণ ভরিয়া ধুম পান করিলেন। প্রসন্ন চিত্তে হুঁকাটি আমার হাতে দিয়া ঘড়া হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চাল আসিল, ডাল আসিল, তেল আসিল, নুন আসিল, যথা সময়ে রন্ধনশালায় আমার ডাক পড়িল। আহারে বিন্দুমাত্র রুচি ছিলনা, তথাপি নিঃশব্দে গেলাম। কারণ, আপত্তি করা শুধু নিষ্ফল নয়, না বলিতে আমার আতঙ্ক বোধ হইল। এ জীবনে বহুবার বহুস্থানেই আমাকে অযাচিত আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছি বলিলে অসত্য বলা হইবে, কিন্তু এমন সম্বর্দ্ধনাও কখনো ভাগ্যে জুটে নাই। কিন্তু শিক্ষার তখনও বাকি ছিল। গিয়া দেখিলাম উনুন জ্বলিতেছে, এবং অন্নের পরিবর্ত্তে কলাপাতায় চাল ডাল আলু ও একটা পিতলের হাঁড়ি।

চক্রবর্ত্তী উৎসাহ ভরে কহিলেন, দিন হাঁড়িটা চড়িয়ে চট্ পট্ হয়ে যাবে। খাঁটি মুসুরের খিচুড়ি, আলু ভাতে, তোফা লাগ্‌বে খেতে। ঘি আছে, গরম গরম—

চক্রবর্ত্তীর রসনা সরস হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া উঠিল। কিন্তু পাছে আমার কোন কথায় বা কাজে আবার একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার নির্দ্দেশ মত হাঁড়ি চড়াইয়া দিলাম। চক্রবর্ত্তী গৃহিণী আড়ালে ছিলেন, স্ত্রীলোকের চক্ষে আমার অপটু হস্ত গোপন রহিলনা, এবার তিনি আমাকেই উদ্দেশ করিয়া কথা কহিলেন। তাঁহার আর যা দোষই থাক, সঙ্কোচ বা চক্ষুলজ্জা বলিয়া যে শব্দগুলা অভিধানে আছে তাহাদের অতিবাহুল্য দোষ যে ইহার ছিলনা এ কথা বোধ করি অতি বড় নিন্দুকেও স্বীকার না করিয়া পারিবেনা। তিনি কহিলেন, তুমি ত বাছা রান্নার কিছুই জানোনা।

আমি তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া বলিলাম, আজ্ঞে, না।

তিনি বলিলেন, কর্ত্তা বলছিলেন বিদেশী লোক, কে-বা জান্‌বে, কে বা শুনবে। আমি বোল্‌লাম, তা হতে পারেনা। একটা রাত্তিরের জন্যে একমুঠো ভাত দিয়ে আমি মানুষের জাত মারতে পারবোনা। আমরা বাবা অগ্রদানী বামুন।

আমার সে আপত্তি নাই, এবং ইহাপেক্ষাও গুরুতর পাপ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি এ কথা বলিতেও কিন্তু আমার সাহস হইলনা, পাছে স্বীকার করিলেও কোন বিভ্রাট ঘটে। মনের মধ্যে শুধু একটি মাত্র চিন্তা ছিল কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে এবং এই বাড়ীর নাগপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। সুতরাং, নির্দ্দেশমত খিচুড়িও রাঁধিলাম, এবং পিণ্ড পাকাইয়া গরম ঘি দিয়া তোফা গিলিবার চেষ্টাও করিলাম। এ অসাধ্য যে কি করিয়া সম্পন্ন করিলাম আজও বিদিত নই, কেবলই মনে হইতে লাগিল চাল ডালের তোফা পিণ্ড পেটের মধ্যে গিয়া পাথরের পিণ্ড পাকাইতেছে।

অধ্যবসায়ে অনেক কিছুই হয়, কিন্তু তাহারও সীমা আছে। হাত-মুখ ধুইবারও অবসর মিলিল না, সমস্ত বাহির হইয়া গেল। ভয়ে শীর্ণ হইয়া উঠিলাম, কারণ, এগুলো যে আমাকেই পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে শক্তি আর ছিলনা। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল, কোন-মতে বলিয়া ফেলিলাম, কোথাও আমাকে একটু শোবার যায়গা দিন, মিনিট পাঁচেক সাম্‌লে নিয়েই আমি সমস্ত পরিষ্কার করে দেব। ভাবিয়াছিলাম প্রত্যুত্তরে কি যে শুনিব জানিনা, কিন্তু আশ্চর্য্য এই চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীর ভয়ানক কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ কোমল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে তিনি অন্ধকার আমার সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন, তুমি যে বাবা, পরিষ্কার করতে যাবে, আমিই সব সাফ ক ফেলেচি। বাইরের বিছানাটা এখনও করে উঠ্ পারিনি, ততক্ষণ এসো তুমি আমার ঘরে শি শোবে।

না বলিবার সামর্থ্যও নাই, নীরবে অনুসর করিয়া তাঁহারই শতচ্ছিন্ন শয্যায় আসিয়া চোখ বুজি শুইয়া পড়িলাম।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙিল, তখন মাথ তুলিবারও শক্তি ছিলনা, এম্নি জ্বর। সহজে চো দিয়া আমার জল পড়েনা, কিন্তু এতবড় অপরাধে যে এখন কেমন করিয়া কি জবাবদিহি করিব এই কথ ভাবিয়া নিছক ও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কেই আমার দু চক্ষু অশ্রু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল বহুবা বহু নিরুদ্দেশ যাত্রাতেই বাহির হইয়াছি, কি এতখানি বিড়ম্বনা জগদীশ্বর আর কখনও অদৃ লিখেন নাই। আর একবার প্রাণপণে উঠিয় বসিবার প্রয়াস করিলাম, কিন্তু কোনমতেই মাথ সোজা করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া শুইয় পড়িলাম।

আজ চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীর সহিত মুখোমুখি আলাপ হইল। বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিয়া নারীর সত্যকার গভীর পরিচয়টুকু লাভ করা যায় তাঁহাকে চিনিয়া লইবার এমন কষ্টিপাথরও আর নাই তাঁহার হৃদয় জয় করিবার এত বড় অস্ত্রও পুরুষে হাতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয় বলিলেন, ঘুম ভেঙেছে বাবা?

চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহার বয়স বোধ হ চল্লিশের কাছাকাছি,—কিছু বেশি হইতেও পারে রঙটি কালো, কিন্তু চোখ-মুখ সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ ঘরে মেয়েদের মতই। রুক্ষতার কোথাও কিছু নাই, আছে শুধু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া গভীর দারিদ্র্য ও অনশনের চিহ্ন আঁকা,—চোখ মেলিয়া চাহিলেই তাহা ধরা পড়ে। কহিলেন, কাল আঁধারে দেখ্‌তে পাইনি বাবা, কিন্তু আমার বড় ছেলে বেঁচে থাক্‌লে তার তোমার বয়সই হোত।

ইহার আর উত্তর কি। তিনি হঠাৎ কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, জ্বরটা এখনও খুব রয়েছে।

আমি চোখ বুজিয়া ছিলাম, চোখ বুজিয়াই কহিলাম, কেউ একটুখানি সাহায্য করলে বোধ হয় হাঁসপাতালে যেতে পারবো,—সে ত আর বেশি দূর নয়।

তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলামনা, কিন্তু আমার হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন বেদনায় ভরিয়া গেল। বলিলেন, দুঃখের জ্বালায় কাল কি একটা বলেছি বলেই বাবা, রাগ করে এই যম-পুরীতে চলে যাবে? আর যাবে বললেই আমি যেতে দেব? এই বলিয়া তিনি অল্পকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, আতুরের নিয়ম নেই বাবা। এই যে লোক হাসপাতালে গিয়ে থাকে সেখানে কাদের ছোঁওয়া খেতে হয় বল ত? কিন্তু তাতে কি জাত যায়? আমি সাগু বার্লি তৈরি করে দিলে কি তুমি খাবেনা?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে, বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। এবং শুধু পীড়িত বলিয়া নয়, অত্যন্ত নীরোগ শরীরেও আমার ইহাতে বাধা হয়না।

অতএব, রহিয়া গেলাম। বোধ হয় সবশুদ্ধ দিনচারেক ছিলাম। তথাপি সেই চারি দিনের স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। জ্বর এক দিনেই গেল, কিন্তু বাকি দিন কয়টা দুর্বল বলিয়া তাঁহারা নড়িতে দিলেননা। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়াই এই ব্রাহ্মণ পরিবারের দিন কাটিতেছে, এবং দুর্গতিকে সহস্র-গুণে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে বিনা দোষে সমাজের অর্থহীন পীড়ন। চক্রবর্তি-গৃহিণী তাঁহার অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেও একটুকু অবসর পাইলে আমার কাছে আসিয়া বসিতেন। মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেন, ঘটা করিয়া রোগের পথ্য যোগাইতে পারিতেননা, এই ক্রটি যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবার কি ঐকান্তিক চেষ্টাই না তাঁহার দেখিতে পাইতাম। পূর্বে অবস্থা সচ্ছল ছিল, জমিজমাও মন্দ ছিলনা, কিন্তু তাঁহার [illegible] স্বামীকে লোকে প্রতারিত করিয়াই এই দশায় ফেলিয়াছে। তাহারা আসিয়া ঋণ চাহিত, দিত, দেশে বড়লোক ঢের আছে, কিন্তু এতবড় বুকের পাটা কয়জনের আছে? অতএব এই বুকের পাটা সপ্রমাণ করিতে তিনি ঋণ করিয়া ঋণ দিতেন। প্রথমে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া এবং পরে স্ত্রীকে গোপন করিয়া সম্পত্তি বন্ধক দিয়া। ইহার ফল অধিকাংশ স্থলেই যাহা হয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে।

এ কুকার্য যে চক্রবর্তীর অসাধ্য নয় তাহা একটা দিনের অভিজ্ঞতা হইতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম। নানা দোষে বিষয়-সম্পত্তি অনেকেরই যায়, এবং তাহার পরিণামও অত্যন্ত দুঃখের হয়, কিন্তু এই দুঃখ সমাজের অনাবশ্যক, অন্ধ নিষ্ঠুরতায় কতখানি বাড়িতে পারে তাহা চক্রবর্তি-গৃহিণীর প্রতি কথায় [illegible] মজ্জায় অনুভব করিলাম। তাঁহাদের দুইটিমাত্র শোবার ঘর একটিতে ছেলেমেয়েরা থাকে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বাহিরের লোক হইয়াও আমি অধিকার করিয়া আছি। ইহাতে আমার সঙ্কোচের অবধি ছিলনা। বলিলাম, আজ ত আমার জ্বর ছেড়েছে এবং আপনাদেরও ভারি কষ্ট হচ্ছে; যদি বাইরের ঘরে একটা বিছানা করে দেন ত আমি ভারি তৃপ্তি পাই।

গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সে কি হয় বাছা, আকাশে মেঘ করে আছে, বৃষ্টি যদি হয়ত ও ঘরে এমন ঠাঁই নেই যে মাথাটুকু রাখা যায়। তুমি রোগা-মানুষ, এ ভরসা ত করতে পারিনে বাবা।

তাঁহাদের প্রাঙ্গণের একধারে কিছু খড় সঞ্চিত ছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহাই ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সময়ে মেরামত করে নেননি কেন? জল-ঝড়ের ত দিন এসে পড়ছে।

ইহার প্রত্যুত্তরে জানিলাম যে তাহা সহজে হইবার নয়। পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া এ অঞ্চলে চাষীরা তাঁহাদের কাজ করেনা। গ্রামান্তরে মুসলমান ঘরামী আছে তাহারাই ঘর ছাইয়া দেয়। যে-কোন কারণে হোক এ বৎসর তাহারা আসিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বাবা আমাদের দুঃখের কি সীমা আছে? সে বছর আমার সাত আট বছরের মেয়েটা হঠাৎ কলেরায় মারা গেল; পূজোর সময়ে আমার ভাইয়েরা গিয়েছিল কাশী বেড়াতে, তাই আর লোক পাওয়া গেলনা, ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে একা এঁকেই শ্মশানে নিয়ে যেতে হ'ল। তাও কি সৎকার করা গেল? কাঠ-কুটো কেউ কেটে দিলেনা, বাপ হয়ে গর্ত খুঁড়ে বাছাকে পুঁতে রেখে ইনি ঘরে ফিরে এলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার পুরাতন শোক একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল। চোখ মুছিতে মুছিতে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার মোট অভিযোগ এই যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের কোন্‌কালে কে শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই ত অপরাধ? অথচ, শ্রাদ্ধ হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য, এবং কেহ-না-কেহ দান গ্রহণ না করিলে সে শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। তবে, দোষটা কোথায়? আর দোষই যদি থাকে ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করানো কিসের জন্য?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন কঠিন, পূর্ব-পিতামহগণের কোন্ দুষ্কৃতির শাস্তি স্বরূপ তাঁহাদের বংশধরগণ এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন তাহা এতকাল পরে আবিষ্কার করাও তেমনি দুঃসাধ্য। শ্রাদ্ধের দান লওয়া ভাল কি মন্দ জানিনা

মন্দ হইলেও এ কথা সত্য যে ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ তাঁহারা করেননা, অতএব নিরপরাধ। অথচ প্রতিবেশী হইয়া আর একজন প্রতিবেশীর জীবন-যাত্রার পথ বিনা দোষে মানুষে এতখানি দুর্গম ও দুঃখময় করিয়া দিতে পারে, এমন হৃদয়হীন নির্দয় বর্বরতার উদাহরণ জগতে বোধ করি একা হিন্দু-সমাজ ব্যতীত আর কোথাও নাই।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, এ গ্রামে লোক বেশি নেই, জ্বর আর ওলাউঠায় অর্দ্ধেক মরে গেছে। এখন আছে শুধু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর রাজপুত। আমাদের যে কোন উপায় নেই বাবা, নইলে ইচ্ছে হয়, কোন মুসলমানের গ্রামে গিয়ে বাস করি।

বলিলাম, কিন্তু সেখানে ত জাত যেতে পারে।

চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিলেননা, কহিলেন, আমার সম্পর্কে একজন খুড়শ্বশুর আছেন, তিনি দুম্‌কায় চাকরি করতে গিয়ে খৃষ্টান হয়েছেন। তাঁর ত আর কোন কষ্টই নেই।

চুপ করিয়া রহিলাম। হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে শুনিলে ক্লেশ বোধ হয়, কিন্তু সান্ত্বনাই বা দিব কি বলিয়া? এতদিন জানিতাম অস্পৃশ্য নীচ জাতি যাহারা আছে তাহারাই শুধু হিন্দু-সমাজের মধ্যে নির্য্যাতন ভোগ করে, কিন্তু আজ জানিলাম বাদ কেহই যায় না। অর্থহীন অবিবেচনায় পরস্পরের জীবন দুর্ভর করিয়া তোলাই যেন এ সমাজের মজ্জাগত সংস্কার। পরে অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহা অন্যায়, ইহা গর্হিত, তথাপি নিরাকরণেরও কোন পন্থাই তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারেননা। এই অন্যায়েরই মধ্য দিয়া তাঁহারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত চলিতে সম্মত আছেন, কিন্তু প্রতীকারের প্রবৃত্তি বা সাহস কোনটাই তাঁহাদের নাই। জানিয়া বুঝিয়াও অবিচারের প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহাদের এমন করিয়া তিরোহিত হইয়াছে সে জাতি যে দীর্ঘকাল বাঁচিবে কি করিয়া ভাবিয়া পাওয়া শক্ত।

দিন তিনেক পরে সুস্থ হইয়া একদিন সকালে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলাম, মা, আজ আমাকে বিদায় দিন।

চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, বলিলেন, দুঃখীর ঘরে অনেক দুঃখ পেলে বাবা, তোমাকে কটু কথাও কম বলিনি।

এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলামনা। না না, সে কিছুই না,—আমি মহা সুখে ছিলাম, আমার কৃতজ্ঞতা—ইত্যাদি মামুলি ভদ্র-বাক্য ... করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইল। রাজলক্ষ্মীর কথা মনে পড়িল। সে একদিন বলিয়াছিল, আমাকে ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে। এই বাঙলা দেশের গৃহে গৃহে মা বোন্, যাঁরা কি তাঁদের স্নেহের আকর্ষণ এড়াইয়া যাই। কথাটা কত বড়ই না সত্য!

নিরতিশয় দারিদ্র্য ও নির্বোধ স্বামীর অবিবেচনার আতিশয্য এই গৃহস্থ ঘরের গৃহিণীকে প্রায় পাগল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই তিনি অনুভব করিলেন আমি পীড়িত, আমি নিরুপায়,—আর তাঁহার ভাবিবার কিছু রহিলনা। মাতৃত্বের সীমাহীন স্নেহে আমার রোগ ও পর-গৃহবাসের সমস্ত দুঃখ যেন দুই হাত দিয়া মুছিয়া লইলেন।

চক্রবর্ত্তী চেষ্টা করিয়া একখানি গোযান সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, গৃহিণীর ভারি ইচ্ছা ছিল আমি স্নানাহার করিয়া যাই, কিন্তু রৌদ্র বাড়িবার আশঙ্কা পীড়াপীড়ি করিলেননা। শুধু যাত্রাকালে দেব দেবীর নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিয়া কহিলেন বাবা যদি কখনো এদিকে এসো আর একবার দেখা দিয়ে যেয়ো।

এদিকে আসাও কখনো হয় নাই, দেখা দিতেও আর পারি নাই, শুধু বহুদিন পরে শুনিয়াছিলাম রাজলক্ষ্মী কুশারীমহাশয়ের হাত দিয়া তাঁহাদের অনেকখানি ঋণের অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

১৪

গঙ্গামাটির বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দ্বারের উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গল-ঘট বসানো। উপরে আম্র-পল্লবের মালা দোলানো। বাহিরে অনেকগুলি লোক বসিয়া জটলা করিয়া তামাক খাইতেছে। গোরুর গাড়ীর শব্দে তাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল। বোধ হয় ইহারই মধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া আর এক জন যিনি অকস্মাৎ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখি তিনি স্বয়ং বজ্রানন্দ। তাঁহার উল্লসিত কলরব উদ্দাম হইয়া উঠিল, এবং কে একজন ছুটিয়া ভিতরে খবর দিতেও গেল। স্বামীজি বলিতে লাগিলেন যে তিনি আসিয়া সকল বিবরণ জানানো পর্য্যন্ত চারিদিকে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টারও যেমন বিরাম নাই, বাটীশুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তারও তেমনি অবধি নাই। ব্যাপার কি? অকস্মাৎ কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন ত?

গাড়োয়ান ছোঁড়াটা ত গিয়ে বল্লে আপনাকে গঙ্গা-মাটির পথে নাবিয়ে দিয়ে সে ফিরে গেছে।

রাজলক্ষ্মী কাজে ব্যস্ত ছিল, আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে কি শাস্তিই তুমি দিলে। বজ্রানন্দকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু দেখ আনন্দ, আমার মন জান্তে পেরেছিল যে আজ উনি আস্‌বেনই।

হাসিয়া বলিলাম, দোরে কলাগাছ আর ঘট-স্থাপনা দেখেই আমি বুঝেছি যে আমার আসার খবরটি তুমি পেয়েছ।

কবাটের আড়ালে রতন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে সে জন্যে নয়। আজ বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন হবে কি না। বকুনাথ দেখে এসে মা—

রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল, আর ব্যাখ্যা করতে হবেনা রতন, নিজের কাজে যা।

তাহার আরক্ত মুখের প্রতি চাহিয়া বজ্রানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কি জানেন দাদা, কোন একটা কাজে লেগে না থাকলে মানসিক উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সহা যায়না। ভোজের আয়োজনটা কেবল এই জন্যই। না দিদি?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিলনা, রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, ভয়ানক রোগা দেখাচ্চে, দাদা, ইতিমধ্যে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল বলুন ত? বাড়ী না ঢুকে হঠাৎ গা ঢাকা দিলেন কেন?

গা ঢাকা দিবার হেতু সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। শুনিয়া আনন্দ কহিল, ভবিষ্যতে এ রকম ক'রে আর পালাবেননা। কি ভাবে যে ওঁর দিনগুলো কেটেছে তা' চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা যায়না।

তাহা জানিতাম। সুতরাং, চোখে না দেখিয়াও আমি বিশ্বাস করিলাম। রতন চা ও তামাক দিয়া গেল। আনন্দ কহিল, আমিও বাইরে যাই দাদা। এখন আপনার কাছে বসে থাকলে আর একজন হয়ত ইহজন্মে আমার মুখ দেখবেননা। এই বলিয়া সে হাসিয়া প্রস্থান করিল।

খানিক পরে রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, ও ঘরে গরম জল গামছা কাপড় সমস্ত রেখে এলাম, শুধু গা-মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে ফেলগে। জ্বরের ওপর খবরদার যেন মাথায় জল ঢেলোনা বলচি।

কহিলাম, কিন্তু স্বামীজি তোমাকে ভুল বলেছেন জ্বর আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না-ই থাক্, কিন্তু হতে কতক্ষণ?

কহিলাম, সে খবর তোমাকে সঠিক দিতে পারবনা, কিন্তু গরমে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে স্নান করা দরকার।

রাজলক্ষ্মী কহিল, দরকার না কি? তা'হলে এক হয়ত পেরে উঠ্‌বেনা, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এই বলিয়া সে নিজেই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আড়ি ক'রে আমাকেও কষ্ট দেবে নিজেও কষ্ট পাবে? এত অবেলায় নেয়োনা লক্ষ্মীটি।

এই ধরণের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড় কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে স্নেহের মাধুর্য্যরসে এম্‌নিই ভরিয়া দিতে পারিত, যে সে জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সঙ্কল্পই মাথা তুলিতে পারিতনা। এ ব্যাপারটা তুচ্ছ, স্নান না করিলেও আমার চলিয়া যাইবে, কিন্তু চলিয়া যায়না এমন ব্যাপারেও বহুবার দেখিয়াছি তাহার ইচ্ছা-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু কেবল আমিই পাই নাই তাহা নয়, কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই। আমাকে তুলিয়া দিয়া সে খাবার আনিতে গেল। বলিলাম তোমার ব্রাহ্মণ ভোজনের পালাটা আগে শেষ হোক্‌না।

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, রক্ষে কর তুমি, সে পালা শেষ হতে যে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

গেলই বা।

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, তাই বটে। ব্রাহ্মণ ভোজন আমার মাথায় থাক্, তার জন্যে তোমাকে উপোস করালে আমার স্বর্গের সিঁড়ি উপরের বদলে একেবারে পাতালে মুখ করে দাঁড়াবে। এই বলিয়া সে আহার্য্য আনিতে প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে কাছে বসিয়া আজ সে আমাকে যাহা খাওয়াইতে বসিল তাহা রুগীর পথ্য। কম্মবাটীর যাবতীয় গুরুপাক বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিলনা, বুঝা গেল, আমার আসার পরেই সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে। তথাপি, আসা পর্য্যন্ত তাহার আচরণে, তাহার কথা কহার ধরণে এমনই কি একটা অনুভব করিতেছিলাম যাহা শুধুই অপরিচিত নয়, অত্যন্ত নূতন। ইহাই খাওয়ানোর সময়ে একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অথচ কিসে এবং কেমন করিয়া যে সুস্পষ্ট হইল, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি অস্পষ্ট করিয়াও বুঝাইতে পারিতামনা। হয়ত, এই কথাটাই প্রত্যুত্তরে বলিতাম যে মানুষকে

অত্যন্ত ব্যথার অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজলক্ষ্মী খাওয়াইতে বসিল, কিন্তু খাওয়া-না-খাওয়া লইয়া তাহার আগেকার দিনের সেই অত্যন্ত জবরদস্তি ছিলনা, ছিল ব্যাকুল অনুনয়। জোর নয়, ভিক্ষা। বাহিরের চক্ষে তাহা ধরা পড়েনা, শুধু মানুষের নিভৃত হৃদয়ের অপলক চোখ দু'টির দৃষ্টিতে।

খাওয়া শেষ হইল। রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি এখন যাই?

অতিথি সজ্জন বাহিরে সমবেত হইতেছিলেন, বলিলাম, যাও।

আমার উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি হাতে লইয়া সে যখন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি অন্যমনে সেই দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল রাজলক্ষ্মীকে যেমনটি রাখিয়া গিয়াছিলাম এই ক'টা দিন পরে তেমনটি ত আর ফিরিয়া পাইলামনা। আনন্দ বলিয়াছিল কাল হইতেই দিদির এক প্রকার অনাহারে কাটিয়াছে, আজ জলস্পর্শ করেন নাই, এবং কাল কতবেলায় যে তাঁহার উপবাস ভাঙ্গিবে তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। অসম্ভব নয়। চিরদিনই দেখিয়া আসিয়াছি ধর্ম্ম-পিপাসু-চিত্ত তাহার কোনদিন কোন কৃচ্ছ্র সাধনেই পরাঙ্মুখ নয়। এখানে আসিয়া অবধি সুনন্দার সাহচর্য্যে সেই অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁহার নিরন্তর বাড়িয়াই উঠিতেছিল। আজ তাহাকে অল্পক্ষণ মাত্রই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছি, কিন্তু যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে সে এই অবিশ্রান্ত দ্রুতবেগে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, মনে হইল, তাহার নিন্দিত-জীবনের সঞ্চিত কালিমা যত বড়ই হোক আর তাহার নাগাল পাইবেনা। কিন্তু আমি? আমি যে তাহার পথের মাঝখানে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর মত সমস্ত অবরোধ করিয়া আছি!

কাজকর্ম্ম সারিয়া নিঃশব্দ পদে রাজলক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আলো কমাইয়া, অত্যন্ত সাবধানে আমার মশারি ফেলিয়া দিয়া সে নিজের শয্যায় গিয়া শুইতে যাইতেছিল আমি কথা কহিলাম। বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণ ভোজনের পালা ত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শেষ হয়েছে, এত রাত হ'ল যে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে চমকিত হইল, পরে হাসিয়া কহিল, আ আমার কপাল! আমি ভয়ে ভয়ে আস্‌চি পাছে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিই। এখনো জেগে আছো, ঘুমোওনি যে বড়?

তোমার আশাতেই জেগে আছি।

আমার আশায়? তবে ডেকে পাঠাওনি কেন? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া মশারির একটা ধা[র] তুলিয়া দিয়া আমার শয্যার শিয়রে আসিয়া বসি[ল]। বরাবরের অভ্যাস মত আমার চুলের মধ্যে তাহ[া]র দুই হাতের দশ আঙুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলি[ল], ডেকে পাঠাওনি কেন?

ডেকে পাঠালেই কি তুমি আস্‌তে? তোম[ার] কত কাজ।

হোক কাজ। তুমি ডাক্‌লে না বল্‌তে পা[রি] এমন সাধ্যি আছে আমার?

ইহার উত্তর ছিল না। জানি,- আমার আহ্বা[ন] সত্যই উপেক্ষা করিবার সাধ্য তাহার নাই। ক[ি]ন্তু আজ এই সত্যকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইব[ার] সাধ্য আমার কই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

ভাব্‌চি।

ভাব্‌চো? কি ভাব্‌চো? এই বলিয়া ধীরে ধীরে আমার কপালের উপরে তাহার মা[থা] ন্যস্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার ওপর [রাগ] করে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলে যে বড়?

রাগ করে গিয়েছিলাম তুমি জান্‌লে কি কো[রে]?

রাজলক্ষ্মী মাথা তুলিলনা, আস্তে আস্তে ব[লিল], আমি রাগ ক'রে গেলে তুমি জান্‌তে পারোনা?

কহিলাম, বোধ হয় পারি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি বোধহয় পারো, আমি নিশ্চয় পারি। আর তোমার পারার [চে]য়ে ঢের বেশি পারি।

হাসিয়া কহিলাম, তাই হোক। এ নিয়ে [ঝগড়া] করে জয়ী হতে আমি চাইনে, লক্ষ্মী, নিজে হ[েরে] চেয়ে তুমি হেরে গেলেই আমার ঢের [বেশি] লোকসান।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যদি জানো তবে বল কেন[?]

কহিলাম, বলিনে ত আর। কিন্তু ব[লা] অনেকদিন বন্ধ করেছি সেই খবরটিই তুমি জানে[া না]।

রাজলক্ষ্মী নীরব হইয়া রহিল। পূর্ব্বে হইলে [সে] আমাকে সহজে অব্যাহতি দিতনা, লক্ষ কোটী প্র[শ্ন] করিয়া ইহার কৈফিয়ৎ আদায় করিয়া ছাড়িত, কি[ন্তু] এখন সে মৌন-মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষ[ণ] পরে সে মুখ তুলিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞা[সা] করিল, তোমার নাকি এর মধ্যে জ্বর হয়েছিল[?] কোথায় ছিলে? বাড়ীতে আমাকে খবর পাঠা[ও নি] না কেন?

খবর না পাঠাইবার হেতু বলিলাম। একে ত খবর আনিবার লোক ছিলনা, দ্বিতীয়তঃ, যাহার কাছে খবর পাঠাইব, তিনি যে কোথায় জানিতামনা। কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে ছিলাম তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। চক্রবর্ত্তি-গৃহিণীর নিকট আজই সকালে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। সেই দীনহীন গৃহস্থ পরিবারে যে ভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম এবং যেমন করিয়া অপরিসীম দৈন্যের মধ্যেও গৃহকর্ত্রী অজ্ঞাতকুলশীল রোগগ্রস্ত অতিথিকে পুত্রাধিক স্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া কৃতজ্ঞতা ও বেদনায় আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া কহিল, যাতে তাঁরা ঋণমুক্ত হন, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাওনা কেন?

বলিলাম, থাকলে দিতাম, কিন্তু টাকা ত আমার নেই।

আমার এই সকল কথায় রাজলক্ষ্মী মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইত, আজও সে মনে মনে তেমনিই দুঃখ পাইল, কিন্তু তাহার টাকা যে আমারও টাকা এ কথা সজোরে প্রতিপন্ন করিতে আগেকার-দিনের মত আর কলহে প্রবৃত্ত হইলনা। চুপ করিয়া রহিল।

এই জিনিসটা তাহার নূতন দেখিলাম। আমার এই কথার উপরে ঠিক এমনি শান্ত নিরুত্তরে বসিয়া থাকা আমাকেও বিঁধিল। কিছুক্ষণ পরে সে নিশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল। যেন দীর্ঘশ্বাসের বাতাস দিয়া সে তাহার চারিদিকে ঘনায়মান বাষ্পাচ্ছন্ন মোহের আবরণটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিল। ঘরের মন্দ আলোকে তাহার মুখের চেহারা ভাল দেখিতে পাইলামনা, কিন্তু যখন সে কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিল, বর্ম্মা থেকে তোমার চিঠির জবাব এসেছে। আপিসের বড় খাম, হয়ত দরকারি কিছু আছে ভেবে আনন্দকে দিয়ে পড়িয়ে নিলাম।

তার পরে?

বড়সাহেব তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। জানিয়েছেন, তুমি গেলেই তোমার সাবেক চাকরি আবার ফিরে পাবে।

বটে?

হাঁ। আন্‌বো চিঠিখানা?

না, থাক্‌। কাল সকালে দেখ্‌বো।

আবার দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। কি যে বলিব, কেমন করিয়া যে এই নীরবতা ভাঙ্গিব ভাবিয়া না পাইয়া মনের ভিতরটায় কেবল তোলপাড় করিতে লাগিল। হঠাৎ এক ফোঁটা চোখের জল টপ করিয়া আমার কপালের উপরে আসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে এ তো খারাপ সম্বাদ নয়। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি বিদেশে চাকরি নিয়ে আবার চলে যাবার চেষ্টা কোরচ, আমাকে এ কথা জানাওনি কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি বাধা দেব?

কহিলাম, না। বরঞ্চ, জানালে তুমি উৎসাহই দিতে। কিন্তু সে জন্যে নয়,—বোধ হয় ভেবেছিলাম এ সব তুচ্ছ ব্যাপার শোন্‌বার তোমার সময় হবেনা।

রাজলক্ষ্মী নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কিন্তু তাহার উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিবার প্রাণপণ চেষ্টাও আমার কাছে গোপন রহিলনা। কিন্তু ক্ষণকাল মাত্র। ক্ষণেক পরেই সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, এ কথার জবাব দিয়ে আর আমার অপরাধের বোঝা বাড়াবনা। তুমি যাও, তোমাকে আমি কিছুতেই বারণ করবনা। এই বলিয়া সে পুনরায় মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিল, এখানে না এলে বোধ হয় আমি কোনদিন বুঝতে পারতামনা তোমাকে কতবড় দুর্গতির মধ্যে টেনে এনেছি। এই গঙ্গামাটির অন্ধকূপে মেয়েমানুষের চলে, কিন্তু পুরুষের চলেনা। এখানকার এই কর্ম্মহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন ত তোমার আত্ম-হত্যার সমান। এ আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেউ কি তোমায় দেখিয়ে দিয়েছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। আমি নিজেই দেখেছি। তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখ্‌তে পাইনি তার বদলে কেবল তোমার লুকোনো বিরস মুখ দিনরাত্তি চোখে পড়েছে। আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আর না।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে একটা জ্বালার ভাবই ছিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরের অনির্ব্বচনীয় করুণায় বিভোর হইয়া গেলাম। বলিলাম, তোমাকেই কি কম ছাড়তে হয়েছে লক্ষ্মী? গঙ্গামাটি ত' তোমারও যোগ্য স্থান নয়? কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সঙ্কোচে মরিয়া গেলাম। কারণ, অনবধানতা বশতঃ যে গর্হিত বাক্য আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এই রমণীর কাছে তাহা গোপন রহিলনা। কিন্তু আমাকে আজ সে ক্ষমা করিল। বোধহয় কথার ভাল-মন্দ লইয়া

মান-অভিমানের জাল বুনিয়া সময় নষ্ট করার মত সময় আর তাহার ছিলনা। বলিল, বরঞ্চ আমিই গঙ্গা-মাটির যোগ্য নই। সকলে এ কথা বুঝবেনা, কিন্তু তোমার বোঝা উচিত যে সত্যিই আমাকে কিছু ছাড়তে হয়নি। পাষাণের মত যে ভার একদিন লোকে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল, কেবল তাই আর একদিন আমার ঘুচেছে। আর শুধু কি তাই? আজীবন তোমাকেই চেয়েছিলাম, তোমাকে পেয়ে ছাড়ার অসংখ্য গুণ যে ফিরে পেয়েছি সে কি তুমিই জানোনা?

জবাব দিতে পারিলামনা। অন্তরের অজানা অভ্যন্তর হইতে কে যেন এই কথাই আমাকে বলিতে লাগিল, ভুল হইয়াছে, তোমার মস্ত ভুল হইয়াছে। না বুঝিয়া তাহাকে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছ। রাজলক্ষ্মী ঠিক এই ভাবেই আঘাত করিল, বলিল, ভেবেছিলাম তোমার জন্যেই এ কথা কখনো তোমাকে জানাবোনা, কিন্তু আজ আর আমি থাকতে পারলামনা। এই কষ্টটাই আমার সব চেয়ে বেশি লেগেছে যে, তুমি অনায়াসে ভাবতে পেরেছ যে পুণ্যের লোভে আমি এমনি উন্মাদ হয়ে গেছি যে তোমাকেও অবহেলা করতে সুরু করেছি। রাগ করে চলে যাবার আগে এ কথা তোমার একবারও মনে হয়নি যে ইহকালে পরকালে রাজলক্ষ্মীর তোমার চেয়ে লাভের বস্তু আর কি আছে! বলিতে বলিতেই তাহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া আমার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষা মনে পড়িলনা, শুধু মাথার উপর হইতে ডান হাতটি তাহার নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। রাজলক্ষ্মী বাঁ হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছিয়া বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, প্রজাদের সব খাওয়া শেষ হ'ল কিনা আমি দেখে আসিগে। তুমি ঘুমোও। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে হাতখানি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাকে ধরিয়া রাখিলে হয়ত রাখিতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিলামনা। সেও আর ফিরিয়া আসিলনা,—আমারও যতক্ষণ না ঘুম আসিল শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম জোর করিয়া রাখিয়া লাভ হইত কি? আমার পক্ষ হইতে ত কোনদিন কোন জোরই ছিলনা, সমস্ত জোরই আসিয়াছিল তাহার দিক দিয়া। আজ সে-ই যদি বাঁধন খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চায় ত আমি ঠেকাইব কোন্ পথে?

সকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রথমেই ও-দিকের খাটের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মী ঘরে নাই। রাত্রে সে আসিয়াছিল, কিম্বা অতি প্রত্যুষে বাহির হইয়া গেছে তাহা বুঝিতে পারিলামনা। বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি সেখানে একটা কোলাহল উঠিয়াছে। রতন কেটলি হইতে গরম চা পাত্রে ঢালিয়াছে, এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাজলক্ষ্মী একটা ষ্টোভে করিয়া সিঙাড়া কিম্বা কচুরি ভাজিয়া তুলিতেছে। এবং বজ্রানন্দ তাহার সন্ন্যাসীর নিস্পৃহ, নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়া এই সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি চাহিয়া আছে। আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার ভিজা চুলের উপর আঁচল টানিয়া দিল, এবং বজ্রানন্দ কলরব করিয়া উঠিল, এই যে দাদা! আপনার দেরি দেখে ভাবছিলাম বুঝি বা সমস্ত জুড়িয়ে জল হয়ে যায়।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, হাঁ, তোমার পেটের মধ্যে গিয়ে জুড়িয়ে জল হোতো।

আনন্দ কহিল, দিদি, সন্ন্যাসী-ফকিরকে খাতির করতে শিখুন। ও রকম কড়া কথা বলবেননা। আমাকে বলিল, কই, তেমন ভাল দেখাচ্চে না ত! হাতটা একবার দেখব না কি?

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, রক্ষে কর আনন্দ, তোমার আর ডাক্তারিতে কাজ নেই, উনি বেশ আছেন।

আনন্দ বলিল, সেইটাই নিশ্চয় করবার জন্যে হাতটা একবার—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, তোমাকে হাত দেখতে হবেনা। এখখুনি হয়ত সাগুর ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বলিলাম, সাগু আমি ঢের খেয়েছি সুতরাং ও ব্যবস্থা করে দিলেও আর শুনবনা।

শুনেও তোমার কাজ নেই। এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্লেটে করিয়া খানকয়েক গরম কচুরি ও সিঙাড়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। রতনকে কহিল তোর বাবুকে চা দে।

বজ্রানন্দ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে ডাক্তারি পাশ করিয়াছিল, অতএব সহজে হার মানিবার পাত্র নয় সে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে গেল, কিন্তু দিদি, একটু দায়িত্ব আপনার—

রাজলক্ষ্মী তাহার কথার মাঝখানেই থামাইয়া দিল, শোন কথা। ওঁর দায়িত্ব আমার নয় ত কি তোমার? আজ পর্য্যন্ত যত দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ওঁকে খাড়া রাখতে হয়েছে সে যদি শুনতে ত দিদির কাছে আর ডাক্তারি করতে যেতেনা। এই বলিয়া সে বাকি সমস্ত খাবার একটা থালায় ঢালিয়া তাহার

দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সক্রোধে কহিল, এখন খাও এগুলো, কথা বন্ধ হোক্।

আনন্দ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, আরে এত খাওয়া যায়?

রাজলক্ষ্মী বলিল, যায় না ত সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলে কেন? আরও পাঁচজন ভদ্রলোকের মত গেরস্থ থাক্‌লেই ত হোতো।

আনন্দর দুই চক্ষু সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মত দিদির দল এই বাঙ্‌লা মুলুকে আছে বলেই ত নইলে দিব্যি করে বল্‌চি, আজই এই গেরুয়া টেক্‌নাগুলো অজয়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যেতাম। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে দিদি। পরশু থেকেই একরকম উপোস করে আছেন, আজ আহ্নিক-টাহ্নিকগুলো একটু সকাল-সকাল সেরে নিন্। এগুলোতে এখনো স্পর্শ দোষ ঘটেনি, বলেন ত না হয়—এই বলিয়া সে সম্মুখের ভোজ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

রাজলক্ষ্মী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বল কি আনন্দ, কাল যে আমার সমস্ত ব্রাহ্মণ এসে উঠ্‌তে পারেননি!

আমি বলিলাম, আগে তাঁরা এসে উঠুন। তারপরে।

আনন্দ কহিল, তা হলে আমাকেই উঠ্‌তে হ'ল। তাদের নাম ও ঠিকানা দিন, পাঁচগুণের গলায় গামছা দিয়ে এনে ভোজন করিয়ে ছাড়বো। এই বলিয়া সে উত্তর পরিবর্তে থালা টানিয়া লইয়া নিজেই ভোজনে মন দিল।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, সন্ন্যাসী কিনা, দেব-দ্বিজে অতিশয় ভক্তি।

এইরূপে আমাদের সকালের চা খাওয়ার পালাটা যখন সাঙ্গ হইল, তখন বেলা আটটা। বাহিরে আসিয়া বসিলাম। শরীরেও গ্লানি ছিলনা, হাসি-তামাসায় মনও যেন স্বচ্ছ, প্রসন্ন হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর বিগত রাত্রির কথাগুলার সহিত তাহার আজিকার কথা ও আচরণের কোন ঐক্যই ছিলনা। সে যে অভিমান ও বেদনায় ব্যথিত হইয়াই ওরূপ কহিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, রাত্রির শুদ্ধ আঁধার আবরণের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য ঘটনাকে বৃহৎ ও কঠোর কল্পনা করিয়া যে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভোগ করিয়াছি আজ দিনের আলোকে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জাও পাইলাম, কৌতুকও অনুভব করিলাম।

কল্যকার মত আজ আর উৎসবের ঘটা ছিলনা, তথাপি মাঝে মাঝে আহুত ও অনাহূতের ভোজন-লীলা সমস্ত দিনমান ব্যাপিয়াই অব্যাহত রহিল। বেলা গেল। আর একবার আমরা চায়ের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ঘরের মেঝেতে আসন করিয়া বসিলাম। সন্ধ্যার কাজ-কর্ম্ম কতকটা সারিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মী ক্ষণকালের জন্য আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বজ্রানন্দ কহিল, দিদি, স্বাগত।

রাজলক্ষ্মী তাহার প্রতি হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, সন্ন্যাসীর বুঝি দেব-সেবা সুরু হ'ল, তাই এত আনন্দ?

আনন্দ কহিল, মিথ্যে বলেননি দিদি। সংসারে যাবতীয় আনন্দ আছে তার মধ্যে ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দই শ্রেষ্ঠ। এবং শাস্ত্র বলেছেন ত্যাগীর পক্ষে দ্বিতীয়টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ, সে তোমার মত ত্যাগীর পক্ষে।

আনন্দ উত্তর দিল, এও মিথ্যে নয় দিদি। আপনি গৃহিণী বলেই এর মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেননি। নইলে আমরা ত্যাগীর দল যখন আনন্দে মস্‌গুল হয়ে আছি, আপনি তখন তিনদিন ধরে কেবল পরকে খাওয়াচ্ছেন, আর নিজে মর্‌চেন উপবাস করে

রাজলক্ষ্মী বলিল, মরছি আর কই ভাই? দিনের পর দিন ত দেখ্‌চি এ দেহটার কেবল শ্রীবৃদ্ধি হয়েই চলেছে।

আনন্দ কহিল, তার কারণ, হতে বাধ্য। সেবারেও আপনাকে দেখে গিয়েছিলাম, এবারেও এসে দেখ্‌চি। আপনার পানে চাইলে মনে হয়না যে পৃথিবীর জিনিস দেখ্‌চি, এ যেন দুনিয়া ছাড়া আর কিছু।

রাজলক্ষ্মীর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে হাসিয়া কহিলাম, তোমার আনন্দর যুক্তির প্রণালীটা দেখ্‌লে? শুনিয়া আনন্দও হাসিল, কহিল, এ তো যুক্তি নয়,—স্তুতি। দাদা, সে দৃষ্টি থাকলে কি আর বর্ম্মায় যেতেন চাকরির দরখাস্ত করতে? আচ্ছা দিদি, কোন্ দুষ্ট-বুদ্ধি দেবতাটি দিয়েছিলেন এই অন্ধ মানুষটিকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে? তাঁর কি আর কাজ ছিলনা?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল। নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, দেবতার দোষ নেই ভাই, দোষ এই ললাটের। আর ওঁর দোষ ত অতিবড় শত্রুতেও দিতে পারবেনা। এই বলিয়া সে আমাকে দেখাইয়া কহিল, পাঠশালে উনি ছিলেন সর্দ্দার-পোড়ো, যত না দিতেন পড়া ব'লে, তার ঢের বেশি দিতেন

বড়। তখন পড়ি ত সবে বোধোদয়, বইয়ের বোধ ত খুবই হোলো, বোধ হোলো আর এক রকমের। ছেলে মানুষ, ফুল পাবো কোথায়, বনের বঁইচি ফলের মালা গেঁথে ওকে করলাম বরণ। এখন ভাবি, তার সঙ্গে তার কাঁটাগুলোও যদি গেঁথে দিতাম! বলিতে বলিতে তাহার কুপিত কণ্ঠস্বর চাপা-হাসির আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল।

আনন্দ কহিল, উঃ—কি ভয়ানক রাগ!

রাজলক্ষ্মী বলিল, রাগ নয় ত কি? কাঁটা তুলে দেবার আর কেউ থাকলে নিশ্চয় দিতাম। এখনো পাই ত দি'। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আনন্দ ডাকিয়া কহিল, পালাচ্ছেন যে বড়?

কেন, আর কাজ নেই না কি? চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ওঁর কোঁদল করবার সময় আছে, কিন্তু আমার নেই।

আনন্দ বলিল, দিদি, আমি আপনার অনুগত ভক্ত। কিন্তু এ অভিযোগে সায় দিতে আমারও লজ্জা করচে। উনি একটা কথাও কইলে না হয় পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করা যেতো, কিন্তু একদম্ বোবা মানুষকে ফাঁদে ফেলা যায় কি কোরে? করলেও ধর্ম্মে সইবেনা।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঐ ত হয়েছে আমার জ্বালা! বেশ, ধর্ম্মে যা সয়, তাই না হয় কর। চায়ের বাটি-গুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল,—আমি ততক্ষণ রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসিগে এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বজ্রানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, দাদার কি বর্ম্মা যাবার সঙ্কল্প এখনও আছে না কি? কিন্তু দিদি কখ্খনো সঙ্গে যাবেননা তা' আমাকে বলেছেন।

সে আমি জানি।

তবে?

তবে একলাই যেতে হবে।

বজ্রানন্দ কহিল, এই দেখুন আপনার অন্যায়। অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক আপনাদের নেই, তবে, কিসের জন্যে যাবেন পরের গোলামি করতে?

বলিলাম, অন্ততঃ, অভ্যাসটা বজায় রাখ্তে।

এটা রাগের কথা দাদা।

কিন্তু রাগ ছাড়া কি মানুষের আর কোন হেতু থাকতে নেই আনন্দ?

আনন্দ কহিল, থাকলেও অপরের পক্ষে বোঝা কঠিন।

ইচ্ছা হইল বলি, এ কঠিন কাজ অপরের করিবারই বা প্রয়োজন কি; কিন্তু বাদানুবাদে জিনিসটা পাছে তিক্ত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় চুপ করিয়া গেলাম।

এমনি সময়ে রাজলক্ষ্মী বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া এবার ভালমানুষের মত আনন্দর পার্শ্বে গিয়া স্থির হইয়া বসিল। আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দিদি, উনি বলছিলেন অন্ততঃ, গোলামির অভ্যাস বহাল রাখবার জন্যেও তাঁর বিদেশে যাওয়া চাই। আমি বলছিলাম, তাই যদি চাই, আসুন না, আমার কাজে যোগ দেবেন। বিদেশে না গিয়ে দেশের গোলামিতেই দুই ভাইয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু উনি ত ডাক্তারি জানেন না আনন্দ?

আনন্দ কহিল, আমি কি শুধু ডাক্তারিই করি? ইস্কুল করি, পাঠশালা করি, তাদের দুর্দ্দশা যে কত দিক দিয়ে কত বড় তা অবিশ্রাম বোঝাবার চেষ্টা করি।

তারা বোঝে?

আনন্দ কহিল, সহজে বোঝেনা। কিন্তু মানুষের শুভ ইচ্ছা যখন বুক থেকে সত্য হয়ে বার হয়, তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়না দিদি।

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। বোধহয় সে বিশ্বাস করিল না, বোধহয় সে আমার জন্য মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, পাছে আমিও সায় দিয়া বসি, পাছে আমিও—

আনন্দ প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়লেন যে বড়?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল, পরে স্নিগ্ধ মধুরকণ্ঠে কহিল, দেশের দুর্দ্দশা যে কত বড় তা' আমিও জানি আনন্দ। কিন্তু তোমার একলার চেষ্টায় আর কি হবে ভাই? আমাকে দেখাইয়া কহিল, আবার উনি যাবেন সাহায্য করতে? তবেই হয়েছে। তাহলে আমার মত ওঁর সেবাতেই তোমার দিন কাটবে, আর কারও কিছু করতে হবেনা। এই বলিয়া সে হাসিল।

তাহার হাসি দেখিয়া আনন্দ নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ নেই দিদি ওঁকে নিয়ে, থাকুন উনি চিরকাল তোমার চোখের মণি হয়ে। কিন্তু একলা দোকলার কথা এ নয়। একলা মানুষেরও আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি এত বড় যে তার পরিমাণ হয় না। ঠিক বামন-দেবের পায়ের মত। বাইরে থেকে সে দেখ্তে ছোট, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পদতলটুকু প্রসারিত হলে বিশ্ব আচ্ছন্ন করে দেয়।

চাহিয়া দেখিলাম বামনদেবের উপমায় রাজলক্ষ্মীর চিত্ত কোমল হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে কিছুই কহিলনা।

আনন্দ বলিতে লাগিল, হয়ত, আপনার কথাই ঠিক, বিশেষ কিছু করতে আমি পারিনে। কিন্তু একটা কাজ করি। সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখের অংশ নাদি নিই দিদি।

রাজলক্ষ্মী অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, সে আমি জানি আনন্দ। তোমাকে দেখে প্রথম দিনেই আমি তা বুঝেছিলাম।

আনন্দ বোধহয় এ কথায় কান দিল না, সে নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, আপনাদের মত আমারও অভাব কিছুই ছিলনা। বাবার যা আছে, বিপুল সুখে দিন কাটাবার পক্ষেও সে বেশি। আমার কিন্তু তাতে প্রয়োজন নেই। এই দুঃখীর দেশে সুখ-ভোগের লালসাটাও যদি এ জীবনে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি সেই আমার ঢের।

রতন আসিয়া জানাইল, পাচক বলিতেছে খাবার প্রস্তুত।

রাজলক্ষ্মী তাহাকে ঠাঁই করিবার আদেশ দিয়া আমাদের কহিল, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল সেরে নাও আনন্দ, আমি বড় ক্লান্ত।

সে যে ক্লান্ত তাহাতে সংশয় ছিলনা, কিন্তু ক্লান্তির দোহাই দিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই। উভয়ে নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রঙ্গ-রহস্যে আজিকার প্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল আমাদের ভারি একটা প্রসন্নতার মধ্য দিয়া, মধ্যাহ্নের সভাও জমিয়াছিল হাস্য-পরিহাসে উজ্জ্বল হইয়া। কিন্তু ভাঙিল যেন নিরানন্দের মলিন অবসাদে। আহারের জন্য দু'জনে যখন রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম তখন কাহারও মুখে কোন কথা ছিলনা।

পরদিন সকালে বজ্রানন্দ প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। তাহার কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই রাজলক্ষ্মী চিরদিন আপত্তি করে। দিন-ক্ষণের অজুহাতে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করিয়া অন্ততঃ বাধা দেয়। কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিলনা। শুধু বিদায় লইয়া যখন সে প্রস্তুত হইল, তখন কাছে আসিয়া মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আনন্দ, আবার কবে আসবে ভাই?

আমি নিকটেই ছিলাম, স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সন্ন্যাসীর চোখের দীপ্তি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, কিন্তু সে মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আস্‌বো বই কি দিদি। যদি বেঁচে থাকি, মাঝে মাঝে উৎপাত করতে হাজির হবই।

ঠিক ত?

নিশ্চয়।

কিন্তু আমরা ত শীঘ্রই চলে যাবো। যেখানে থাকবো যাবে সেখানে?

আদেশ করলে যাবো বই কি দিদি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, যেয়ো। তোমার ঠিকানা আমাকে লিখে দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখবো।

আনন্দ পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া ঠিকানা লিখিয়া হাতে দিল। সন্ন্যাসী হইয়াও আমাদের উভয়কে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, এবং রতন আসিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

১৩

সন্ন্যাসী বজ্রানন্দ তাহার ঔষধের বাক্স ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া যেদিন বাহির হইয়া গেল সেদিন শুধু যে সে এ বাড়ীর সমস্ত আনন্দটুকুই ছাঁকিয়া লইয়া গেল তাই নয় আমার মনে হইল যেন সে সেই শূন্য স্থানটুকু ছিদ্রহীন নিরানন্দ দিয়া ভরিয়া দিয়া গেল। ঘন শৈবাল পরিব্যাপ্ত জলাশয়ের যে জলটুকু তাহার অবিশ্রান্ত চাঞ্চল্যের অভিঘাতে আবর্জ্জনামুক্ত ছিল সে যেন তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লেপিয়া একাকার হইতে চলিল। তবুও ছয় সাত দিন কাটিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী প্রায় সারাদিনই বাড়ী থাকেনা। কোথায় যায় কি করে জানিনা, জিজ্ঞাসাও করিনা। দিনান্তে একবার যখন দেখা হয় তখন হয় সে অন্যমনস্ক, না হয় বড় কুশারী ঠাকুর সঙ্গে থাকেন, কাজের কথা চলে। একলা ঘরের মধ্যে যে আনন্দ আমার কেহ নয় তাকেই বার বার মনে পড়ে। মনে হয় হঠাৎ যদি সে আবার আসিয়া পড়ে। শুধু যে কেবল আমিই খুসি হই তাই নয়, ওই যে রাজলক্ষ্মী বারান্দার ওধারে বসিয়া প্রদীপের আলোকে কি একটা করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি জানি, সেও তেমনি খুসি হইয়া উঠে। এমনিই বটে। একদিন যাহাদের উন্মুখ-যুগ্ম-হৃদয় বাহিরের সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিহার করিয়া একান্ত সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া থাকিত, আজ ভাঙনের দিনে সেই বাহিরটাকেই আমাদের কত বড়ই না প্রয়োজন! মনে হয় যে-কেহ-হোক, একবার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলে যেন হাঁফ ফেলিয়া বাঁচি।

এমনি করিয়া দিন যখন আর কাটিতে চাহেনা, তখন হঠাৎ এক সময়ে রতন আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখের হাসি সে আর চাপিতে পারেনা! রাজলক্ষ্মী গৃহে ছিলনা, অতএব তাহার ভীত হইবারও আবশ্যক ছিলনা, তথাপি সে সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, শোনেননি বুঝি?

কহিলাম, না।

রতন বলিল, মা দুর্গা করুন মায়ের এই মতিটি যেন শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে। আমরা যে দু'চার দিনেই যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছি?

রতন আর একবার দ্বারের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, সে খবরটা সঠিক এখনো পাইনি। হয় পাটনায়, না হয় কাশীতে, না হয়—কিন্তু এ ছাড়া মার বাড়ী ত আর কোথাও নেই!

চুপ করিয়া রহিলাম। আমার এত বড় ব্যাপারেও নিরুৎসুকতা লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় সে ভাবিল আমি কথা তাহার বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাই সে চাপা গলায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি বলচি এ সত্যি। যাওয়া আমাদের হবেই। আঃ—বাঁচা যায় তা'হলে, না?

বলিলাম, হাঁ।

রতন অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিল, কষ্ট করে আর দু-চার দিনই সবুর করুন, বাস্। বড় জোর হপ্তাখানেক, তার বেশি নয়। গঙ্গামাটির সমস্ত ব্যবস্থা মা কুশারীমহাশয়ের সঙ্গে শেষ করে ফেলেছেন, এখন বেঁধে ছেঁদে নিয়ে একবার দুর্গা দুর্গা বলে পা বাড়াতে পারলে হয়। আমরা হলুম সব সহরের মানুষ, এখানে কি কখনো মন বসে? এই বলিয়া সে খুসির আবেগে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রতনের অজানা কিছুই নাই। তাহাদেরই মত আমিও যে একজন রাজলক্ষ্মীর অনুচরের মধ্যে, এবং ইহার অধিক কিছু নয় এ কথা সে জানে। সে জানে, কাহারও কোন মতামতেরই মূল্য নাই, সকলের সমস্ত ভাল লাগা না-লাগা কর্ত্রীর ইচ্ছা ও অভিরুচির পরেই নির্ভর করে।

যে আভাষটুকু রতন দিয়া গেল সে নিজে তাহার মর্ম্ম বুঝেনা, কিন্তু তাহার বাক্যের সেই নিহিত অর্থ দেখিতে দেখিতে আমার চিত্তপটে সর্ব্বদিক দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর শক্তির অবধি নাই, এই বিপুল শক্তি দিয়া পৃথিবীতে সে যেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে। একদিন এই খেলায় আমার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার সেই একাগ্র বাসনার প্রচণ্ড আকর্ষণ প্রতিহত করিবার সাধ্য আমার ছিলনা, হেঁট হইয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে সে বড় করিয়া আনে নাই। ভাবিতাম আমার জন্য সে অনেক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছে। কিন্তু আজ চোখে পড়িল ঠিক তাহাই নয়। রাজলক্ষ্মীর স্বার্থের কেন্দ্রটা এতকাল দেখি নাই বলিয়াই এরূপ ভাবিয়া আসিয়াছি। বিত্ত, অর্থ, ঐশ্বর্য্য—অনেক কিছুই সে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে কি আমারই জন্য? আবর্জ্জনা স্তূপের মত সে সকল কি তাহার নিজের প্রয়োজনেরই পথরোধ করে নাই? আমি এবং আমাকে লাভ করার মধ্যে যে রাজলক্ষ্মীর কত বড় প্রভেদ ছিল সেই সত্য আজ আমার কাছে প্রতিভাত হইল। আজ তাহার চিত্ত ইহ-লোকের সমস্ত পাওয়া তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার সেই পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবার স্থান আমার নাই। অতএব, অন্যান্য আবর্জ্জনার মত আমাকেও যে এখন পথের একধারে অনাদরে পড়িয়া থাকিতে হইবে তাহা যত বেদনাই দিক, অস্বীকার করিবার পথ নাই। অস্বীকার করিওনা কখনও।

পরদিন সকালেই জানিতে পারিলাম ধূর্ত্ত রতন তথ্য যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা ভ্রান্ত নহে। গঙ্গামাটি সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর নিজের মুখেই তাহা অবগত হইলাম। প্রভাতে নিয়মিত পূজা আহ্নিক সমাধা করিয়া সে অপরাপর দিনের মত বাহির হইলনা। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, পরশু এমনি সময়ে যদি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা বার হয়ে যেতে পারি ত সাঁইথিয়ার পশ্চিমের গাড়ী অনায়াসে ধরতে পারবো, কি বল?

বলিলাম, পারবে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এখানকার বিলি-ব্যবস্থা ত এক রকম শেষ করে ফেল্‌লাম। কুশারী-মশাই যেমন দেখছিলেন শুনছিলেন, তেমনই করবেন।

কহিলাম, ভালই হ'ল।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। বোধহয় প্রশ্নটা ঠিকমত আরম্ভ করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই। শেষে কহিল, বঙ্কুকে চিঠি লিখে দিয়েছি সে একখানা গাড়ী রিজার্ভ করে ষ্টেসনেই উপস্থিত থাকবে। কিন্তু থাকে তবেই ত।

বলিলাম, নিশ্চয় থাকবে। সে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবেনা।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, সাধ্যমত করবেনা। তবুও, —আচ্ছা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেনা?

কোথায় যাইতে হইবে এ প্রশ্ন করিতে পারিলামনা। মুখে বাধিল কেবল বলিলাম, যদি যাবার প্রয়োজন মনে কর ত যেতে পারি।

ইহার প্রত্যুত্তরে রাজলক্ষ্মীও কিছু বলিতে পারিলনা। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কই, তোমার চা এখনো ত আনলেনা?

কহিলাম, না, বোধহয় কাজে ব্যস্ত আছে।

বস্তুতঃ, চা আনিবার সময় বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেকার দিনে ভৃত্যদের এতবড় অপরাধ সে কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারিতনা, বকিয়া ঝকিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিত, কিন্তু এখন কি একপ্রকারের লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল এবং একটা কথাও না কহিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে সকল প্রজারা আসিয়াই ঘেরিয়া দাঁড়াইল। ডোমেদের মালতি মেয়েটিকে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহারা অন্যত্র গিয়া সংসার পাতাইয়াছিল, দেখা হইলনা। খবর পাইলাম সেখানে স্বামী লইয়া সে সুখে আছে। কুশারী মহাশয়ের যুগল বাটি থাকিতেই সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি ঘটিত বিবাদের মীমাংসা হওয়ায় তাঁহারা আবার এক হইয়াছিলেন। কি করিয়া যে রাজলক্ষ্মী কি করিল সবিস্তারে জানিবার কৌতুহলও ছিলনা জানিওনা। কেবল এইটুকু তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া জানিতে পারিলাম যে, কলহের অবসান হইয়াছে, এবং পূর্ব্বকৃত বিচ্ছেদের গ্লানি কোন পক্ষের মনেই আর অবশিষ্ট নাই।

সুনন্দা আসিয়া তাহার ছেলেকে লইয়া আমাকে প্রণাম করিল, কহিল, আমাদের যে আপনি শীঘ্র ভুলে যাবেননা সে আমি জানি। এ বাহুল্য প্রার্থনা আপনার কাছে আমি কোরবনা।

সহাস্যে কহিলাম, আমার কাছে আবার কি তোমার প্রার্থনা কোরবে দিদি?

আমার ছেলেকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

কহিলাম, এই ত বাহুল্য প্রার্থনা সুনন্দা। তোমার মত মায়ের ছেলেকে যে কোন্ আশীর্ব্বাদ করা যায় সে ত আমিই জানিনে দিদি।

রাজলক্ষ্মী কি একটা প্রয়োজনে এই দিক দিয়া যাইতেছিল কথাটা তাহার কানে যাইতেই ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার হইয়া জবাব দিয়া কহিল, ওর ছেলেকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ করে যাও যেন বড় হয়ে ও তোমার মত মন পায়।

হাসিয়া কহিলাম, বেশ আশীর্ব্বাদ। তোমার ছেলেকে বুঝি লক্ষ্মী তামাসা করতে চায় সুনন্দা।

কথা আমার শেষ না হইতেই রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, কি তামাসা করতে চাই নিজের ছেলের সঙ্গে? এই যাবার সময়ে? এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমিও ত ওর মায়ের মত, আমি প্রার্থনা করি ভগবান যেন ওকে এই বরই দেন। তার চেয়ে বড় ত আমি কিছুই জানিনে।

সহসা চাহিয়া দেখিলাম তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথাও না কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর সবাই মিলিয়া গঙ্গামাটি হইতে চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এমন কি রতন পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ চোখ মুছিতে লাগিল। যাহারা রহিল তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সকলেই আবার আসিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, শুধু দিতে পারিলামনা আমি। আমিই কেবল নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম এ জীবনে এখানে ফিরিয়া আসিবার আমার সম্ভাবনা নাই। তাই যাবার পথে, এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রতি বারংবার ফিরিয়া চাহিয়া কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যেন অপরিমেয় মাধুর্য্য ও বেদনায় পরিপূর্ণ একখানি বিয়োগান্ত নাটকের এইমাত্র যবনিকা পড়িল; নাট্যশালার দীপ নিভিল,—এইবার মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ সংসারের সহস্রবিধ ভিড়ের মধ্যে আমাকে রাস্তায় বাহির হইতে হইবে। কিন্তু জনতার মাঝখানে সে-মনের অত্যন্ত সতর্কতায় পদক্ষেপ করিবার কথা, আমার সেই মন যেন নেশার ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরে আমরা সাঁইথিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মীর আদেশ ও উপদেশের কোনটাই বঙ্কু অবহেলা করে নাই। সে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজে আসিয়া ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত ছিল, যথা সময়ে ট্রেণ আসিলে মাল-পত্র বোঝাই দিয়া রতনকে চাকরদের কামরায় তুলিয়া দিয়া বিমাতাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল। কিন্তু আমার সহিত সে বিশেষ কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিলনা, কারণ, এখন তাহার দর বাড়িয়াছে, ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি লইয়া এখন সংসারে সে মানুষের মধ্যে এক জন বলিয়া পরিগণিত

হইয়াছে। বড় বিচক্ষণ ব্যক্তি। সকল অবস্থাকেই মানিয়া লইয়া চলিতে জানে। এ বিদ্যা যাহার অধিগত হইয়াছে পৃথিবীতে তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়না।

গাড়ী ছাড়িতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতা যাইবার ট্রেণ আসিবে প্রায় শেষ রাত্রে। একধারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাজলক্ষ্মী তাহার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাতের ইসারায় আমাকে আহ্বান করিল। নিকটে যাইতেই কহিল, একবার ভেতরে এস। ভিতরে আসিতে সে হাত ধরিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, তুমি কি খুব শীঘ্রই বর্ম্মায় চলে যাবে? যাবার আগে আর একটিবার কি দেখা দিয়ে যাবেনা?

কহিলাম, যদি প্রয়োজন মনে কর যেতে পারি।

রাজলক্ষ্মী চুপি চুপি উত্তর দিল, সংসারে যাকে প্রয়োজন বলে সে নেই। শুধু আর একবার দেখ্‌তে চাই। আস্‌বে?

আস্‌বো।

কলিকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে?

দেবো।

বাহিরে গাড়ী ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং গার্ড সাহেব তাঁহার সবুজ আলো বার বার নাড়িয়া এই আদেশই কায়েম করিলেন। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল। আমি নামিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেই গাড়ী চলিতে সুরু করিল। অন্ধকার রাত্রি, ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায়না, কেবল ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মের গোটা কতক কেরোসিনের আলো মন্থরগতিশীল গাড়ীর সেই খোলা জানালার একটি অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির উপরে বার কয়েক আলোকপাত করিল।

• • • •

কলিকাতায় আসিয়া চিঠি দিলাম, এবং জবাবও পাইলাম। এখানে কাজ বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহা দিন পনেরোর মধ্যে শেষ হইল। এইবার বিদেশে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি মত আর একবার রাজলক্ষ্মীকে দেখা দিতে হইবে। আরও সপ্তাহ দুই এম্‌নিই কাটিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল এত দিনে কি জানি কি তাহার মতলব হইবে, হয়ত, সহজে ছাড়িতে চাহিবে না, হয়ত অতদূরে যাওয়ার বিরুদ্ধে নানারূপ ওজর আপত্তি তুলিয়া জিদ্ করিতে থাকিবে,—কিছুই অসম্ভব নয়। এখন সে কাশীতে। তাহার বাসার ঠিকানাও জানি, ইতিমধ্যে দুই তিন খানা পত্রও পাইয়াছি, এবং ইহাও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমার প্রতিশ্রুতির বিষয় কোথাও সে ইঙ্গিতে স্মরণ করাইবার প্রয়াস করে নাই। না করিবারই কথা। মনে মনে বলিলাম, আপনাকে এতখানি ছোট করিয়া আমিও বোধ করি মুখ ফুটিয়া লিখিতে পারিতামনা তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যাও। অকস্মাৎ দেখিতে দেখিতে কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিলাম। এ জীবনে সে যে এতখানি জড়াইয়াছিল তাহা কেমন করিয়া যে এতদিন ভুলিয়া ছিলাম ভাবিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখনও সময় আছে, তখনও গাড়ী ধরিতে পারি। বাসায় সমস্ত পড়িয়া রহিল, বাহির হইয়া পড়িলাম। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিস-গুলার প্রতি চাহিয়া মনে হইল থাক্ এ সকল পড়িয়া। আমার প্রয়োজনের কথা যে আমার চেয়েও বেশি করিয়া জানে তাহারই উদ্দেশে যাত্রা করিয়া আর প্রয়োজনের বোঝা বহিবনা। রাত্রে ট্রেণের মধ্যে কিছুতেই ঘুম আসিল না, অলস তন্দ্রার ঝোঁকে মুদিত দুই চক্ষুর পাতার উপর কত খেয়াল, কত কল্পনাই যে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার আদি অন্ত নাই। হয়ত, অধিকাংশই এলোমেলো, কিন্তু সবটুকু যেন একেবারে মধু দিয়া ভরা। ক্রমশঃ সকাল হইল, বেলা বাড়িতে লাগিল, লোকজনের ওঠা-নামা, হাঁকা-হাঁকি, দৌড়-ধাপের অবধি রহিলনা, খর রৌদ্রতাপে চতুষ্পার্শ্বের কোথাও কোন কুহেলিকার চিহ্ন মাত্র রহিলনা, কিন্তু আমার চক্ষে সমস্তই একেবারে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পথে ট্রেণের বিলম্ব হওয়ায় রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাটীতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা অধিক হইয়াছে। বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে একজন বৃদ্ধ গোছের ব্রাহ্মণ বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চান?

কি চাই সহসা বলিতে পারিলামনা। তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন কাকে খুঁজ্‌ছেন?

কাহাকে খুঁজিতেছি ইহাও সহসা বলা কঠিন। একটু থামিয়া কহিলাম, রতন আছে?

না, সে বাজারে গেছে।

ব্রাহ্মণ সজ্জন ব্যক্তি। আমার ধূলি-ধূসর মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া বোধ হয় অনুমান করিলেন যে আমি দূর হইতে আসিতেছি। সদয় কণ্ঠে কহিলেন, আপনি বসুন, সে শীঘ্রই ফিরবে। আপনার কি তাকেই শুধু দরকার?

নিকটে একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িলাম।

তাঁহার প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে বঙ্কুবাবু আছেন?

আছে বই কি। এই বলিয়া তিনি একজন নূতন চাকরকে ডাকিয়া বঙ্কুকে ডাকিয়া দিতে কহিলেন। বঙ্কু আসিয়া আমাকে দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, পরে, তাহার নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া কহিল, আমরা ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বর্মায় চলে গেছেন।

এই আমরা যে কে, এ প্রশ্ন আমি আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলামনা। বঙ্কু কহিল, আপনার জিনিস-পত্র বুঝি এখনো গাড়ীতেই—

না, জিনিস-পত্র আমি কিছুই সঙ্গে আনিনি।

আনেননি? রাত্রের গাড়ীতেই ফিরবেন বুঝি?

কহিলাম, সম্ভব হলে তাই ফিরব ভেবেচি।

বঙ্কু কহিল, তা'হলে একটা বেলার জন্যে আর দরকারই বা কি?

ভৃত্য আসিয়া ধুতি গামছা হাতমুখ ধোবার জল প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্তই দিয়া গেল, কিন্তু আর কেহ আমার কাছে আসিল না।

খাবার ডাক পড়িল, গিয়া দেখিলাম আমার ও বঙ্কুর ঠাঁই পাশাপাশি হইয়াছে। দক্ষিণের দরজা ঠেলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। গোড়ায় বোধহয় তাহাকে চিনিতে পারি নাই। যখন পারিলাম প্রথমটা চোখের সম্মুখে যেন সমস্ত কালো হইয়া উঠিল। এখানে কি আছে, এবং কে আছে মনে পড়িলনা। পরক্ষণেই মনে হইল নিজের মর্য্যাদা রাখিয়া, হাস্যকর কিছু একটা না করিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া এ বাড়ী হইতে আবার সহজ মানুষের মত বাহির হইতে পারিব।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ীতে কষ্ট হয়নি ত?

এ ছাড়া সে আর কি বলিতে পারে! ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িয়া অল্পকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, বোধহয় মুহূর্ত্ত কয়েকের বেশি নয়, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিলাম, না, কষ্ট হয়নি।

এইবার ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে যে শুধু থান কাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত, পিঠ-জোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশিও আর নাই। মাথার পরে ললাটের প্রান্ত পর্য্যন্ত আঁচল টানা, তথাপি তাহারই ফাঁক দিয়া কাটা চুলের দুই চারি গোছা অলক কণ্ঠের উভয় পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উপবাস ও কঠোর আত্ম-নিগ্রহের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা মুখের পরে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ভাতের গ্রাস আমার গলায় পাথরের মত বাধিতেছিল, তবু জোর করিয়া গিলিতে লাগিলাম; কেবলই মনে হইতে লাগিল যেন চিরদিনের মত এই নারীর জীবন হইতে আমি মুছিয়া বিলুপ্ত হইতে পারি। এবং আজ, শুধু একটা দিনের জন্যও সে যেন আমার খাওয়ার স্বল্পতা লইয়া আর আলোচনা করিবার অবসর না পায়।

আহারের শেষে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কু বলছিল তুমি নাকি আজ রাত্রের গাড়ীতেই ফিরে যেতে চাও?

বলিলাম, হাঁ।

ইস্! আচ্ছা, কিন্তু তোমার জাহাজ ছাড়বে ত সেই রবিবারে।

তাহার এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত উচ্ছ্বাসে বিস্মিত হইয়া মুখের প্রতি চাহিতেই সে হঠাৎ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। পরক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তার ত এখনও তিন দিন দেরি!

বলিলাম, হাঁ, আরও কাজ আছে।

পুনরায় রাজলক্ষ্মী কি একটা বলিতে গিয়াও চুপ করিয়া রহিল বোধহয় আমার শ্রান্তি বা অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনার কথা মুখে আনিতে পারিলনা। খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, আমার গুরুদেব এসেছেন।

বুঝিলাম বাহিরে যে ব্যক্তির সহিত প্রথমেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল তিনিই। ইঁহাকেই দেখাইবার জন্য সে আমাকে একবার এই কাশীতেই টানিয়া আনিয়াছিল। সন্ধ্যার পরে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমার গাড়ী ছাড়িবে বারোটার পরে। এখনও ঢের সময়। মানুষটি সত্যই ভালো! স্বধর্ম্মে অবিচলিত নিষ্ঠাও আছে উদারতারও অভাব নাই। আমাদের সকল কথাই জানেন, কারণ, গুরুর কাছে রাজলক্ষ্মী গোপন কিছুই করে নাই! অনেক কথাই বলিলেন। গল্পচ্ছলে উপদেশও কম দিলেননা, কিন্তু তাহা উগ্রও নয়, আঘাতও করেনা। সমস্ত কথা মনে নাই, হয়ত মন দিয়াও শুনি নাই, তবে এটুকু স্মরণ আছে যে একদিন রাজলক্ষ্মীর যে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তিনি তাহা জানিতেন, তাই, দীক্ষার সম্বন্ধেও তিনি প্রচলিত রীতি মানেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস, যাহার পা পিছলাইয়াছে সংগুরুর প্রয়োজন তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

নব-বিধান

...এব হৌক, তোমাকে হিংসা করিনা, কিন্তু যে দুর্ভাগা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া একই পথে একদিন তরণী ভাসাইয়াছিল এ জীবনে তাহার আর কূল মিলিবেনা। ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল, গঙ্গামাটির সকল স্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে দিন বিদায়ের ক্ষণে যে সকল কথা মনে আসিয়াছিল, আবার তাহাই জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, এই যে এক জীবন নাট্যের অত্যন্ত সুন্দর এবং সাধু উপসংহার হইল ইহার খ্যাতির আর অন্ত নাই। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিলে ইহার অম্লান দীপ্তি কোনদিন নিবিবেনা, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে মাথা নত করিবার মত পাঠককেও কোনদিন সংসারে অভাব ঘটিবেনা,—কিন্তু আমার নিজের কথা

বাক্তি কোচবাক্স হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

কে রে রতন যে?

বাবু, বিদেশে চাকরের যদি অভাব হয় আমাকে একটু খবর দেবেন। যতদিন বাঁচবো আপনার সেবার ত্রুটি হবেনা।

গাড়ীর লণ্ঠনের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুই কাঁদচিস্ কেন বল্ ত?

রতন জবাব দিলনা, হাত দিয়া চোখ মুছিয়া পায়ের কাছে আর একবার ঢিপ করিয়া নমস্কার করিয়াই দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আশ্চর্য্য, এই সেই রতন।

সম্পূর্ণ

নব-বিধান

এই আখ্যায়িকার নায়ক শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর ঘোষাল স্ত্রী-বিয়োগান্তে পুনশ্চ সংসার পাতিবার প্রস্তাবেই ই না বন্ধু-মহলে একটু বিশেষ রকমের চক্ষুলজ্জায় ড়িয়া যাইতেন ত, এই ছোট্ট গল্পের রূপ এবং ঃ বদলাইয়া যে কোথায় কি দাঁড়াইত, তাহা মান করাও শক্ত। সুতরাং, ভূমিকায় সেই ঘরণটুকু বলা আবশ্যক।

শৈলেশ্বর কলিকাতার একটা নামজাদা কলেজের নের অধ্যাপক—বিলাতি ডিগ্রি আছে। বেতন টি শত। বয়স বত্রিশ। মাস-পাঁচেক পূর্ব্বে র-বছরের একটি ছেলে রাখিয়া স্ত্রী মারা ছে। পুরুষানুক্রমে কলিকাতার পটলডাঙ্গার ... ড়ীর মধ্যে ওই ছেলেটি ছাড়া, বেহারা, ঝি, সহিস-কোচম্যান প্রভৃতিতে প্রায় সাত আট ... লোক। ধরিতে গেলে সংসারটা এক রকম ই সব চাকরদের লইয়াই।

প্রথমে বিবাহ করিবার আর ইচ্ছাই ছিলনা। ইহা ভাবিক। এখন ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতেও নূতনত্ব ই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ভবানীপুরের ভূপেন বুয্যের মেজ মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে ং সে দেখিতে ভাল। এরূপ কৌতূহলও সম্পূর্ণ পেরহীন, তথাপি সে দিন সন্ধ্যাকালে শৈলেশেরই ঠকখানায় চায়ের বৈঠকে এই আলোচনাই উঠিয়া ছিল। তাহার বন্ধু-সমাজের ঠিক ভিতরের না য়াও একজন অল্প বেতনের ইস্কুল পণ্ডিত ছিলেন। বনের পিপাসাটা তাঁহার কোন বড়-বেতনের কসারের চেয়েই ন্যূন ছিলনা। পাগ্‌লাটে ছের বলিয়া প্রফেসররা তাহাকে দিগ্‌গজ বলিয়া কতেন। সে হিসাব করিয়াও কথা বলিতনা, র দায়িত্বও গ্রহণ করিতনা। দিগ্‌গজ নিজে জি জানিতনা, মেয়ে-মানুষে একজামিন পাশ রাছে শুনিলে রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া ত! ভূপেনবাবুর কন্যার প্রসঙ্গে সে হঠাৎ বলিয়া ল, একটা বৌকে তাড়ালেন, একটা বৌকে ল, আবার বিয়ে? সংসার করতেই যদি হয় ত উমেশ ভট্‌চাযিার মেয়ে দোষটা করলে কি শুনি? ঘর করতে হয় ত তাকে নিয়ে ঘর করুন।

ভদ্রলোকেরা কেহই কিছু জানিতেন না, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। দিগ্‌গজ কহিল, সে বেচারার দিকে ভগবান যদি মুখ তুলে চাইলেন ত তাকেই বাড়ীতে আনুন,—আবার একটা বিয়ে করবেন না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ! পাশ হয়ে ত সব হবে! রাগে তাহার দুই চক্ষু রাঙা হইয়া উঠিল। শৈলেশ্বর নিজেও কোন মতে ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, আরে, সে যে পাগল দিগ্‌গজ।

কেহ কাহাকেও পাগল বলিলে দিগ্‌গজের আর হুঁস থাকিতনা, সে ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, পাগল সবাই! আমাকেও লোকে পাগল বলে,—তাই, বলে আমি পাগল!

সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যাপারটা চাপা পড়িলনা। হাসি থামিলে শৈলেশ লজ্জিত মুখে ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিল, আমার জীবনে সে একটা অত্যন্ত unfortunate ব্যাপার। বিলাত যাবার আগেই আমার বিয়ে হয়, কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে বাবার কি একটা নিয়ে ভয়ানক বিবাদ হয়ে যায়। তা'ছাড়া মাথা খারাপ বলে বাবা তাঁকে বাড়ীতে রাখতেও পারেননি। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে আমি আর দেখিনি। এই বলিয়া শৈলেশ জোর করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ওহে দিগ্‌গজ! বুদ্ধিমান! তা' না হ'লে কি তাঁরা একবার পাঠাবার চেষ্টাও করতেননা? চায়ের মজ্‌লিসে গরহাজির ত কখনো দেখ্‌লুমনা, কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এলে এ আশা আর কোরোনা। গঙ্গাজল আর গোবরছড়ার সঙ্গে তোমাদের সকলকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে তবে ছাড়বেন, এ নোটিশ তোমাদের আগে থেকেই দিয়ে রাখ্‌লুম!

দিগ্‌গজ জোর করিয়া বলিল, কখ্‌খনো না!

কিন্তু এ কথায় আর কেহ যোগ দিলেন না। ইহার পরে সাধারণ গোছের দুই-চারিটা কথাবার্ত্তার পরে রাত্রি হইতেছে বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান

কারলেন। আর এমনি সময়েই প্রত্যহ সকালে হয়,—হইলও তাই। কিন্তু আজ যেমন একটা বিষাদ, ম্লান-ছায়া সকলের মুখের পরেই লাগিয়া রহিল,—সে যেন আজ আর ঘুচিতে চাহিল না।

৯

বন্ধুরা যে তাহার তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেননা, বরঞ্চ নিঃশব্দে তিরস্কৃত করিয়া গেলেন, শৈলেশ তাহা বুঝিল। একদিকে যেমন তাহার বিরক্তির সীমা রহিলনা, অপরদিকে তেমনি লজ্জারও অবধি রহিলনা। তাহার মুখ দেখানো যেন ভার হইয়া উঠিল। শৈলেশের আঠারো বৎসর বয়সে যখন প্রথম বিবাহ হয়, তাহার স্ত্রী উষার বয়স তখন মাত্র এগারো। মেয়েটি দেখিতে ভাল বলিয়াই কালীপদবাবু অল্প-মূল্যে ছেলে বেচিতে রাজী হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ দেনা-পাওনা লইয়াই শৈলেশ বিলাত চলিয়া গেলে দুই বৈবাহিকে তুমুল মনোমালিন্য ঘটে। শ্বশুর বধূকে এক প্রকার জোর করিয়াই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেন, সুতরাং পুত্র দেশে ফিরিয়া আসিলে নিজে যাচিয়া আর বৌ আনাইতে পারিলেননা। ইচ্ছাও তাহার ছিলনা। ওদিকে উমেশ তর্কালঙ্কারও অতিশয় অভিমানী প্রকৃতির লোক ছিলেন, অযাচিত, কোন মতেই ব্রাহ্মণ নিজের ও কন্যার সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া মেয়েকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেননা। শৈলেশ প্রবাসে থাকিতেই এই সকল ব্যাপারের কিছু কিছু শুনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল বাড়ী গেলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে; কিন্তু বছর-চারেক পরে যখন যথার্থই বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি দুই-ই বদলাইয়া গেছে। অতএব আর একজন বিলাত-ফেরতের বিলাতি আদাপ-কায়দা-জানা বিদুষী মেয়ের সহিত যখন বিবাহের সম্ভাবনা হইল, তখন সে চুপ করিয়াই সম্মতি দিল। ইহার পরে বহুদিন গত হইয়াছে শৈলেশের পিতা কালীপদবাবুও মরিয়াছেন, বৃদ্ধ তর্কালঙ্কারও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এত কালের মধ্যে ও-বাড়ীর কোন খবরই যে শৈলেশের কানে যায় নাই, তাহা নহে। সে ভায়েদের সংসারে আছে, জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা, গঙ্গাজল ও গোবর লইয়া দিন কাটিতেছে—তাহার শুচিতার পাগলামিতে ভায়েরা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনটাই তাহার প্রতিসুখকর নহে, কেবল, একটু সান্ত্বনা এই ছিল যে, এই প্রকৃতির নারীদের চরিত্রের দোষ বড় কেহ দেয়না। দিলে শৈলেশের কতখানি লাগিত বলা কঠিন, কিন্তু এ দুর্ভাবনা আজও তাহাকে কোন কারণে কখনো [illegible] হয় নাই।

শৈলেশ ভাবিতে লাগিল। ভূপেনবাবুর [illegible] কন্যার আশা সম্প্রতি পরিত্যাগ না করিলেও [illegible] কিন্তু পত্নী অন্যত্র হইতে আনিয়া একজন [illegible] ছাব্বিশ বছরের সুশিক্ষিতা রমণীর প্রতি [illegible] আর দিলে তাহার এতদিনের ঘর-সংসারে যে [illegible] থাকিবে, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। [illegible] লোকেন। তাহার জননীই যে তাহার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার একমাত্র পুত্রকে যে সে কিরূপ বিদ্বেষের চোখে দেখিবে তাহা মনে করিতেই মন তাহার শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ভগিনীর বাড়ী শ্যামবাজারে। বিভা ব্যারিষ্টারের স্ত্রী, সেখানে ছেলে থাকিবে ভাল, কিন্তু [illegible] ত' চিরকালের ব্যবস্থা হইতে পারে না। [illegible] পণ্ডিতকে তাহার যেন চড়াইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। লোকটাকে অনেকদিন সে অনেক চা ও বিস্কুট খাওয়াইয়াছে, সে এমনি করিয়া তাহার শোধ দিল।

শৈলেশ আসলে লোক মন্দ ছিলনা। [illegible] অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। [illegible] লজ্জার চেয়ে চঞ্চলতাই তাহার প্রবল ছিল। [illegible] ভিমানের সঙ্গে আর একটা বড় অভিমান তাহার ছিল যে, সে জ্ঞানতঃ, কাহারও প্রতি লেশমাত্র অন্যায় বা অবিচার করিতে পারে না। বন্ধুরা মুখে [illegible] বলিলেও মনে মনে যে তাহাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত অপরাধী করিয়া রাখিবে, ইহা বুঝিতে বাকি ছিলনা,—এই অখ্যাতি সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

সারারাত্রি চিন্তা করিয়া ভোর নাগাদ তাহার মাথায় সহসা অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির উদয় হইল। তাহাকে আনিতে পাঠাইলেই ত' সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমতঃ সে আসিবে না। [illegible] বা আসে ম্লেচ্ছর সংসার হইতে সে দু'দিনেই আপনি পলাইবে। তখন কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। এই দু'-পাঁচ দিন সোমেনকে তাহার পিসীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে অন্যত্র কোথাও গা-ঢাকা দিয়া থাকিলেই হইল! এত সোজা কথা কেন যে তাহার এতক্ষণ মনে হয় নাই, ইহা ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই ত' ঠিক!

কলেজ হইতে সে সাত দিনের ছুটি লইল। [illegible] ছাবাদে একজন বাল্যবন্ধু ছিলেন, নিজের বাগান [illegible]

গা তাঁহাকে তার করিয়া দিল, এবং বিভাকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, সে নবদ্বীপুর হইতে উষাকে আনিতে পাঠাইতেছে, যদি আসে ত' সে যেন আসিয়া সোমেনকে শ্যামবাজারে লইয়া যায়। এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে তাহার দিন-সাতেক বিলম্ব হইবে।

শৈলেশের এক অনুগত মামাতো ভাই ছিল, সে মেসে থাকিয়া সদাগরী আফিসে চাকুরি করিত। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, ভুতো, তোকে কাল একবার নবদ্বীপুরে গিয়ে তোর বৌদিকে আনতে হবে।

ভূতনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, বৌদিদিটা আবার কে?

তুই ত বরযাত্রী গিয়েছিলি, তোর মনে নেই? উমেশ ভট্টাচার্য্যির বাড়ী?

মনে খুব আছে, কিন্তু কেউ কারুকে চিনিনে, তিনি আসবেন কেন আমার সঙ্গে?

শৈলেশ কহিল,—না আসে নেই—নেই। তোর কি? সঙ্গে বেহারা আর ঝি যাবে। আসবে না বললেই ফিরে আসবি।

ভুতো আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ... যাবো। কিন্তু মার-ধর্ না করে।

... তাহার হাতে খরচ-পত্র এবং একটা চাবি দিয়া কহিল, আজ রাত্রের ট্রেণে আমি এলাহাবাদে যাচ্ছি। সাত দিন পরে ফিরবো। যদি আসে এই চাবিটা দিয়ে ওই আলমারিটা দেখিয়ে দিবি। সংসার খরচের টাকা রইল। পুরো একমাস চলা চাই।

ভূতনাথ রাজী হইয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হল কেন মেজ্‌দা? খাল খুঁড়ে কুমীর আনছনা ত?

শৈলেশ চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আসবেনা নিশ্চয়! কিন্তু লোকতঃ ধর্ম্মতঃ একটা কিছু করা চাই ত! শ্যামবাজারে একটা খবর দিস্। সোমেনকে যেন নিয়ে যায়।

রাত্রের পঞ্জাব মেলে শৈলেশ্বর এলাহাবাদ চলিয়া গেল।

৩

দিন কয়েক পরে একদিন দুপুরবেলা বাটীর দরজায় আসিয়া একখানা মোটর থামিল। এবং মিনিট-দুই পরেই একটি বাইশ-তেইশ বছরের মহিলা প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের কার্পেটে বসিয়া সোমেন্দ্র একখানা মস্ত বাঁধানো এ্যালবাম হইতে তাহার নূতন মা'র ছবি দেখাইতেছিল; সে-ই মহা আনন্দে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, মা, পিসিমা।

উষা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরনে নিতান্ত সাদা-সিধা একখানি রাঙা-পেড়ে শাড়ী, হাতে এবং গলায় সামান্য দুই একখানি গহনা, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া বিভা অবাক্ হইল।

প্রথমে উষাই কথা কহিল। একটু হাসিয়া ছেলেকে বলিল, পিসিমাকে প্রণাম করলেনা বাবা?

সোমেনের এ শিক্ষা বোধ করি নূতন, সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পিসিমা'র পায়ের বুট ছুঁইয়া কোনমতে কাজ সারিল। উষা কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে ঠাকুরঝি, বোসো?

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে এলেন?

উষা বলিল, সোমবারে এসেছি, আজ বুধবার—তাহ'লে তিন দিন হল। কিন্তু, দাঁড়িয়ে থাকলে হবে কেন ভাই, বোসো।

বিভা ভাব করিতে আসে নাই, বাড়ী হইতেই মনটাকে সে তিক্ত করিয়া আসিয়াছিল, কহিল, বসবার সময় নেই আমার,—ঢের কাজ। সোমেনকে আমি নিতে এসেচি।

কিন্তু এই রুক্ষতার জবাব উষা হাসিমুখে দিল। কহিল, আমি একলা কি ক'রে থাকবো ভাই? সেখানে বোয়েদের সব ছেলেপুলেই আমার হাতে মানুষ। কেউ একজন কাছে না থাকলে ত আমি বাঁচিনে ঠাকুরঝি। এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিল।

এই হাসির উত্তর বিভা কটুকণ্ঠেই দিল। ছেলেটিকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বাবা বলেছেন আমার ওখানে গিয়ে থাকতে। আমার নষ্ট করবার সময় নেই সোমেন,—যাও তো শীগ্‌গীর কাপড় ... নাও; আমাকে আবার একবার নিউমার্কেট ঘুরে যেতে হবে।

দু'জনের মাঝখানে পড়িয়া সোমেন ম্লানমুখে ভয়ে ভয়ে বলিল, মা যে যেতে বারণ করচেন পিসিমা? তাহার বিপদ দেখিয়া উষা তাড়াতাড়ি বলিল, তোমাকে যেতে আমি বারণ করছিনে বাবা, আমি শুধু এই বলচি যে, তুমি চলে গেলে একলা বাড়ীতে আমার বড় কষ্ট হবে।

ছেলেটি মুখে ইহার জবাব কিছু দিলনা, কেবল অত্যন্ত কাছে ঘেঁসিয়া বিমাতার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুলের মধ্যে দিয়া আঙুল বুলাইতে বুলাইতে উষা হাসিয়া কহিল, ও যেতে চায়না ঠাকুরঝি।

লজ্জায় ও ক্রোধে বিভার মুখ কালো হইয়া উঠিল, এবং অতি-সভ্য সমাজের সহস্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষা সত্বেও সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলনা। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত, এবং আমার বিশ্বাস আপনি অন্যায় প্রশ্রয় না দিলে ও বাপের আজ্ঞা পালন করতো।

ঊষার ঠোঁটের কোণ দু'টা শুধু একটুখানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, আমরা বুড়োমানুষেই নিজের উচিত করে উঠতে পারিনে ভাই, সোমেন ত ছেলেমানুষ। ও বোঝেই বা কতটুকু। আর অন্যায় প্রশ্রয়ের কথা যদি তুললে ঠাকুরঝি, আমি অনেক ছেলে মানুষ করেছি, এ সব আমি সামলাতে জানি। তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

বিভা কঠোর হইয়া কহিল, দাদাকে তা'হলে চিঠি লিখে দেবো।

ঊষা কহিল, দিয়ো। লিখে দিয়ো যে, তাঁর এলাহাবাদের হুকুমের চেয়ে আমার ক'লকাতার হুকুমটাই আমি বড় মনে করি। কিন্তু দেখ ভাই বিভা, আমি তোমার সম্পর্কে এবং বয়সে দুই-ই বড় এই নিয়ে আমার উপরে তুমি অভিমান করতে পাবেনা। এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কহিল, আজ তুমি রাগ করে একবার বসলে না পর্য্যন্ত, কিন্তু আর একদিন তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৌদিদির কাছে এসে বসবে, এ কথাও আজ তোমাকে বলে রাখলুম।

বিভা এ কথার কোন উত্তর দিলনা, কহিল, আজ আমার সময় নেই,—নমস্কার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। গাড়ীতে বসিয়া হঠাৎ সে উপরের দিকে চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া ঊষা সোমেনকে লইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৪

সাত দিনের ছুটি, কিন্তু প্রায় সপ্তাহ-দুই এলাহাবাদে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা শৈলেশ্বর আসিয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের নীচের বারান্দায় বসিয়া সোমেন্দ্র কতকগুলা কাঠি, রঙ-বেরঙের কাগজ, আঠা, দড়ি ইত্যাদি লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল, পিতার আগমন প্রথমে সে লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু দেখিবামাত্রই সম্বর্দ্ধনা করিল, এবং লজ্জিত আড়ষ্ট ভাবে পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। গুরুজনদিগকে প্রণাম করার ব্যাপারে এখনো সে পটুত্ব লাভ করে নাই, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল। খুব মন্দ না লাগিলেও শৈলেশ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ঐ কাগজ-কাঠি-আঠা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পড়াতেই বলিয়া উঠিলেন, ও সব তোমার কি হচ্চে সোমেন?

সোমেন রহস্যটা এক কথায় ফাঁস করিলনা, বলিল, তুমি বল ত বাবা ও কি?

বাবা বলিলেন, আমি কি ক'রে জানব?

ছেলে হাততালি দিয়া মহা আনন্দে কহিল, আকাশ-প্রদীপ!

আকাশ-প্রদীপ! আকাশ-প্রদীপ কি হবে?

ইহার অদ্ভুত বিবরণ সোমেন আজ সকালে শিখিয়াছে, কহিল, আজ সংক্রান্তি, কাল সন্ধ্যাবেলা উই উঁচুতে বাঁশ বেঁধে টাঙাতে হবে বাবা। মা বলেন, আমার ঠাকুদ্দাদারা যাঁরা স্বর্গে আছেন তাঁদের আলো দেখাতে হয়। তাঁরা আশীর্ব্বাদ করেন।

শৈলেশের মেজাজ গরম হইয়াই ছিল, টা[illegible] মারিয়া পা দিয়া সমস্ত ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিলেন আশীর্ব্বাদ করেন! যত সমস্ত কুসংস্কার—যা' পড়[illegible] যা' বলচি।

তাহার এত সাধের আকাশ-প্রদীপ ছ[illegible] পড়ায় সোমেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল। উপ[illegible] হইতে অত্যন্ত-স্নিগ্ধ কণ্ঠের ডাক আসিল, যা[illegible] সোমেন, কাল বাজার থেকে আমি আরও [illegible] একটা আকাশ-প্রদীপ তোমাকে কিনে আনিয়ে দে[illegible] তুমি আমার কাছে এস।

সোমেন চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে চলি[illegible] গেল। শৈলেশ কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করি[illegible] গম্ভীর বিরক্ত মুখে তাঁহার পড়িবার ঘরে গিয়া প্রবে[illegible] করিলেন। পরক্ষণেই ছোট্ট ঘন্টার শব্দ হইল— টুন্ টুন্ টুন্! কেহ সাড়া দিল না।

আবদুল?

আবদুল আসিল না।

গিরধারী? গিরধারী?

গিরধারীর পরিবর্ত্তে বাঙালী চাকর গোকুল [illegible] পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, আজ্ঞে—

শৈলেশ ভয়ানক ধমক দিয়া উঠিলেন, আবে ব্যাটারা মরেচিস্?

গোকুল বলিল, আজ্ঞে না।

আজ্ঞে না? আবদুল কই?

গোকুল কহিল, মা তাকে ছুটি দিয়েছেন, বাড়ী গেছে।

ছুটি নিয়েছেন ! বাড়ী গেছে ! গিরধারী কোথা গেল ?

গোকুল জানাইল, সেও ছুটি পাইয়া দেশে চলিয়া গেছে। শৈলেশ শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, বাড়ীতে কি লোকজন কেউ আর নেই নাকি ?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে, আর সবাই আছে।

তাই যা আছে কেন ? যা দূর হ—

শৈলেশ নিজেই তখন জুতা খুলিল, কোট খুলিয়া টেবিলের উপরেই জড় করিয়া রাখিল; আলমারি হইতে কাপড় লইয়া ট্রাউজার খুলিয়া দূরের একটা চেয়ার লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া ফেলিতে সেটা নীচে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল; নেকটাই, কলার প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিয়া নিজের চৌকিতে গিয়া বসিতেই ঠিক সম্মুখেই টেবিলের উপরে ছোট্ট একটি খাতা তাহার চোখে পড়িল,—মলাটে লেখা, সংসার খরচের হিসাব। খুলিয়া দেখিল মেয়েলি অক্ষরের বাংলায় স্পষ্ট লেখা। দৈনিক খরচের অঙ্ক,—দুধ এত, শাক এত, চাল এত, ডাল এত,—হঠাৎ দ্বারের পর্দা সরানোর শব্দে চকিত হইয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে। সে লোক দাসী নয়, তাহা চোখের পলকে অনুভব করিয়া শৈলেশ হিসাবের খাতার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। যে আসিল সে তাহার চেয়ারের কাছে দাঁড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি কি এতবেলায় আবার চা খাবে নাকি। কিন্তু তা হ'লে আর ভাত খেতে পারবে না।

ভাত খাবোনা।

না খাও, হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে চল। অবেলায় স্নান ক'রে আর কাজ নেই, কিন্তু জলখাবার ঠিক হয় আমি কুমুদাকে সরবৎ তৈরি করতে বলে এসেচি। চল।

এখন থাক।

ওগো আমি ঊষা,—বাঘ-ভালুক নই। আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে কেউ তোমাকে ছি ছি করবেনা।

শৈলেশ কহিল, আমি কি বলেচি তুমি বাঘ-ভালুক ?

তবে অমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছো কেন ?

আমার কাজ ছিল। তুমি বিভার সঙ্গে ঝগড়া করলে কেন ?

ঊষা কহিল, ও তোমার বানানো কথা, তোমাকে কেউ বলেনি, দেখেনি আমি ঝগড়া করেচি।

শৈলেশ কহিল, তুমি আবদুলকে তাড়িয়েচ কেন ?

কে বলেচে তাড়িয়েছি ? সে এক বছরের মাইনে পায়নি, সে যাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিল আমি তাকে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে ছুটি দিয়েচি।

শৈলেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, সমস্ত চুকিয়ে দিয়েছ ? তাহ'লে সে আর আসবে না। গিরধারী গেল কেন ?

ঊষা কহিল, এ তো তোমার ভারি অন্যায় চাকরবাকরদের মাইনে না দিয়ে আটকে রাখা—কেন, তাদের কি বাড়ী-ঘর-দোর নেই না কি ? আমি তাকে মাইনে দিয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

শৈলেশ কহিল, বেশ করেচ। এইবার বাড়ীটাকে মুনির আশ্রম বানিয়ে তুলো। সে হিসাবের পাতার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াই কথা কহিতেছিল, হঠাৎ একটা বড় অঙ্ক তাহার চোখে পড়িতেই চমকিয়া কহিল, এটা কি ? চারশ ছ'টাকা—

ঊষা উত্তর দিল, ও টাকাটা মুদির দোকানে দিয়েছি। এখনো বোধ করি শ'দুই আন্দাজ বাকি রইল, বলেচি আসচে মাসে দিয়ে দেব।

শৈলেশ অবাক্ হইয়া বলিল, ছ'শ টাকা মুদির দোকানে বাকি ?

ঊষা হাসিয়া কহিল, হবেনা ? কখনো দেবেও করবেনা, কখনো হিসেব দেখ্‌তে চাইবেনা,—কাজেই ছ'বচ্ছর ধরে এই টাকাটা জমিয়ে তুলেচ।

শৈলেশ এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, তুমি কি এই দু'বৎসরের হিসেব দেখলে নাকি ?

ঊষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নইলে আর উপায় ছিল কি ?

শৈলেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপরে যে লজ্জার ছায়া পড়িয়াছে, এ...কে এ পাঁচ মিনিটের পরিচয়েও ঊষার চিনিতে বাকি রহিল না, জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাব্‌চো বল ত ?

শৈলেশ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাবছি টাকা যা ছিল, সব তো খরচ করে ফেলুলে, কিন্তু মাইনে পেতে যে এখনো পনর-ষোল দিন বাকি ?

ঊষা মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কি ছেলে-মানুষ যে, সে হিসেব আমার নেই ? পনর দিন কেন এক মাসের আগেও আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসবনা। কিন্তু কি কাণ্ড ক'রে রেখেছ বল ত ? গোয়ালা বলছিল তার প্রায় দেড়শ টাকা পাওনা, ধোপা পাবে পঞ্চাশ টাকার ওপর, আর দর্জির দোকানে যে কত পড়ে আছে, সে শুধু তারাই জানে। আমি হিসেব পাঠাতে বলে পাঠিয়েছি।

শৈলেশ অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিল, করেচ কি? তারা হয়ত হাজার টাকাই পাওনা বলবে কি, কি,— দেবে কোথা থেকে?

ঊষা নিশ্চিন্তমুখে কহিল, একেবারেই দিতে পারবো তা তো বলিনি, আমি তিন-চার মাসে শোধ কোরব। আর কারও কাছে ত কিছু ধার করে রাখোনি? আমাকে লুকিয়োনা।

শৈলেশ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, গত বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমলা যেতে একজনের কাছে হ্যাণ্ড-নোটে দু'হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম, একটা টাকা সুদ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি।

ঊষা গালে হাত দিয়া বলিল, অবাক কাণ্ড! কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমিও দেখছি এক বছরের আগে আর আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেবেনা। কিন্তু আর কিছু নেই ত?

শৈলেশ বলিল, বোধ হয় না। সামান্য কিছু থাকতেও পারে, কিন্তু আমিত ভেবেছি এ জন্মে ও আর শোধ দিতে পারবনা।

ঊষা কহিল, তুমি কি সত্যিই কখনো ভাবো?

শৈলেশ বলিল, ভাবিনে? কতদিন অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যেন দম আটকে এসেচে। মাইনেতে কুলোয় না, প্রতি মাসেই টানাটানি হয়, কিন্তু আমাকে তুমি ভুলিয়োনা। যথার্থই কি আশা কর শোধ করতে পারবে?

ঊষার চোখের কোণ সহসা সজল হইয়া আসিল। যে স্বামীকে সে মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেও চিনিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয়না, তাহারই জন্য হৃদয়ে সত্যকার বেদনা অনুভব করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, তুমি বেশ মানুষ ত! সংসার করতে ধার হয়েছে, শোধ দিতে হবেনা? কিন্তু এই ক'টা টাকা দিয়ে ফেলতে আমার ক'দিন লাগবে!

সকলের বড় কষ্ট হবে—

ঊষা জোর দিয়া বলিল, কারও না। তোমরা হয়ত টেরও পাবেনা কোথাও কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে।

শৈলেশ স্থিরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল অনেক দিনের মেঘলা আকাশের কোন্ একটা ধার দিয়ে যেন তাহার গায়ে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

৩

খাম ও পোষ্টকার্ডে বিস্তর চিঠি-পত্র' জমা হইয়াছিল, সেই সমস্ত পড়িয়া জবাব দিতে, সাময়িক কাগজগুলি একে একে খুলিয়া চোখ বুলাইয়া লইতে, আরও এম্‌নি সব ছোট-খাটো কাজ শেষ করিতে শৈলেশের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার কর্ম্মনিরত, একাগ্র মুখের চেহারা বাহির হইতে পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিলে, এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও একান্ত মনঃসংযোগের প্রতি আনাড়ি লোকের মনের অসাধারণ শ্রদ্ধা জন্মাইবারই কথা। অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এতবড় হানি করা এই গল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে অধ্যাপক বলিয়াই যে সংসারে ছলনা করার কারো হঠাৎ কেহ তাঁহাদিগকে হটাইয়া দিবে এ আশা দুরাশা। হাতের কাজ সমাপ্ত করিয়া শৈলেশ্বর নিজেই সুইচ টিপিয়া লইয়া আলো জ্বালাইয়া মস্ত মোটা একটা দর্শনের বই লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। যেন তাঁহার নষ্ট করিবার মুহূর্ত্তের অবসর নাই, অথচ সন্ধ্যার পরে এরূপ কুকর্ম্ম করিতে পূর্ব্বে তাঁহাকে কোন দিন দেখা যাইত না।

এইরূপে যখন তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন, বাহিরে পর্দ্দার আড়াল হইতে কুমুদা ডাকিয়া কহিল, বাবু, মা বলে দিলেন আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে, আসুন।

শৈলেশ্বর ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এ তো আমার খাবার সময় নয়। এখনো পঁচিশ পঞ্চাশ মিনিট দেরি।

কুমুদা জিজ্ঞাসা করিল, তাহ'লে তুলে রাখতে বলে দেব?

শৈলেশ্বর কহিলেন, তুলে রাখাই উচিত। আমার না থাকাতেই এই সময়ের গোলযোগ ঘটেছে।

দাসী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত তোলা তুলি করাও হাঙ্গামা, আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্ছি।

আজ খাবার-ঘরে টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত না, উপরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার শোবার ঘরের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় আসন পাতিয়া অত্যন্ত স্বদেশী প্রথায় স্বদেশী আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, সাবেক দিনের রেকাবি গেলাশ বাটি প্রভৃতি মাজা ঘষা হইয়া বাহির হইয়াছে,—থালার তিন দিক ঘেরিয়া এই সকল পাত্রে নানাবিধ আহার্য্য থরে থরে সজ্জিত। অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ঊষা, এবং তাঁহাকে ঘেঁষিয়া বসিয়াছে সোমেন।

শৈলেশ আসনে বসিয়া কহিলেন, তোমাকে সঙ্গে খেতে নেই আমি জানি, কিন্তু সোমেন তাকেও খেতে নেই নাকি?

ইহার উত্তর ছেলেই দিল, কহিল, আমি মা'র সঙ্গে খাই বাবা।

শৈলেশ আয়োজনের প্রাচুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এত সব রাঁধলে কে? তুমি নাকি?

উষা কহিল, হাঁ।

শৈলেশ কহিলেন, বামুনটাও নেই বোধ হয়। যতদূর মনে আছে তার মাইনে বাকি ছিলনা,—তাকে কি তা'হলে এক বছরের আগাম দিয়েই বিদেয় করলে?

উষা মুখের হাসি গোপন করিয়া কহিল, দরকার হ'লে আগাম মাইনেও চাকরদের দিতে হয়, কেবল বাকি রাখলেই চলে না। কিন্তু সে আছে, তাকে ডেকে দেব নাকি?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না না, থাক্। তাকে দেখ্বার জন্যে আমি ঠিক উতলা হয়ে উঠিনি, তাকেও মাঝে মাঝে রাঁধতে দিও, নইলে যা কিছু শিখেছিল ভুলে গেলে বেচারার ক্ষতি হবে।

আহার করিতে বসিয়া শৈলেশের কত যে ভাল লাগিল তা সেই জানে। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন হঠাৎ সেই দিনের কথা তাহার মনে পড়িল। পাশের বাটিটা টানিয়া লইয়া কহিলেন, দিব্যি গন্ধ বেরিয়েচে। [illegible] মাংস খায়না, তারা কাঁটালের তরকারিতে [illegible] মশলা দিয়ে গাছ-পাঁটা বলে খায়। আমার [illegible]টি ঠিক অতখানি উচ্চ জাতীয় নয়। তাই পাঁটার বদলে আমার সইবে, কিন্তু গাছ-পাঁটা হবে না।

উষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন হাসির হেতু বুঝিল না, কিন্তু সে মায়ের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গাছ-পাঁটা কি মা?

প্রত্যুত্তরে উষা ছেলেকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীকে শুধু কহিল, আগে খেয়েই দেখ।

শৈলেশ একটুকরা মাংস মুখে পুরিয়া দিয়া কহিলেন, না, চার-পেয়ে পাঁটাই বটে। চমৎকার হয়েছে, কিন্তু এ রান্না তুমি শিখলে কি করে?

উষার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, রান্না কি শুধু তোমার আবদুলই জানে? আমার বাবা ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের সেরেস্তাদার, তুমি কি ভেবেচ আমি গোঁসাই-বাড়ী থেকে আসচি।

শৈলেশ কহিলেন, এই এক বাটি খাবার পরে সে কথা মুখে আনে কার সাধ্য। কিন্তু আমার ত সিদ্ধে-[illegible]ী নেই এ কি প্রতিদিন জুটবে?

উষা বলিল, কিসের অভাবে জুটবে না শুনি?

শৈলেশ কহিলেন, আবদুলের শোক ত আমি আজই তোল্বার যো করেচি, সেবা—

উষা রাগ করিয়া বলিল, আমি কি তোমাকে বলেচি যে, স্বামি-পুত্রকে খেতে দিয়ে আমি সেবা শোধ করব? সেবার কথা আর তুমি মুখেও আন্তে পাবে না বলে দিচ্ছি।

শৈলেশ কহিলেন, তোমাকে বলে দিতে হবেনা। সেবার কথা মুখে আনা আমার স্বভাবই নয়। কিন্তু—

উষা বলিল, এতে কোন কিন্তু নেই। খাবার জন্যে ত সেবা হয় নি।

কিসের জন্য যে হ'ল কিছুই ত জানিনে উষা—

উষা জবাব দিল, তোমার জেনেও কোন দিন কাজ নেই। দয়া ক'রে এইটি শুধু কোরো পাগল বলে আবার যেন নির্ব্বাসনে পাঠিয়োনা।

শৈলেশ নিঃশব্দে নতমুখে আহার করিতে লাগিলেন। সোমেন কহিল, খাবে চলনা মা। কাল-কের সেই জটাই পক্ষীর গল্পটা কিন্তু আজ শেষ করতে হবে। জটাইয়ের ছেলে তখন কি করলে মা?

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিলেন, জটাইয়ের ছেলে যাই করুক, এ ছেলেটি ত দেখ্চি তোমাকে একেবারে পেয়ে বসেচে।

উষা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিলেন, এর কারণ কি জান?

উষা কহিল, কারণ আর কি। মা নেই, ছেলে-মানুষ একলা বাড়ীতে—

তা' বটে, কিন্তু মা থাকতেও এত আদর বোধ হয় ও কখনো পায় নি।

উষার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার এক কথা। আর একটু মাংস আন্তে বলে দি। আচ্ছা, না খাও,—আমার মাথা খাও, মেঠাই গু[illegible] ফেলে উঠোনা কিন্তু। সমস্ত দিন পরে খেতে বসেচ এ কথা একটু হিসেব কর।

শৈলেশ হাঁ করিয়া উষার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। খাবার জন্য এই পীড়াপীড়ি, এমনি করিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুল মাথার দিব্য দেওয়া—যেন বহুকালের পরে ছেলেবেলায় শোনা গানের একটা শেষ চরণের মত তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে নিজেও তাহার মায়ের একছেলে,—অকস্মাৎ সেই কথা স্মরণ করিয়া বুকের মধ্যে যেন তাহার ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিল। মেঠাই ফেলিয়া উঠিবার তাহার শক্তিই রহিল না। ভাঙিয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, কোন দিকের কোন হিসেবই

... আমি কোরবনা উষা, এ ভারটা তোমাকে একেবারে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

৬

একটা সপ্তাহ যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া আবার রবিবার ফিরিয়া আসিল, শৈলেশ ঠাহর পাইল না। সকালে উঠিয়াই উষা কহিল, তোমাকে রোজ বলুচি কথা শুনচোনা—যাও আজ ঠাকুরঝির ওখানে। সে কি মনে করচে বল ত? তুমি কি আমার সঙ্গে তার সত্যি সত্যিই ঝগড়া করিয়ে দেবে না কি।

শৈলেশ মনে মনে অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিলেন, কলেজের যে রকম কাজ পড়েচে—

উষা বলিল, তা' আমি জানি। কলেজ থেকে ফেরবার মুখেও তাই একবার গিয়ে উঠতে পারলেনা।

কিন্তু কি রকম শ্রান্ত হয়ে ফিরতে হয়, সে তো জানো না? তোমাকে ত আর ছেলে পড়াতে হয়না।

উষা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবার যাও। রবিবারেও ছেলে পড়ানোর ছল করলে বিভা জন্মে আর আমার মুখ দেখবেনা। এই বলিয়া সে সহিসকে ডাকাইয়া আনিয়া গাড়ী তৈরি করিবার হুকুম দিয়া কহিল, বাবুকে শ্যামবাজারে পৌঁছে দিয়েই তোরা ফিরে আসিস। গাড়ীতে আমার কাজ আছে।

যাইবার সময় শৈলেশ ছেলেকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে, সে বিমাতার গায়ে ঠেস দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিসিমার কাছে যাইতে সে কোন দিনই উৎসাহ বোধ করিতনা, বিশেষতঃ, সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ভয়ের অবধি রহিল না। উষা ক্রোড়ের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া সহাস্যে বলিল, সোমেন থাক্, ও না-হয় আর এক দিন যাবে।

শৈলেশ কহিলেন, বিভার ওখানে ও যে যেতে চায়না, সে দেখচি তুমি টের পেয়েছ।

তোমাকে দেখেই কতকটা আন্দাজ করচি, এই বলিয়া সে হাসিমুখে ছেলেকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

আনাহার সারিয়া শ্যামবাজার হইতে বাড়ী ফিরিতে শৈলেশের বেলা প্রায় আড়াইটা হইয়া গেল। বিভা, ভগিনীপতি ক্ষেত্রমোহন এবং তাঁহার সতেরো-আঠারো বছরের একটি অনূঢ়া ভগিনীও সঙ্গে আসিলেন। বিভাকে সঙ্গে আনিবার ইচ্ছা শৈলেশের ছিলনা। সে নিজেই ইচ্ছা করিয়াই আসিল। উষার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ বহুবিধ। কেবলমাত্র দাদাকেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনাইয়া তাহার কিছুমাত্র তৃপ্তিবোধ হয় নাই; এখানে উপস্থিত হইয়া একগুষ্টি লোকের সমক্ষে নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ফেলিয়া পল্লী-গ্রামের কুশিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূকে সে একেবারে অপদস্থ করিয়া দিবে এই ছিল তাহার অভিসন্ধি। দাদার সহিত আজ দেখা হওয়া পর্য্যন্তই সে অনেক অপ্রিয় কঠিন অনুযোগের সহিত এই কথাটাই বারবার সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, এতকাল পরে এই স্ত্রীলোকটিকে আবার ঘরে ডাকিয়া আনায় শুধু যে মারাত্মক ভুল হইয়াছে, তাহাই নয়, তাহাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতিও প্রকারান্তরে অবমাননা করা হইয়াছে। তিনি যাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা কিসের জন্য? সমাজের কাছে বন্ধুবান্ধবের কাছে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচিত করা যাইবেনা, কোথাও কোন সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া যাহাকে চলিবেনা, এমন কি বড় ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিতেই যাহাকে লজ্জাবোধ হইবে, তাহাকে লইয়া ... কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

অপরিচিত উষার পক্ষ লইয়া ক্ষেত্রমোহন দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই স্ত্রীর কাছে ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। বিভা রাগ করিয়া বলিল, দাদা মনে করেন আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু আমি সব খবর রাখি। বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে এতকালের খানসামা আবদুলকে তাড়ালেন মুসলমান বলে, গিরধারীকে দূর করলেন ছোট জাত বলে।—এমন যাঁর জাতের বিচার তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই ত আমাদের দায়। আমি ত এমন বউকে একটা দিনও স্বীকার করতে পারবনা, তা' যিনিই যেমন যত রাগ করুন।

এ কটাক্ষ যে কাহাকে হইল, তাহা সকলেই বুঝিলেন। শৈলেশ আস্তে আস্তে বলিতে গেল যে, ঠিক সে কারণে নয়, তাহারা নিজেরাই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই কথায় বিভা দাদার মুখের উপরেই জবাব দিল যে, বউদিদির আমলে তাহাদের এতখানি ব্যগ্রতা দেখা যায় নাই, কেবল ইনি ঘরে পা দিতে না দিতেই তাহারা পালাইয়া বাঁচিল।

এই শ্লেষের আর উত্তর কি? শৈলেশ মৌন হইয়া রহিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, চাকর-বাকর ত সব পালিয়েছে, তোমার এখন চলে কি করে?

শৈলেশ নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, এমনি একরকম যাচ্ছে চলে।

বিভা কহিল, যারা গেছে তারা আর আসবে না, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু বাড়ী ত একেবারে হটচাপা বাড়ী করে রাখলে চলবে না, সমাজ আছে। লোকজন আবার দেখে-শুনে রাখো,—মানুষে বলবে কি?

শৈলেশ কহিলেন, না চললে রাখতে হবে বই কি!

বিভা বলিল, কি ক'রে যে চলচে সে তোমরাই জানো আমরা ত ভেবে পাইনে। এই বলিয়া সে কাপড় ছাড়িবার জন্য উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দাদার বাড়ী না গিয়েও পারিনে, কিন্তু গেলে বোধ করি এক পেয়ালা চাও জুটবেনা।

ক্ষেত্রমোহন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই ছিলেন, ভাই-বোনের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে কথা কহিতে চাহেন নাই, কিন্তু আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, আগে গিয়েই ত দেখ, চা যদি না পাও, তখন না হয় বোলো।

বিভা কহিল, আমার দেখাই আছে। প্রথম দিনের ভাব দেখেই আমি বুঝে এসেছি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার অনুযোগ যে একেবারেই সত্য নয়, বস্তুতঃ, সেদিন কিছুই দেখিয়া আসিবার মত তাহার সময় বা মনের অবস্থা কোনটাই ছিলনা তাহা উভয়ের কেহই জানিতেননা,

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাস্তবিক শৈলেশ ব্যাপার কি বল দেখি? চাকর-বাকর সমস্ত বিদায় ক'রে দিয়ে কি বোষ্টম-বৈরাগী হয়ে থাকবে না কি? আজকাল খাচ্ছো কি?

শৈলেশ কহিলেন, ডাল ভাত লুচি তরকারি—

গলা দিয়ে গলচে ওগুলো?

অন্ততঃ গলায় বাধ্ চেনা এ কথা ঠিক।

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, ঠিক তা' আমিও জানি। এবং আমারও যে সত্যি সত্যিই বাধে তা'ও জানি—কিন্তু মজা এমনি যে সে কথা নিজেদের মধ্যে স্বীকার করবার যো নেই। তুমি কি এমনিই বরাবর চালিয়ে যাবে স্থির করেচ না কি?

শৈলেশ অল্পকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, দেখ ভায়া, যথার্থ কথা বলতে কি স্থির আমি নিজে কিছুই করিনি, করবার ভারও আমার 'পরে তিনি দেননি। শুধু এইটুকু স্থির করে রেখেছি যে তাঁর অমতে তাঁর সাংসারিক ব্যবস্থায় আর আমি হাত দিচ্চিনে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাকবেনা, তা বলে দিচ্চি!

শৈলেশ কহিলেন, ও দিকে যদি রক্ষা নাও থাকে, অন্য দিকে এটুকু রক্ষা বোধ হয় পেয়েচি যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবেনা। বল কি হে, অহর্নিশি কেবল টাকার ভাবনা, মাসের পোনর দিন পার হলেই মনে হয় বাকি পোনরটা দিন পার হব কি করে,—সে পথে আর পা বাড়াচ্ছিনে। আমি বেঁচে গেছি ভাই,—টাকা ধার করতে আর যেতে হবেনা। যে ক'টা টাকা মাইনে পাই, সেই আমার যথেষ্ট,—এ সুখবরটা এঁর কাছে আমি পেয়ে গেছি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল কি হে? কিন্তু টাকার দুর্ভাবনা কি একা তোমারই ছিল না কি? আমি যে একেবারে কণ্ঠায়-কণ্ঠায় হয়ে উঠেচি, সে খবর তো রাখোনা!

শৈলেশ বলিতে লাগিলেন, এলাহাবাদে পালাবার সময় পূরো একটি মাসের মাইনে আলমারিতে রেখে যাই। বলে যাই একটি মাস পূরো চলা চাই। আগে ত কোন কালেই চলেনি, সোমেনের মা বেঁচে থাকতেও না, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার নিজের হাতেও না। ভেবেছিলাম এঁর হাত দিয়ে যদি ভয় দেখিয়ে চালাতে পারি ত তাই যথেষ্ট। যাদের তাড়ানো নিয়ে বিভা রাগ করছিলেন, তাদের মুসলমান এবং ছোট-জাত বলেই বাস্তবিক তাড়ানো হয়েছে কি না আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু এটা জানি যাবার সময়ে তারা এক বছরের বাকি মাইনে নিয়ে খুব সম্ভব খুসি হয়েই দেশে গেছে। মুদির দোকানে চারশ' টাকা দেওয়া হয়েছে, আরও ছোট-খাটো কি কি সব সাবেক দেনা শোধ করে ছোট্ট একখানি খাতায় সমস্ত কড়ায়-গণ্ডায় লেখা,—ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম এ তুমি কি কাণ্ড করে বসে আছো, ঊষা, অর্দ্ধেক মাস যে এখনো বাকি,—চলবে কি করে? জবাবে বললেন, আমি ছেলেমানুষ নই, সে জ্ঞান আমার আছে। খাবার কষ্ট ত আজও তাঁর হাতে একদিন পাইনি ক্ষেত্র, কিন্তু ডাল-ভাতই আমার অমৃত,—আমার দর্জ্জি ও কাপড়ের বিল এবং হ্যাণ্ডনোটের দেনাটা শোধ হয়ে যাক্ ভাই, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ক্ষেত্রমোহন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মোটর প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনজনেই উঠিয়া

...রবি চল্ বোন্, এমন করে চলে গেলে আমার কষ্টের সীমা থাকবেনা।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। সোমেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কি না জানি কিন্তু অকলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথা... বসতে চাইনে দাদা, কিন্তু, সোমে... শৈলেশ্বরের মর-বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার... রেখো। ...এবেশ করিয়া প্রথমেই ...মিলিল সোমেনের। সে কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া চৌকাটে বসিয়া তাহার রেল-গাড়ীর চাকা মেরামত করিতেছিল— তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া হঠাৎ কাহারও মুখে আর কথা রহিলনা। তাহার কপালে, গালে, দাড়িতে, বুকে, বাহুতে,—অর্থাৎ দেহের সমস্ত উপরার্দ্ধটাই প্রায় চিত্র-বিচিত্র করা। গঙ্গার ঘাটের উড়ে পাণ্ডা শাদা, রাঙা, হলুদ রঙ দিয়া নিজের দেশের জগন্নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমের রাম সীতা পর্য্যন্ত সর্ব্ব-প্রকার দেব-দেবীর অসংখ্য নাম ছাপিয়া দিয়াছে।

বিভা শুধু একটু মুচ্কিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ ...য়েছে বাবা, বেঁচে থাকো!

...শের এই দু'জনের কাছে যেন মাথা কাটা ...ল। স্বভাবতঃ, সে মৃদু-প্রকৃতির লোক, যে-কোন ...ই হোক্ হৈ-চৈ হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে সে পারিতনা, কিন্তু ভগিনীর এই অত্যন্ত কটু উত্তেজনা হঠাৎ তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল। ছেলের গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, হতভাগা পাজি! কোথা থেকে এই সমস্ত ক'রে এলি? কোথা গিয়েছিলি?

সোমেন কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, আজ সকালে সে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। শৈলেশ তাহার গলায় একটা ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্‌গে যা বল্‌চি!

তিন জনে আসিয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাই-বোন উভয়ের মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর, মিনিট-খানেক কেহই কোন কথা কহিলনা, শৈলেশের লজ্জিত বিরস মুখে ইহাই প্রকাশ পাইল যে এতটা বাড়াবাড়ি সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু বিভা কথা না কহিয়াও যেন সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, এসব তার জানা কথা। এইরূপ হইতেই বাধ্য!

কথা কহিলেন ক্ষেত্রমোহন। তিনি হঠাৎ একটু খানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, শৈলেশ, তুমি যে ...ঘটনা নয়; আজিকার ঘটনা সম্বন্ধ... জিজ্ঞাসা করিলেন ...তুফান তুলে ফেল্‌লে ...তাকে মারলে কি বলে!—তোমাদের সঙ্গে চলা-ফেরা করাই দায়।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিভা বিস্ময়ে যেন হত... হইয়া গেল, মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, চা... পেয়ালায় তুফান কি রকম? তুমি কি এটাকে ... খেলা মনে করলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, অন্ততঃ, ভয়ানক ... একটা যে মনে হচ্চেনা তা অস্বীকার করতে পারি...

তার মানে?

মানে খুব সহজ! আজ নিশ্চয় কি একটা গ... স্নানের যোগ আছে, সোমেন সঙ্গে গেছে, সঙ্গে ... স্নান করেছে। একটা দিন কলের জলে না ... দৈবাৎ কেউ যদি গঙ্গায় স্নান করেই থাকে ত... মহাপাপ হ'তে পারে আমি ত ভেবে পাইনে।

বিভা স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহি... তার পরে?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিলেন, তার পরের ব্যাপা... খুব স্বাভাবিক। ঘাটে বিস্তর উড়ে পাণ্ডা আ... হয়ত কেউ দু'টো একটা পয়সার আশায় ... মানুষের গায়ে চন্দনের ছাপ মেরে দিয়েছে ... খুনোখুনি কাণ্ড করবার কি আছে!

বিভা তেমনি ক্রোধের স্বরে প্রশ্ন করিল, ... পরিণাম ভেবে দেখেচ?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বিকালবেলা মুখ-... ধোয়ার সময় আপনি মুছে যায়—এই পরিণাম।

বিভা কহিল, ওঃ—এই মাত্র। তোমার ছে... পুলে থাকলে তুমিও তা'হলে এই রকম করতে দিতে...

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমার ছেলে-পুলে য... নেই, তখন এ তর্ক বৃথা!

বিভা মনে মনে আহত হইয়া কহিল, তর্ক ... হ'তে পারে, চন্দনও ধুয়ে ফেললে উঠে যায় আ... জানি, কিন্তু এর দাগ হয়ত অত সহজে নাও উঠ... পারে। ছেলে-পুলের ভবিষ্যৎ জীবনের পানে চে... কাজ করতে হয়। আজকার কাজটা যে অন্যা... অন্যায় এ কথা আমি একশ' বার বোল্‌ব, ... তোমরা যাই বল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তোমরা নয়—... আমি! শৈলেশ ত চড় মেরে আর গলাধাক্কা দি... প্রায়শ্চিত্ত করলেন,—আমি কিন্তু এ আশা করি... যে অধ্যাপকবংশের মেয়ে এসে একদিনেই মেম-সাহে... হ'য়ে উঠবে। তা' সে যাই হোক, তোমরা দু'ভাই-বো... এর অকাল বিচার করতে থাকো, আমি উঠ্‌লুম।

… করিল, চাকর-বাকর ত সব

শৈলেশ চুপ … কি করে?

…হিয়া কহিল, কোথায় হে?

ক্ষেত্র কহিলেন, উপরে। ঠাকরুণের সঙ্গে পরি-চয়টা একবার সেরে আসি। কথা ক'ন কিনা একটু সাধ্য-সাধনা ক'রে দেখিগে। এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

উপরে উঠিয়া শোবার ঘরের দরজা হইতেই ডাক দিয়া কহিলেন, বৌ-ঠাকরুণ নমস্কার।

ঊষা মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াই মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোমেন কাছে বসিয়া বোধ করি মায়ের কাজ …ড়াইতেছিল, কহিল, পিসে-মশাই।

ঊষা অদূরে একটা চৌকি দেখাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বসুন। তাহার সম্মুখের গোটা-দুই …লমারির কপাট খোলা, মেঝের উপর অসংখ্য …কমের কাপড় জামা শাড়ী জ্যাকেট কোট পেণ্টুলান …মোজা টাই কলার—কত যে রাশীকৃত করা তাহার …ইয়ত্তা নাই, ক্ষেত্রমোহন আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, …পনার হচ্চে কি?

সোমেন স্তূপের মধ্যে হইতে একজোড়া মোজা …বাহির করিয়া কহিল, এই আর একজোড়া …রিয়েচে। এইটুকু শুধু ছেঁড়া,—চেয়ে দেখ মা?

ঊষা ছেলের হাত হইতে লইয়া একস্থানে গুছাইয়া রাখিল। তাহার রাখিবার শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া ক্ষেত্রমোহন একটু আশ্চর্য্য হইয়াই প্রশ্ন করিলেন এ …ই অনাথ-আশ্রমের ফর্দ তৈরি হচ্চে, না জঞ্জাল পরি-…ারের চেষ্টা হচ্চে? কি করচেন বলুন ত? তিনি …াবিয়া আসিয়াছিলেন, পল্লী অঞ্চলের নূতন বধূ …াহাকে দেখিয়া হয়ত লজ্জায় একেবারে অভিভূত …ইয়া পড়িবে, কিন্তু ঊষার আচরণে সেরূপ কিছু প্রকাশ পাইলনা। সে মুখ তুলিয়া চাহিলনা বটে, কিন্তু কথার জবাব সহজ কণ্ঠেই দিল, কহিল, এগুলো …ব সারতে পাঠাবো ভাবছি। কেবল মোজাই এত …জোড়া আছে যে বোধ করি দশ বচ্ছর আর না কিনলেও চলে যাবে।

ক্ষেত্রমোহন এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, …ঠাকরুণ, এখন কেউ নেই, এই সময়ে চট্ করে একটা কথা বলে রাখি। আপনার ননদটিকে দেখে তার স্বামীর স্বরূপটা যেন মনে মনে আন্দাজ করে রাখবেননা। বাইরে থেকে আমার সাজ-সজ্জা আর আচার-ব্যবহার দেখে আমাকে ফিরিঙ্গি ভাববেননা, আমি নিতান্তই বাঙালী। কেউ গলাবাজি করে

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাকবেনা, তা বলে দিচ্ছি!

…লেশ কহিলেন, এদিকে যদি রক্ষা নাও থাকে, আরও এক… …টু রক্ষা বোধ হয় পেয়েছি যে আমের …নের মারটা। … এ দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবেনা। …রার প্রতি কিন্তু… …শি কেবল টাকার জোর না, যাদের অপদার্থ ও মতি… … রাখি গোবরটা।

ঊষা এ কথারও কোন জবাব দিলনা, … দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, এখন আপনি বসুন। আমার জন্যে আপনার সময় না নষ্ট হয়। একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনার লক্ষ্মী-হাতের কাজ করা দেখে আমিও গৃহস্থালীর কাজকর্ম একটু শিখে নিই।

ঊষা মেঝের উপর বসিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, এ সব মেয়েদের কাজ আপনার শিখে লাভ কি?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এর জবাব আর একদিন আপনাকে দেব, আজ নয়।

ঊষা নীরবে হাতের কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু একটু পরেই কহিল, এ সব ত গরীব-দুঃখীদের কাজ, আপনাদের এ শিক্ষায় ত কোন প্রয়োজনই হবেনা।

ক্ষেত্রমোহন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া …নি, বৌঠাকরুণ, বাইরের চাকচিক্য দেখে যদি আপনারই … ভুল হয় ত, সংসারে আমাদের মত দুর্ভাগাদের ব… বোঝবার আর কেউ থাকবেনা। ইচ্ছে করে … ছোট বোনটিকে আপনার কাছে দিনকতক রেখে যাই। আপনার লক্ষ্মী-শ্রীর কতকটাও হয়ত সে তা'হলে শ্বশুর-বাড়ীতে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

ঊষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা অনেকগুলি জুতার শব্দ সিঁড়ির নীচে শুনিতে পাইয়া শুধু বলিলেন, এঁরা সব উপরেই আসচেন দেখ… শৈলেশের বোন এবং আমার বোনের বাইরের বেশভূষার সাদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরটাও এক রকম বলে স্থির করে নেবেননা।

ঊষা শুধু একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি বোধ হয় চিনতে পারবো।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বোধ হয়? নিশ্চয় পারবেন এও আমি নিশ্চয় জানি।

৮

সিঁড়িতে যাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়াছিল, তাহারা শৈলেশ, বিভা এবং বিভার ছোট ননদ ঊষা। শৈলেশ ও বিভা ঘরে প্রবেশ করিলেন,

—আবার চল্ বোন্, এমন করে চলে গেলে আমার কষ্টের সীমা থাক্‌বেনা।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। ...মোহনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কি না জানিনা, কিন্তু অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথাও গিয়ে আর বল্‌তে চাইনে দাদা, কিন্তু, শোবেন ... বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার ... কি? পায়ে কাঁটাও ফোটেনা, কেঁচটুও লাগবেনা।

বিভা কহিল, সে আমি জানি। কিন্তু হঠাৎ জুতো খোলার দরকার হ'ল কিসে তাই শুধু জিজ্ঞেসা করেচি।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুণ হিঁদু মানুষ,—তাছাড়া গুরুজনের ঘরের মধ্যে ওটা পায়ে দিয়ে না আসাই বোধ হয় ভাল।

বিভা স্বামীর পায়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল শুধু কেবল ভগিনীকে উপদেশ দেওয়াই নয়, নিজেও তিনি ইতিপূর্ব্বে তাহা পালন করিয়াছেন। দেখিয়া তাহার গা জলিয়া গেল, কহিল, গুরুজনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা তোমার অসাধারণ। সে ভালই, ... তার বাড়াবাড়িটা ভাল নয়। গুরুজনের শোবার ঘর না হ'য়ে ঠাকুরঘর হ'লে আজ ... তুমি একেবারে গোবর খেয়ে পবিত্র হয়ে ...

... রাগ দেখিয়া ক্ষেত্র হাসিতে লাগিলেন, ...লেন, গোবরের প্রতি রুচি নেই, ওটা ঠাকরুণের খাতিরেও মুখে তুল্‌তে পারতুম না, ... ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে যখন কোন সুবাদই ...খিনে, তখন অকারণ তাঁদের ঘরে ঢুকেও উৎপাত করতুম না। আচ্ছা, ঠাকরুণ, এ ঘরে ত আগেও ...কার এসেচি, মনে হচ্চে যেন একটা ভাল কার্পেট-...তা ছিল, সেটা তুলে দিলেন কেন?

ঊষা কহিল, ধোয়া-মোছা যায় না, বড় নোঙরা ...য়। শোবার ঘর—

বিভা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, কার্পেট-...তা থাক্‌লে ঘর নোঙ্‌রা হয়?

ঊষা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, হয় বই কি ভাই। চোখে দেখা যায় না সত্যি, কিন্তু নীচে তার ঢের ধুলো-বালি চাপা পড়ে থাকে।

বিভা বোধ করি ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীর প্রবল কণ্ঠে অকস্মাৎ তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, ব্যস্ ব্যস্, বৌঠাকরুণ, নোঙ্‌রা স্বভাব নয়; আজিকার ঘটনা সম্বন্ধে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলনা, এবং যাহা জানেনা তাহা জানিবার জন্যও কোন কৌতূহল প্রকাশ করি... ...থাকি। কি ... এই স্বভাবের ... ঠিক না?

শৈলেশ কথা কহিলনা। বিভার ক্রোধের অব... রহিল না; কিন্তু সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সে ত... না করিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সত্যকার স্নেহ ও প্রীতির হয়ত কো... অভাব ছিলনা, কিন্তু বাহিরে সাংসারিক আচর... বাদ-প্রতিবাদের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায়ই প্রকা... হইয়া পড়িত। লোকের সম্মুখে বিভা ক... কিছুতেই হার মানিতে পারিতনা, ইহা তাহা... স্বভাব। সেই হেতু প্রায়ই দেখা যাইত, এই বক্তা... পাছে কথায় কথায় বাড়াবাড়িতে গিয়া উপনীত হ... এই ভয়ে প্রায়ই ক্ষেত্রমোহন বিতণ্ডার মাঝখানে রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়িত। কিন্তু আজ তাহা সে ভাব নয় ইহা ক্ষণকালের জন্য অনুভব করি... বিভা আপনাকে সম্বরণ করিল।

বস্তুতঃই তাহার বিরুদ্ধে আজ ক্ষেত্রমোহনে... মনের মধ্যে এতটুকু প্রশ্রয়ের ভাব ছিলনা। পরে... দোষ ধরিয়া কটু কথা বলা বিভার এক প্রক... স্বভাবের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকা... ক্ষেত্রেই হয়ত ইহাতে অশিষ্টতা ভিন্ন আর কো... ক্ষতিই হইতনা; কিন্তু এই যে নিরপরাধ বধূ... বিরুদ্ধে প্রথম দিন হইতেই সে একেবারে কো... বাঁধিয়া লাগিয়াছে, বিনা দোষে অশেষ দুঃখ-ভোগে... পর যে স্ত্রী স্বামীর গৃহকোণে দৈবাৎ স্থান পা... করিয়াছে, তাহার সেইটুকু স্থান হইতে তাহাকে ... করিবার দুরভিসন্ধি আর একজন স্বামীর চিত্ত ... ও বিরক্তিতে পূর্ণ করিয়া আনিতেছিল। অথ... ইহারই পদধূলির যোগ্যতাও অপরের নাই এই স... চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিয়া ক্ষেত্রমোহনের ভি... ব্যথিত চিত্তে বিভার বিরুদ্ধে আর কোন ক... রহিলনা। অথচ এই কথা প্রকাশ করিয়া বলা এই উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তেমনি সুকঠিন। য... যেমন করিয়া হোক্ সভ্যতার আবরণে ঢাকি... ইহাকে, গোপন করিতেই হইবে।

ক্ষেত্রমোহন ভগিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহি... উমা, তোমার এই পল্লীগ্রামের বৌদিদির কাছে এ... যদি রোজ দুপুর বেলা বস্‌তে পারো, যে-কো... সংসারেই পড়না কেন দিদি, দুঃখ পাবেনা তা ব... রাখচি।

উমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। ঊষা মুখ...

... কারণ, চাকর-বাকর ত সব
শৈলেশ চুপ ... করে?
... কোথায় হে?

ক্ষেত্রমোহন ... সঙ্গে পরিচয়। স্বামি-স্ত্রীতে যে পরম সুখে থাকবে তা ... রেখে বলতে পারি।

শৈলেশ বিভার প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া ঠাট্টা করিয়া কহিল, বাজি রাখতে আর হবেনা ভাই, এই বলাতেই যথেষ্ট হবে।

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিয়া বলিল, আর যাই হোক আজকের কাজটুকুও যদি মনে রাখতে পারে ত নিরর্থক নিত্য নূতন মোজা কেনার দায় থেকেও অন্ততঃ ওর স্বামী বেচারা অব্যাহতি পাবে!

বিভা সেই অবধি চুপ করিয়াই ছিল, কিন্তু আর পারিলনা। কিন্তু গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন গোপন করিয়া একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, ওর ...বিষ্ণুৎ সংসারে হয়ত মোজায় তালি দেবার প্রয়োজন ...ও হ'তে পারে। দিলেও হয়ত ওর স্বামী ...তে চাইবেননা। আগে থেকে বলা কিছুই ...না।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, যায় বই কি। চোখ-কান ...লা থাকলেই বলা যায়। যে সত্যিকার জাহাজ ...য়, সে জলের চেহারা দেখলেই টের পায় তলা ...ফুরে। বৌঠাকরুণ, জাহাজে পা দিয়েই যে ধরে ...ছিলেন একটু অসাবধানেই তলার পাঁক ঘুলিয়ে ...বে, এতেই আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ দিই। আর ...লেশের পক্ষ থেকে ত লক্ষকোটি ধন্যবাদেও পর্য্যাপ্ত ...য় নয়।

উষা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে বলিল, নিজের ... নিজের স্বামীর অবস্থা বোঝবার চেষ্টা করার ...ধন্যবাদের ত কিছুই নেই ক্ষেত্রমোহনবাবু।

এ কথার জবাব দিল বিভা। সে কহিল, অন্ততঃ ...র স্ত্রীকে অপমান করবার কাজটা হয় ত সিদ্ধ ...। তা' ছাড়া কাউকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেখলেই ... হয় কারুর ভক্তি-শ্রদ্ধা উথ্‌লে উঠে।

উষা মুখ তুলিয়া চাহিয়া প্রশ্ন করিল, স্বামীর ...া বুঝে ব্যবস্থা করার চেষ্টাকে কি উঞ্ছবৃত্তি বলে ...বঝি?

ক্ষেত্রমোহন তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, না, বলে ... পৃথিবীর কোন ভদ্রব্যক্তিই এমন কথা মুখে ...তেও পারেনা। কিন্তু, স্বামীর চক্ষে স্ত্রীকে ...র হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টাকে হৃদয়ের কোন্ ...ত্তি বলে, আপনার ঠাকুরঝিকে বরঞ্চ জিজ্ঞেসা ... দিন।

ক্ষেত্রমোহন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি কহিলেন, চুপ চুপ, এ কথা তোমার বোনের যদি কানে যায় ত আর রক্ষা থাকবেনা, তা বলে দিচ্ছি।

শৈলেশ কহিলেন, একদিকে যদি রক্ষা নাও থাকে, আরও একদিকে রক্ষা বোধ হয় পেয়েছি যে আয়ের ...ট্‌টা ... পারে, ... দুশ্চিন্তা আর ভোগ করতে হবেনা। তার পরে শৈলেশ ... কেবল টাকার ভাব না, মাসের ... হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এর পরে ত তোমার বাড়ীতে আসতে পারিনে দাদা। আমি তা'হলে চিরকালের মতই চল্‌লুম।

শৈলেশ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, উষা হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমরা ত তোমাকে কোন কথা বলিনি ভাই।

হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেল। এবং এই গণ্ডগোলের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। বিভা হাত ছাড়াইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যখন আপনার কেবল শত্রুতাই করছি, তখন এ বাড়ীতে আমার আর কিছুতেই প্রবেশ করা উচিত নয়।

উষা কহিল, কিন্তু এমন কথা আমি ... দিন মনেও ভাবিনি ঠাকুরঝি।

বিভা কানও দিল না। অশ্রু-বিকৃত স্বরে ... লাগিল, আজ উনি মুখের উপর স্পষ্ট বলে ... কাল হয়ত দাদাও বলবেন,—তাঁর নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে কথা কইতে যাওয়া শুধু অপমান হওয়া। উমা, বাড়ী যাও ত এস। এই বলিয়া সে নীচে নামিতে উদ্যত হইয়া কহিল, বৌদিদি যখন নেই, তখন এ বাড়ীতে পা দিতে যাওয়াই আমাদের ভুল। একার বাপের বাড়ীর সকল সম্বন্ধই আমার ঘুচ্‌লো। এই বলিয়া সে সিঁড়ি দিয়া নীচে চলিয়া গেল। শৈলেশ পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া সসঙ্কোচে কহিল, না হয় আমার লাইব্রেরী ঘরে এসেই একটু বোস্‌ না বিভা।

বিভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। কিন্তু আমার বৌদিদিকে একেবারে ভুলে যেওনা দাদা। তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল সোমেন বিলাতে গিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়,—দোহাই তোমার, তাকে নষ্ট হতে দিয়োনা। আজ তাকে যে ভাবে চোখে দেখতে পেলুম, এই শিক্ষাই যদি তার চলতে থাকে, সমাজের মধ্যে আর মুখ দেখাতে পারবনা।

তাহার অশ্রু-গদ্গদ কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া শৈলেশ মিনতি করিয়া কহিল, তুই আমার বাইরের

[illegible]বোধ চল্ বোন্, এমন করে চলে গেলে আমার কষ্টের সীমা থাক্‌বেনা।

বিভার চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। সোমেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কি না জানিনা, কিন্তু অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, কোথাও গিয়ে আর বল্‌তে চাইনে দাদা, কিন্তু, সোমেন আমাদের বাপের কুলে একমাত্র বংশধর, তার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো। একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যেয়োনা দাদা! এই বলিয়া সে সোজা বাহির হইয়া আসিয়া তাহার গাড়ীতে গিয়া উপবেশন করিল। উমা বরাবর নীরব হইয়াই ছিল, এখনও সে একটি কথাতেও কথা যোগ করিলনা, নিঃশব্দে বিভার পার্শ্বে গিয়া স্থান গ্রহণ করিল।

শৈলেশ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, বিভা, সোমেনকে না হয় তুই নিয়ে যা। তোর নিজের ছেলে-পুলে নেই, তাকে তুই নিজের মত করেই মানুষ কোরে তোল্।

বিভা এবং উমা উভয়েই একান্ত বিস্ময়ে শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বিভা কহিল, কেন এই নিরর্থক প্রস্তাব করচ দাদা, এ তুমি পারবেনা, [illegible]ক পারতেও দেবোনা।

শৈলেশ ঝোঁকের উপর জোর করিয়া উত্তর দিল, [illegible] পারবোই—এই তোকে কথা দিলাম বিভা।

[illegible] সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মাথা নাড়িয়া কহিল, পারো [illegible] তাকে পাঠিয়ে দিয়ো। তাকে উচ্চ শিক্ষা দেবার টাকা যদি তোমার না থাকে, আমিও কথা দিচ্ছি দাদা, সে ভার আজ থেকে আমি নিলাম। এই বলিয়া সে উমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উমা নীচে তাদের দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরক্ষণে মোটর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শৈলেশ তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। উপরে যাইতে তাহার ইচ্ছাও হইলনা, সাহসও ছিলনা। সমস্ত কথাই যে উমা শুনিতে পাইয়াছে, ইহা জানিতে তাহার অবশিষ্ট ছিলনা।

৯

রাত্রে খাবার দিয়া স্বামীকে ডাকিতে পাঠাইয়া উমা অন্যান্য দিনের মত নিকটে বসিয়া ছিল। শুধু সোমেন আজ তাহার কাছে ছিলনা। হয়ত সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিম্বা এমনিই কিছু একটা হইবে। শৈলেশ আসিলেন; তাঁহার মুখ অতিশয় গম্ভীর,—হইবারই কথা। ব্যর্থ প্রশ্ন করা উমার স্বভাব নয়; আজিকার ঘটনা সম্বন্ধে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলনা, এবং যাহা জানেনা তাহা জানিবার জন্যও কোন কৌতূহল প্রকাশ করিলনা। স্ত্রীর এই স্বভাবের পরিচয়টুকু অন্ততঃ শৈলেশ এই কয়দিনেই পাইয়াছিল। আহারে বসিয়া মনে মনে সে রাগ করিল, কিন্তু আশ্চর্য্য হইলনা। ক্ষণে ক্ষণে আড়চোখে চাহিয়া সে স্ত্রীর মুখের চেহারা দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার নিশ্চয় বোধ হইল উমা ইচ্ছা করিয়াই আলোটার দিকে আড় হইয়া বসিয়াছে। অন্যান্য দিনের মত আজ সে খাইতে পারিলনা। যে জন্য আজ তাহার আহারে রুচি ছিলনা তাহার কারণ আলাদা, তথাপি জিজ্ঞাসা না করা সত্ত্বেও গায়ে পড়িয়া শুনাইয়া দিল যে অনভ্যস্ত খাওয়া-পরা শুধু দু'চার দিনই চলিতে পারে, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড় করাইলে আর স্বাদ থাকে না! তখন অরুচি অত্যাচারে গিয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা তর্কের দিক দিয়া যাই হোক্, এ ক্ষেত্রে সত্য নয় জানিয়া উমা চুপ করিয়া রহিল। মিথ্যা জিনিসটা যে নিশ্চয়ই মিথ্যা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক করিতে কোনদিনই তাহার প্রবৃত্তি হইতনা। কিন্তু এমন করিয়া নিঃশব্দে অস্বীকার করিলে প্রতিপক্ষের রাগ বাড়িয়া যায়। তাই, শুইতে আসিয়া শৈলেশ খামোকা বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার প্রতি একদিন অতিশয় অন্যায় করেছিলাম তা' মানি, কিন্তু তাই বলেই আজ তোমার ছাড়া আর কারও কোন ব্যবস্থাই চল্‌বেনা এও তো ভারি জুলুম।

এরূপ শক্ত কথা শৈলেশ প্রথম দিনটাতেও উচ্চারণ করে নাই। উমা মনে মনে বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে শুধু বলিল, আমি বুঝ্‌তে পারিনি।

কিন্তু এমন করিয়া অত্যন্ত বিনয়ে কবুল করিয়া লইলে আরও রাগ বাড়ে। শৈলেশ কহিল, তোমার বোঝা উচিত ছিল। আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, সমাজ সমস্ত উল্টে দিয়ে যদি এ বাড়ীকে তোমার বাপের বাড়ী বানিয়ে তুল্‌তে চাও ত আমাদের মত লোকের পক্ষে বড় মুস্কিল হ'তে থাকে। সোমেনকে বোধ হয় কাল ওর পিসীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি কি বল?

উমা কহিল, ওর ভালর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় ত দিতে হবে বই কি।

তাহার বলার মধ্যে উত্তাপ বা শ্লেষ কিছুই ধরিতে না পারিয়া শৈলেশ দ্বিধার মধ্যে পড়িল। কিসের জন্য যে এসব করিতেছে তাহার হেতুও

মনের মধ্যে বেশ দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু এই সকল দুর্বল প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে তাহারা কাল্পনিক মনঃপীড়া ও অসঙ্গত অভিমানের ধাপ ধরিয়া ধাপের পর ধাপ দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতে থাকে। এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, হাঁ, প্রয়োজন আছে বলিয়াই সকলের বিশ্বাস। যে সব আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি আমরা মানিনে, মানতে পারিনে, তাই নিয়ে অযথা ভাই-বোনের মধ্যে বিবাদ হয়, সমাজের কাছে পরিহাসের পাত্র হ'তে হয়,—এ আমার ভাল লাগেনা।

উষা প্রতিবাদ করিলনা, নিজের দিক হইতে কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা মাত্র করিলনা, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শৈলেশের তাহা কানে গেল। উষা নিজে কলহ করে নাই, তাহার পক্ষ লইয়া বিভার প্রতি যত কটু কথা উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার একটিও যে উষার নিজের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, তাহা এতখানিই সত্য যে সে লইয়া ইঙ্গিত করাও চলেনা, ভুলাও যায়না। সুতরাং, ক্ষেত্রমোহনের দুষ্কৃতির শাস্তি যে আর একজনের স্কন্ধে আরোপিত হইতেছেনা—ইহাতে প্রতিহিংসার কিছুই যে নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিতে সে পুনশ্চ কহিল, যাকে স্কুলে-কলেজে গিয়ে লেখা-পড়া শিখতে হবে, যে সমাজের মধ্যে তাকে চলা-ফেরা করতে হবে, ছেলেবেলা থেকে তার সেই আব-হাওয়ার মধ্যেই মানুষ হওয়া আবশ্যক। শিশুকালটা তার অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাটতে দেওয়া তার প্রতি গভীর অন্যায় এবং অবিচার করা হবে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিল, এ সম্বন্ধে তোমার বলবার কিছু না থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মুখ বুজে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লেই তার জবাব হয়না। সোমেনের সম্বন্ধে আমরা রীতিমত চিন্তা করেই তবে স্থির করেচি?

সোমেন পাশেই ঘুমাইতেছিল। এ বাটীতে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকায়, আসিয়া পর্য্যন্ত উষা তাহাকে নিজের কাছে লইয়াই শয়ন করিত। তাহার নিদ্রিত ললাটের উপর সে সস্নেহে ও সন্তর্পণে বাম হাতখানি রাখিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, যাই কেন না স্থির কর, ছেলের কল্যাণের জন্যই তুমি স্থির করবে। এ ছাড়া আর কিছু কি কেউ কখনো ভাবতে পারে? বেশ ত, তাই তুমি করো।

ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলি নিবাইয়া দিয়া ঘরের কোণে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটা তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল; সেই সামান্য আলোকে শৈলেশ [illegible] বিছানায় উঠিয়া বসিয়া অদূরবর্ত্তী শয্যায় শায়িত উষার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তা'ছাড়া সে সোমেনের সমস্ত পড়ার খরচ দেবে বলেছে। সে তো কম নয়!

উষার কণ্ঠস্বরে কিছুতেই উত্তেজনা প্রকাশ পাইতনা। শান্ত ভাবে কথা কহাই তাহার প্রকৃতি। কহিল, না, সে হ'তে পারবেনা। ছেলে মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।

শৈলেশ কহিল, সে যে অনেক টাকার দরকার।

উষা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, দরকার হয় দিতে হবে। কিন্তু আর রাত জেগোনা, তুমি ঘুমোও।

পরদিন অপরাহ্নকালে শৈলেশ কলেজ ও ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিয়া রান্নার এক প্রকার সুপরিচিত ও সুপ্রিয় গন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিত চিত্তে তাহার পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। অনতিকাল পরে চা ও খাবার লইয়া যে ব্যক্তি দর্শন দিলেন, শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সে মুসলমান।

রাত্রে খাবার-ঘরে আলো জ্বলিল, এবং সজ্জিত টেবিলের চেহারা দেখিয়া শৈলেশ মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিলনা যে ইহারই জন্য অত্যন্ত [illegible] মন তাহার সত্যই ব্যগ্র এবং ব্যাকুল হইয়া [illegible]।

ডিনার তখনও দুই-একটা ডিসের অধিক [illegible] হয় নাই, উষা আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া [illegible] একটু দূরে বসিল।

শৈলেশের মন প্রসন্ন ছিল, ঠাট্টা করিয়া বলিল, ঘরে ঢুকলে জাত যাবেনা? পুরাণেও যে অন্ধ ভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

উষা অল্প একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ তোমার উচিত নয় যে শাস্ত্রকে তুমি মানোনা পদ-না, তার দোহাই দেওয়া তোমার সাজেনা।

শৈলেশও হাসিল। কহিল, আচ্ছা হার মানলুম। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই আমিও দেবনা, তুমিও কিন্তু পালিয়ো না। তবে এ কথা নিশ্চয় যে ভাগ্যে কাল খোঁটা দিয়েছিলুম, তাই ত আজ এমন বস্তুটি অদৃষ্টে জুটলো! ঠিক না উষা? কিন্তু খরচ-পত্র কি তোমার খুব বেশি পড়বে?

উষা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। অপব্যয় না হ'লে কোন খাবার জিনিসেই খুব বেশি পড়েনা। আসচে মাস থেকে আমি নিজেই এ সব কোরব ভেবেছিলাম। কিন্তু এইটি দেখো জিনিস-পত্র বৃথা নষ্ট যেন না হয়! আমার খরচের খাতায় যেমনটি লিখে রেখেচি, ঠিক তেমনিটি যেন হয়। হবে ত?

সোমেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন হবে না শুনি?

উষা তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর দিতে পারিল না। ক্ষণকাল নীরবে নীচের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, কাল সারা-রাত ভেবে ভেবে আমি যা স্থির করেচি, তাকে অস্থির করবার জন্যে আমাকে আদেশ কোরোনা, তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

শৈলেশ আর্দ্রচিত্তে কহিল, তা'তো আমি কোনদিন করবার চেষ্টা করিনে উষা। আমি নিশ্চয় জানি তোমার সিদ্ধান্ত তোমারই যোগ্য। তার নড়চড় হবে না, হওয়া উচিতও নয়। আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তোমার মন তেমনি সবল তেমনি দৃঢ়।

স্বামীর মুখের উপর হইতে উষা দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, সত্যিই আর কিছু হবার নয়, আমি অনেক ভেবে দেখেচি।

শৈলেশ নিশ্চয় বুঝিল ইহা সোমেনের কথা। সহাস্যে কহিল, ভূমিকা তো হ'ল, এখন স্থির কি করেছ বল ত? আমি শপথ করে বল্‌তে পারি তোমাকে কখনো অন্যথা করতে অনুরোধ করবনা।

[illegible] মিনিট খানেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। [illegible] কহিল, দাদার সংসারে আমার ত চলে [illegible]—বিশেষ কোন কষ্ট ছিলনা। কাল আবার [illegible]দের কাছেই যাবো।

[illegible] কাছে যাবে? কবে ফিরবে?

উষা বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, ফিরতে [illegible] আমি পারবনা। আমি অনেক চিন্তা ক'রে দেখেচি এখানে আমার থাকা চল্‌বেনা। এই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

কথা শুনিয়া শৈলেশ একেবারে যেন পাথর হইয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত চিত্ত যেন নিরন্তর মুগুর মারিয়া মারিয়া কহিতে লাগিল যে লৌহ-কবাট রুদ্ধ হইয়া গেল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সাধ্য এ দুনিয়ায় কাহারও নাই।

১০

সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া শৈলেশের প্রথমেই মনে হইল সারা-রাত্রি ধরিয়া সে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল উষা নিত্য-নিয়মিত গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা;—সোমেন সঙ্গে, বোধ হয় সে খাবার তাগাদায় আছে,—সিঁড়িতে নাম্বিবার পথে দেখা হইতে উষা মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার চা তৈরি ক'রে ফেলেচে, মুখ-হাত ধুতে দেরি করলে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে কিন্তু। একটু তাড়াতাড়ি নিয়ো।

শৈলেশ কহিল, বেশ ত, তুমি পাঠিয়ে দাও গে, আমার এক মিনিট দেরি হবেনা। এই বলিয়া সে যেন লাফাইতে লাফাইতে গিয়া তাহার বাথ-রুমে প্রবেশ করিল। মনে মনে কহিল, আচ্ছা ইডিয়ট্‌ আমি! দাম্পত্য-কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে, সকাল বেলায় এই কথা মনে করিয়া শুধু তাহার হাসি পাইল তাই নয়, নিজের কাছে লজ্জা বোধ হইল। সংসার করিতে একটা মতভেদ বা দু'টো কথা-কাটাকাটি হইলেই স্ত্রী যদি স্বামিগৃহ ছাড়িয়া দাদার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইত, দুনিয়ায় ত তা' হইলে মানুষ বলিয়া আর কোন জীবই থাকিতনা। সোমেনের-মা হইলেও বা দু'দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু উষার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে-গড়া স্ত্রী,—ধর্ম্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদি তাহার একটা রাগের কথাকেই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়া যাইতে দেয়, তা' হইলে সংসারে আর বাকি থাকে কি? এবং এ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাগ্‌লামিই বা কি আছে, ইহাই অসংশয়ে উপলব্ধি করিয়া তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়া গিয়া হৃদয় শান্তি ও প্রীতির রসে ভরিয়া উঠিল! এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে উষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সমাজের আরও দুই-চারিজন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক্‌, বাবা, আর কাজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। এমনি ধারা শিক্ষা-দীক্ষা পেলেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেব। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নব-নিযুক্ত মুসলমান খানসামা চা, রুটি, মাখন, কেক প্রভৃতি প্রাতরাশের আয়োজন লইয়া হাজির হইতে তাহার হঠাৎ যেন চমক লাগিল। এই সকল বস্তুতেই সে চিরদিন অভ্যস্ত, মাঝে কেবল দিন-কয়েক বাধা পড়িয়াছিল মাত্র; কিন্তু টেবিলে রাখিয়া দিয়া বেহারা চলিয়া গেলে এই জিনিসগুলির পানে চাহিয়াই আজ তাহার অরুচি বোধ হইল; উষা গৃহে আসিয়া পর্য্যন্ত এই সকলের পরিবর্ত্তে নিম্‌কি, কচুরি প্রভৃতি তাহার স্বহস্ত-রচিত খাদ্য-দ্রব্য সকালে চায়ের সঙ্গে আসিত, সে নিজে উপস্থিত থাকিত, কিন্তু আজ

হার কোনটাই নাই দেখিয়া তাহার আহারে রুচি রহিল না। শুধু এক পেয়ালা চা কেৎলি হতে নিজে ঢালিয়া খানসামাকে ডাকিয়া সমস্ত বাহির করিয়া দিয়া শৈলেশ পর্দার বাহিরে একটা অত্যন্ত পরিচিত পদধ্বনির আশায় কান খাড়া করিয়া রাখিল। এবং না-খাওয়ার কৈফিয়ৎ যে কটু কড়া করিয়াই দিবে এই মনে করিয়া সে ধীরে ধীরে অযথা দেরি করিয়া পেয়ালা যখন শেষ করিল তখন চা ঠাণ্ডা এবং বিস্বাদ হইয়া গেছে; বেহারা আসিয়া লোকটা শূন্য পেয়ালা তুলিয়া লইয়া গেল, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত পায়ের শব্দ আর শোনা গেলনা, ঊষা এ ঘরে প্রবেশ করিলনা।

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল, আনাহার সারিয়া কলেজের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। খাবার সময় আজও ঊষা অন্যান্য দিনের মত কাছে আসিয়া বসিল; তাহার আগ্রহ, যত্ন বা কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম বাড়ীর কাহারও কাছে ধরা পড়িলনা, পড়িল শুধু শৈলেশের কাছে। একটা রাত্রির মধ্যে একটা লোক যে বিনা চেষ্টায়, বিনা আড়ম্বরে কতদূরে সরিয়া যাইতে পারে, ইহাই উপলব্ধি করিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলেজে যাইবার পোষাক পরিতে ঘরে ঢুকিয়া এখন প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল টেবিলের উপরে সংসার-খরচের সেই ছোট্ট খাতাটি। খাতা, সকাল হইতেই এমনি পড়িয়া আছে, সে লক্ষ্য করে নাই,—না হইলে তাহারই জন্য ঊষা ইহা রাখিয়া গেছে তাহা সম্ভবও নয়, সত্যও নয়। আজও ত মাস শেষ হয় নাই,—অকস্মাৎ এখনে ইহার প্রয়োজন হইলই বা কিসে? তথাপি খাতার টাই বাঁধা তাহার অসমাপ্ত হইয়া রহিল, কতক কৌতূহলে, কতক অন্যমনস্কতাবশে একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইয়া একেবারে শেষ পাতায় আসিয়া থামিল। পাতায় পাতায় একই কথা,—সেই মাছ, শাক, আলু, পটল, চালের বস্তা, দুধের দাম, চাকরের মাইনে,—কাল পর্য্যন্ত জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া মজুত টাকার অঙ্ক স্পষ্ট করিয়া লেখা। এই লেখা যেদিন আরম্ভ হয়, সেদিন সে এলাহাবাদে। তখনও তাহার হাত ছিলনা, আর আজ এইখানেই যদি ইহার সমাপ্তি ঘটে তাহাতেও তাহার হাত নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথম দিনের প্রথম পাতাটির প্রতি শৈলেশ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। এই জিনিসটা সংসারে তাহার দু'দিনের ব্যাপার। আগেও ছিলনা, পরেও যদি না থাকে ত সংসার অচল হইয়া থাকিবেনা,— দু'দিন পরে হয়ত সে নিজেই ভুলিবে। তবুও কত কি-ই না, মনে হয়। খাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তুচ্ছ টাই বাঁধার কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া হঠাৎ এই কথাটাই আজ তাহার সব চেয়ে বড় করিয়া মনে হইতে লাগিল, এ জগতে কোন-কিছুর মূল্যই একান্ত করিয়া নির্দ্দেশ করা চলেনা। এই খাতা, এই হিসাব লেখারই মত একদিন প্রয়োজনের অবধি ছিলনা, আবার একদিন সেই সকলই না কতখানি অকিঞ্চিৎকর হইতে চলিল!

অবশেষে পোষাক পরিয়া শৈলেশ যখন বাহির হইয়া গেল, তখন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ঊষাকে ডাকিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলনা। অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে মন তাহার বারম্বার আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল, তথাপি অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিয়া লইবার সাহসও সে নিজের মধ্যে কোন ক্রমেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলনা।

১১

কলেজের ছুটির পরে শৈলেশ বাটী না ফিরিয়া সোজা বিভার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া দেখিল অনুমান তাহার নিতান্ত [illegible] হয় নাই। ভগিনীপতি আদালতে বাহির হন নাই, [illegible] ইতিমধ্যেই উভয়ের মধ্যে এক প্রকার রফা [illegible] গিয়াছে। দেখিয়া সে তৃপ্তি বোধ [illegible] কহিল, কই সোমেনকে আনতে ত লোক পাঠালে না বিভা?

বিভা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন কহিল, হাতি যে কিনছিল সে নেই।

তার মানে?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, তুমি গল্প শোননি? কে একজন মাতাল নাকি নেশার ঝোঁকে বাজার হাতি কিনতে চেয়েছিল। পরদিন ধরে এনে এই বেয়াদপির কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সে হাত জোড় করে বলেছিল, হাতিতে তার প্রয়োজন নেই, কারণ, হাতির যে সত্যিকারের খরিদ্দার সে আর নেই, চলে গেছে। এই বলিয়া সে নিজের রসিকতায় হাসিতে লাগিল, এবং পরে হাসি থামিলে বলিল, এই গল্পটা শুনিয়ে বৌঠাকরুণকে রাগ করতে বারণ কোরো শৈলেশ, সত্যিকার খদ্দের আর নেই—সে চলে গেছে। মায়ের চেয়ে পিসির কাছে এসে যদি ছেলে বেশি মানুষ হয়, তার চেয়ে না হয় ধার-ধোর করে বিভাকে একটা হাতিই আমি কিনে দেব।

এই বলিয়া সে বিভার অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া পুনরায় হাসিতে লাগিল।

কিন্তু সে হাসিতে শৈলেশ যোগ দিলনা, এবং পাছে পরিহাসের সূত্র ধরিয়া বিভার সুপ্ত ক্রোধ উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই ভয়ে সে প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ক্ষেত্রমোহন লজ্জিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি শৈলেশ?

শৈলেশ কহিল, বিভার কথায় সোমেনের সম্বন্ধে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন হবেনা তখন আবার কোন একটা নূতন ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, অর্থাৎ ডাইনির হাতে ছেলে বিশ্বাস করা যায়না,—না?

শৈলেশ বলিল, এই কটূক্তির জবাব না দিয়েও এ কথা বলা যেতে পারে যে উঁনি শীঘ্রই চলে যাচ্ছেন।

চলে যাচ্ছেন? কোথায়?

শৈলেশ কহিল, যেখান থেকে এসেছিলেন,—তাঁর দাদার বাড়ীতে।

ক্ষেত্রমোহনের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে স্ত্রীর মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, আমি এই রকমই কতকটা ভয় করেছিলাম শৈলেশ।

বিভা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের অর্থ সে বুঝিল, কিন্তু ন... সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আমাকে নিশ্চিন্ত করেই কি তুমি এই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছো? তা' যদি হয়, আমি নিষেধ কোরবনা, কিন্তু একদিন তোমাদের দু'জনকেই কাঁদতে হবে বলে দিচ্ছি।

শৈলেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পরে সে মুসলমান ভৃত্য রাখা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সকালের সেই খাতাটার কথা পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিল, যেতে আমি বলিনি, কিন্তু যেতে বাধাও আমি দেব না। আত্মীয়-বন্ধু মহলে একটা আলোচনা উঠবে, এবং তাতে যশ আমার বাড়বেনা তাও নিশ্চয় জানি, কিন্তু প্রকাণ্ড ভুলের একটা সংশোধন হ'য়ে গেল, তার জন্যে ভগবানকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দেব।

বিভা মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল, ক্ষেত্রমোহনও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোনরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করিলনা।

শৈলেশ কহিল, তোমাদের কাছে সমস্ত জানানো কর্ত্তব্য বলেই আজ আমি এসেছি। অন্ততঃ তোমরা না আমাকে ভুল কর।

ক্ষেত্রমোহন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, আ তার সাধ্য কি। হাঁ হে শৈলেশ, ভবানীপুরে একবার একটা কথাবার্ত্তা হয়েছিল, ইতিমধ্যে আর কেউ খবরটবর নিয়েছিলেন কি?

শৈলেশ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, তোমার হাঁ এত অভদ্র এবং হীন যে আপনাকে সামলা শক্ত। তোমাকে কেবল এই বলেই ক্ষমা করা যে, কোথায় আঘাত কোরচ তুমি জানো এই বলিয়া সে ভিতরের উত্তাপে একবার নড়ি চড়িয়া আবার সোজা হইয়া বসিল।

ক্ষেত্রমোহন তাহার মুখের প্রতি চাহি অবিচলিত ভাবে এবং অত্যন্ত সহজে স্বীকার করি লইয়া কহিল, সে ঠিক। ঘায়গাটা যে তোমা কোথায় আমি ঠাওর করতে পারিনি।

শৈলেশ নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বলিল, নিজে স্ত্রীর সঙ্গেই সেদিন যে ব্যবহার করলে,—তাতে আ আর তোমার কাছে কি বেশি প্রত্যাশা ক পারি! তোমার দস্তে ঘা লাগবে ব'লেই কখনো বলিনি, কিন্তু বহুপূর্ব্বেই বোধ করি বলা উচিত ছি

ক্ষেত্রমোহন মুচকিয়া একটুখানি হাসিয়া কহি তাই ত হে শৈলেশ, it reminds;—স্ত্রীর ব্যবহার! ওটা আজও ঠিক শিখে উঠতে পারিনি শেখবার বয়সও উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে—কিন্তু তুমি এ সম্বন্ধে একটা বই লিখে যেতে পারবে আচ্ছা, তোমরা ভাই-বোনে ততক্ষণ নিরি একটু পরামর্শ কর, আমি এলাম ব'লে। বলিয়া সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দ্রুতপদে বা হইয়া গেল।

শৈলেশ চেঁচাইয়া বলিল, বই লিখতে হয়ত হ'তেও পারে, কিন্তু ততক্ষণ শুনে যাও, ওই যে ভবানীপুরের উল্লেখ ক'রে বিদ্রূপ করলে, তাঁরা আমার খবর নিন্ বা না নিন্ আমাকে উদ্যোগী নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন দ্বারের বাহিরে হইতে শুধু জবাব নিশ্চয় হবে। এমনিই ত অযথা বিলম্ব হ'য়ে গে

পরদিন সকালেই আসিয়া ক্ষেত্রমোহন পা ডাক্তার বাড়ীতে দেখা দিলেন। শৈলেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অকস্মাৎ অস ভগিনীপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হই কালকের অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপারের অযাচিত ও এত শীঘ্র ইহাকে সে আশা করে না মনে মনে কতকটা লজ্জাবোধ করিয়া কহিল; আ কি হাইকোর্ট বন্ধ না কি?

ক্ষেত্রমোহন সহাস্যে বলিল, প্রায় বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, তবে কি প্র্যাক্‌টিশ ছেড়ে দিলে না কি?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, ততোধিক বাহুল্য।

শৈলেশ কহিল, বোধ করি আমিও বাহুল্য। আমার স্নানের সময় হয়েছে তাতে বোধ করি তোমার আপত্তি হবেনা?

ক্ষেত্রমোহন জবাব দিল, না। তুমি যেতে পারো।

বৌঠাকরুণ, আস্‌তে পারি?

পূজার ঘর এ গৃহে ছিলনা। শোবার ঘরের একধারে আসন পাতিয়া ঊষা আহ্নিকে বসিবার আয়োজন করিতেছিল; কণ্ঠস্বরে চিনিতে পারিয়া ভিজা চুলের উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া আহ্বান করিল, আসুন।

ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকিয়াই অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, অসময়ে এসে অত্যাচার করলুম। হঠাৎ বাপের বাড়ী যাবার খেয়াল হয়েছে না কি? বাবা কি পীড়িত?

ঊষা কহিল: বাবা বেঁচে নেই।

ও—তা'হলে মা'র অসুখ না কি?

ঊষা বুলিল, তিনি বাবার পূর্ব্বেই গেছেন।

ক্ষেত্রমোহন ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তা'হলে যাচ্ছেন কোথায়? আছে কে? অন জায়গায় ত কোন মতেই যাওয়া হ'তে পারে না। শৈলেশের কথা ছেড়ে দিন, আমরাই ত রাজি হ'তে পারিনে।

ঊষা মুখ নিচু করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, পারবেননা?

না, কিছুতেই না।

কিন্তু এককাল ত আমার সেই দাদার বাড়ীতেই কেটে গেছে ক্ষেত্রবাবু। অচল হয়ে ত ছিলনা।

ক্ষেত্রবাবু কহিলেন, যদি নিতান্তই যান, ফিরতে ক'দিন দেরি হবে তা সত্যি ক'রে বলে যান। না হ'লে কিছুতেই যেতে পাবেননা।

ঊষা নীরব হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, কে জানে?

ঊষা কহিল, তার পিসি আছেন।

ক্ষেত্রমোহন হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, সে আমার স্ত্রী। আমি তার হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

ঊষা মৌন হইয়া রহিল।

পারবেন না ক্ষমা করতে?

ঊষা তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, জগতে অপরাধ যখন আছে, তখন তার দুঃখ-ভোগও আছে, এবং থাকবারই কথা। কিন্তু এর বিচার নেই কেন বলতে পারেন?

ঊষা কহিল, অর্থাৎ, একজনের অপরাধের শাস্তি আর একজনকে পোহাতে হয় কেন? হয় এইমাত্রই জানি, কিন্তু কেন, তা আমি জানিনে ক্ষেত্রমোহনবাবু।

কবে যাবেন?

দাদা নিতে এলেই। কালও আস্‌তে পারেন।

ক্ষেত্রমোহনবাবু অল্পকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, একটা কথা আপনাকে কোনদিন জানাবোনা ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, গোপন রাখলে আমার অপরাধ হবে। আপনার আসবার পূর্ব্বে এ বাড়ীতে আর একজনের আসবার সম্ভাবনা হয়েছিল। মনে হয় সে ষড়যন্ত্র একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

ঊষা কহিল, আমি জানি।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, তা'হলে রাগ ক'রে সেই ষড়যন্ত্রটাই কি অবশেষে জয়ী হ'তে দেবেন [illegible] কি—

কথা শেষ হইতে পাইল না। ঊষা [illegible] কহিল, জয়ী হোক্, পরাস্ত হোক্, ক্ষেত্রমোহনবাবু, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন,—এই বলিয়া ঊষা দুই হাত যুক্ত করিয়া এতক্ষণ পরে ক্ষেত্রমোহনের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিল।

সেই দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষেত্রমোহন নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

১২

স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ শৈলেশ বন্ধ করিল, কিন্তু ঊষা করিল না। তাহার আচরণে লেশমাত্র পরিবর্ত্তন নাই,—সাংসারিক যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম ঠিক্ তেম্‌নিই সে করিয়া যাইতেছে। মুখ ফুটিয়া শৈলেশ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারেনা, অথচ, সব চেয়ে মুস্কিল হইল তাহার এই কথা ভাবিয়া, এ গৃহ যে লোক চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া যাইতেছে সেই গৃহের প্রতি তাহার এতখানি মমতা-বোধ রহিল কি করিয়া? আজ সকালেই তাহার কানে গিয়াছে দেয়ালের গায়ে হাত মুছিবার অপরাধে ঊষা নূতন ছোকরাটাকে তিরস্কার করিতেছে। অভ্যাসমত কাজে ভুল-ভ্রান্তি তাহার না-ই বলিয়া হয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই

তাহার সতর্ক দৃষ্টিতে এতটুকু শিথিলতাও-যে শৈলেশের চোখে পড়েনা! উষাকে ভাল করিয়া জানিবার তাহার সময় হয় নাই, তাহাকে সে সামান্যই জানিয়াছে, কিন্তু সেইটুকু জানার মধ্যেই কিন্তু এটুকু জানা তাহার হইয়া গেছে যে সাবার সহজে তাহার বিচলিত হইবেনা। অথচ, সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এ বয়সে তাহার সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সহিত প্রকাণ্ড গরমিল যেন একচক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রুপাত করিয়া তাহার মনটাকে লইয়া অবিশ্রাম নাগর-দোলায় পাক খাওয়াইয়া মারিতেছে।

ক্ষেত্রমোহন আসিয়া একেবারে সোজা রান্না-ঘরের দরজায় দেখা দিলেন, কহিলেন, প্রসাদ পাবার আর বিলম্ব কত বৌঠাকরুণ?

উষা মাথার কাপড়টা আরও একটুখানি টানিয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, সে কথা আপনার বড়-কুটুম্বটিকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসুন,—নইলে আমার সব হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ঠকবার পাত্রীই আপনি নয়, কিন্তু ঠকে গেলাম আমি নিজে। রান্নার বহর দেখে এই ভরা-পেটেও লোভ হয় বৌঠাকরুণ, কিন্তু অসুখের ভয় করে। তবে, নেমতন্ন ক্যান্‌সেল করলে চলবেনা, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।

উষা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনার ছেলেটি কই?

উষা কহিল, আজ কি যে তার মাথায় খেয়াল এলো কিছুতেই ইস্কুলে যাবেনা। কোনমতে দু'টি খাইয়ে এইমাত্র পাঠিয়ে দিলাম।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, আপনাকে সে বড্ড ভালবাসে। একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ভাল কথা, আপনার সেই বাপের বাড়ী যাবার প্রস্তাবটা কি হল? বাস্তবিক বৌঠাকরুণ, রাগের মাথায় আপনার মুখ দিয়েও যদি বে-ফাঁস কথা বার হয় ত ভরসা করবার সংসারে আর কিছু থাকেনা!

উষা এ অভিযোগের উত্তর দিলনা, নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। তথা হইতে বাহির হইয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের পড়ার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈলেশ আনায়ে আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতেছিলেন, মুখ ফিরিয়া চাহিলেন।

ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কলেজ আজ বন্ধ নাকি হে?

না। তবে প্রথম দু'ঘণ্টা ক্লাস নেই।

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছো বেশ। কিন্তু বৌঠাকরুণের বাপের বাড়ী যাবা আয়োজন কিরূপ করলে?

শৈলেশ কহিলেন, আয়োজন যা' করবার সি গেলে তবে কোরব। শুন্‌চি কাল তাঁর দাদা এ নিয়ে যাবেন।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তুমি একটি ইডিয়ট। স্ত্রী নিয়ে তুমি পেরে উঠবেনা ভাই, তার চেয়ে বর বদলাবদলি করে নাও, তুমিও সুখে থাকো, আমি সুখে থাকি।

শৈলেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, বয়েস ঢের হ'ল ক্ষেত্র, এইবার এই অভদ্র রসিকতাগু ত্যাগ করনা।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ত্যাগ কি সাধে করা পারিনে ভাই, তোমাদের ব্যবহারে পারিনে। তি অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে বল্‌লেন, বাপের বাড়ী চলে যাবে তুমি অমনি জবাব দিলে, যাবে যাও,—আম ভবানীপুর এখনো হাতছাড়া হয়নি।—এই সমস্ত ব্যবহার? ভাই-বোন একেবারে এক ছাঁচে ঢাল যাক্, আমি সব ভেঙে দিয়ে এসেছি, যাওয়া-টাও তাঁর হবেনা। তুমি কিন্তু আর খুঁচিয়ে যা কোরোন হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলে উঃ—ভারি বেলা হ'য়ে গেল, এখন চল্লুম, ক সকালেই আস্‌বো। ফিরিতে উদ্যত হইয়া গলা খাট করিয়া কহিলেন, দিনকতক একটু বুঝিয়ে চল শৈলেশ। অধ্যাপকের ঘরের মেয়ে, অনাচার করতে পারেননা, খানা-টানাগুলো দু'দিন ব থেকে! তা'ছাড়া, এসব ভালও ত নয়,—খরচে দিক্‌টাতেই চেয়ে দেখনা? আচ্ছা, চল্লুম ভাই- এই বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই দ্রুতপ বাহির হইয়া গেলেন।

শৈলেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াই রহিল। ক্ষেত্রমোহন কখন্ আসিল, কি বলিয়া, কি করিয়া হঠাৎ সমস্ত ব্যাপার উল্টাইয়া দিয়া গেল, ভাবিয়াই পাইলনা।

বেহারা আসিয়া সম্বাদ দিল খাবার দেওয়া হইয়াছে। উত্তরের ঢাকা বারান্দায় যথানিয়ম আসন পাতিয়া ঠাঁই করা। প্রতিদিনের মত বহুবি অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া অদূরে উষা বসি আছে, শৈলেশ ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে বসি গেল। অনেকবার তাহার ইচ্ছা হইল ক্ষেত্রর কথা মুখো-মুখি যাচাই করিয়া লইয়া সময়োচিত দু ছ'টো কথা বলিয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটি পারিলনা, কিছুতেই এ কথা জিজ্ঞাসা করি

পারিলনা। এমন কি গোমেনের ছুতা করিয়াও আলোচনা আরম্ভ করিতে পারিলনা। অবশেষে খাওয়া সমাধা হইলে নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

১৩

পরদিন সকালে অবিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলেশ সেইমাত্র হাত-মুখ ধুইয়া পড়িবার ঘরে চা খাইতে যাইতেছিল, বাড়ীর মধ্যে এই অপরিচিত লোকটিকে দেখিয়াই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? আগন্তুক উষার ছোট ভাই। সে আপনার পরিচয় দিয়া কহিল, দাদা নিজে আসতে পারলেননা, দিদিকে নিয়ে যাবার জন্তে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বেশ ত নিয়ে যান। এই বলিয়া শৈলেশ তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রাতঃকালের সর্ববিধ সরঞ্জাম টেবিলে সজ্জিত ছিল, কিন্তু কেবল মাত্র এক বাটি চা ঢালিয়া লইয়া সে নিজের আরাম-কেদারায় আসিয়া উপবেশন করিল, অবশিষ্ট সমস্তই পড়িয়া রহিল, তাহার স্পর্শ করিবারও রুচি হইলনা। উষার পিতৃগৃহ হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার কথা। দিক দিয়া অবিনাশকে দেখিয়া তাহার চমকাইবার হেতু ছিলনা, এবং আসিয়াছে বলিয়াই যে অপরকে দিয়া যাইতে হইবে এমনও কিছু নয়;—হয়ত, শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই হইবেনা,—কিন্তু নিশ্চয় একটা কিছু বিষয়ে না জানা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ-মন তাহার কি যে করিতে লাগিল তাহার উপমা নাই। আজ সকালবেলাতেই ক্ষেত্রমোহনের আসিবার কথা, কিন্তু সে ভুলিয়াই গেল, কিম্বা কোন একটা কাজে আবদ্ধ হইয়া রহিল, সহসা এই আশঙ্কাই যেন তাহার সকল আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিল। সে আসিয়া পড়িলে যাহোক একটা মীমাংসা হইয়া যায়। এইটাই তাহার একান্ত প্রয়োজন। অধৈর্য্যের উত্তেজনায় তাহার কেবলই ভয় করিতে লাগিল পাছে আপনাকে আর সে ধরিয়া না রাখিতে পারে, পাছে নিজেই ছুটিয়া গিয়া উষাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে কাল ক্ষেত্রমোহনের সহিত তাহার কি কথা হইয়াছে! শৈলেশ নিজেকে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলনা। এম্নি করিয়া ঘড়ির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সময় আর কাটেনা, এম্নি সময়ে দ্বারের ভারি পর্দ্দা সরাইয়া যে ব্যক্তি সহসা প্রবেশ করিল সে একান্ত প্রত্যাশিত ক্ষেত্রমোহন নয়,—অবিনাশ। শৈলেশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া একখানা বই টানিয়া লইল। তাহার সর্ব্ব দেহে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল।

অবিনাশ বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যগুলার প্রতি চোখ পড়িতে ও-ধারের একখানা চেয়ার আরও খানিকটা দূরে টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। গৃহস্বামী অভ্যর্থনা করিবে এ ভরসা বোধ হয় তাহার ছিলনা, কিন্তু ঘরে ঢোকার একটা কারণ পর্য্যন্তও যখন সে জিজ্ঞাসা করিলনা, তখন অবিনাশ নিজেই কথা কহিল। বলিল, এই আড়াইটার গাড়ীতেই ত দিদি যেতে চাচ্চেন।

শৈলেশ মুখ তুলিয়া কহিল, চাচ্চেন? কেন, আমার পক্ষ থেকে কি তিনি বাধা পাবার আশঙ্কা করচেন?

অবিনাশ ছেলেমানুষ, সে হঠাৎ কি জবাব দিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, আজ্ঞে, না।

দরজার বাহিরে চুড়ির শব্দ পাইয়া শৈলেশের মন আরও বাঁকিয়া গেল। বলিল, না, আমার তরফ থেকে তাঁর যাবার কোন নিষেধ নেই।

অবিনাশ নীরব হইয়া রহিল। শৈলেশ প্রশ্ন করিল, তোমার দাদার আসবার কথা ছিল শুনেছিলুম, তিনি এলেননা কেন?

অবিনাশ সঙ্কুচিত ভাবে আস্তে আস্তে বলিল, তাঁর আমাকে পাঠাবারও তেমন ইচ্ছে ছিলনা।

কেন?

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

শৈলেশ কহিল, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে সব কথা বলাও যায়না, বলে লাভও নেই। তবে, তোমার দাদা যদি কখনো জান্‌তে চান্ ত বোলো যে, এ ব্যাপারে উষার দোষ নেই, দোষ কিংবা ভুল যদি কারও হয়ে থাকে ত সে আমার। তাঁকে আনতে পাঠানোই আমার উচিত হয়নি।

একটু স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, মনে হোতো বাবা অন্যায় করে গেছেন। দীর্ঘকাল পরে অবশেষে যখন সময় এলো ভাবলুম এবার তার প্রতিকার হবে। তোমার দিদি এলেন বটে, কিন্তু এক দোষ শত দোষ হয়ে দেখা দিলে।

ইহার আর উত্তর কি! অবিনাশ মৌন হইয়া রহিল, এবং এম্নি সময়ে সহসা অন্য দিকের দরজা ঠেলিয়া ঘরে ক্ষেত্রমোহন প্রবেশ করিলেন। শৈলেশ চাহিয়া দেখিল কিন্তু থামিতে পারিলনা। কঠিন বাক্যের স্বভাবই এই সে নিজের ভারেই নিজে কঠিনতর হইয়া উঠিতে থাকে। উষা অন্তরালে দাঁড়াইয়া অন্রান্ত-লক্ষ্যে তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ

অভিমানের নির্দয় উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইয়া শৈলেশ বলিতে লাগিল, তোমার ভগিনীকে একদিন বিবাহ করেছিলুম সত্য, কিন্তু সহধর্মিণী তাঁকে কোনমতেই বলা চলেনা। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমাজ ধর্ম কিছুই এক নয়,—জোর করে তাঁকে গৃহে রাখতে নিজের বাড়ীটাকে যদি স্মৃতি-শাস্ত্রের টোল বানিয়েও তুলি, কিন্তু আমার একমাত্র ছোট বোন দুঃখে ক্ষোভে পর হয়ে যায়, একটি মাত্র ছেলে কুশিক্ষায় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ তো কোন ক্রমেই আমি হতে দিতে পারিনে। তবে তাঁর কাছে আমি এই জন্যে কৃতজ্ঞ যে, মুখ-ফুটে আপনি যা বলতে পারছিলুমনা, তিনি নিজে থেকে সেই দুরূহ কর্ত্তব্যটাই আমার সম্পন্ন করে দিলেন।

ক্ষেত্রমোহন বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। শৈলেশ লাজুক ও দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক, ভয়ঙ্কর কিছু উচ্চারণ করা তাহার একান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু উন্মাদের মত সে এ কি করিতেছে! উষার ছোট ভাই লইতে আসিয়াছে এ সংবাদ তিনি ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, অতএব, অপরিচিত লোকটি যে সে-ই তাহাতে সন্দেহ নাই— তাহারই সম্মুখে এ সব কি! ক্ষেত্র রাগে-অনুনয়ে হাত দুটি প্রায় জোড় করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, দোহাই, আপনার দিদিকে যেন এসব গুণাগ্রেও জানাবেননা! অপরিচিত ছেলেটি শৈলেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে কিছুই জানাতে হবেনা, বাইরে দাঁড়িয়ে দিদি নিজের কানেই সমস্ত শুনতে পাচ্চেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে? ওইখানে?

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি জবাব দিবার পূর্ব্বেই শৈলেশ স্পষ্ট করিয়া বলিল, হাঁ, আমি জানি ক্ষেত্র, তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে।

উত্তর শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্তব্ধ বিবর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

সেইদিন ঘণ্টা দুই তিন পরে ভগিনীকে লইয়া যখন অবিনাশ ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল, তখন সোমেন তাহার পিসীর বাটীতে, তাহার পিতা কলেজ-গৃহে এবং ক্ষেত্রমোহন হাইকোর্টের বারলাইব্রেরীতে বসিয়া।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া বিভা স্বামীকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদা কি করলেন দেখ্‌লে।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, দেখ্‌লুম ত হাতে আছে হইয়ে ... বই, কিন্তু আসলে কাজুন বোধ করি ... শোচনা।

ও কাজটা তুমি কবে করবে?

কোন্‌টা? বই, না অনুশোচনা?

বিভা কহিল, বই তোমার হাতে আর মাথাবে, আমি শেষের কাজটাই বলচি!

ক্ষেত্রমোহন খোঁচা খাইয়া বলিলেন, তাই ডেকে বাপের-বাড়ী চলে গেলেই বোধহয় করা পারি।

বিভার মন আজ প্রসন্ন ছিল, সে রাগ করিলনা কহিল, ও কাজটা আমি বোধ হয় পেরে উঠ্‌বনা কারণ, হিঁদুয়ানীর জপ-তপ এবং ছুঁই ছুঁই করা বিদ্যেটা ছেলেবেলা থেকেই শিখে ওঠবার সুবিধে পাইনি।

স্ত্রীর কথায় ক্ষেত্রমোহন আজকাল প্রায়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন, এখন কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করি সহজ কণ্ঠে বলিলেন, তোমার অতিবড় দুর্ভাগ্য যে সুযোগ তুমি পাওনি। পেলে হয়ত এতবড় বিভ্রাট তোমার দাদার অদৃষ্টে আজ ঘটতনা। এই বলি তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

১৪

ভবানীপুরের সেই সুশৃঙ্খলিতা পরিবারকে পার করিবার চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হইল, শুধু বিভা এবং স্বামীর আন্তরিক বিরাগের ভয়ে তাহাতে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিলনা, কিন্তু প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি নানা প্রকারে দেখাইতে বিরত রহিলনা। ক্ষেত্রমোহন কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া ক্ষেত্রমোহন একদিন সোজাসুজি প্রশ্ন করিলে শৈলেশ অস্বীকার করিয়া সহজ ভাবে কহিল, জীবনের অধিকাংশই ত গত হয়ে গেল ক্ষেত্র বাকি ক'টা দিনের জন্যে আর-নতুন ঝঞ্ঝাট মাথা নিতে ভরসা হয়না। সোমেন আছে, বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ কর তোমরা সে বেঁচে থাক, এ সবে আমা আর কাজ নেই।

মানুষের অকপট কথাটা বুঝা যায়, ক্ষেত্রমোহন মনে মনে আজ বেদনা বোধ করিল। ইহার পরে হইতে সে আদালতের ফেরৎ প্রায়ই আসিতে লাগিল গৃহে গৃহিণী নাই, সন্তান নাই; গোটা তিনেক চাকর মিলিয়া সংসার চালাইতেছে,—দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাড়ীটা এমনি বিশৃঙ্খল ছন্ন-ছাড়া মূর্ত্তি ধারণ করিল যে ক্লেশ অনুভব না করিয়া পারা যায় না প্রায় মাসাধিক কাল পরে সে সেই কথার পুনরুত্থাপন করিয়া কহিল, তুমি ত মনের কথা আমার জানো শৈলেশ, কিন্তু কেউ একজন বাড়ীতে না থাকলে বাঁচা কঠিন। বিশেষ বুড়ো বয়সে

...আজ উপস্থিত ছিল, সে বলিল, বুড়ো বয়সের এখনো ঢের দেরি, এবং তার ঢের আগেই বউদি এসে হাজির হবেন। বাপ করে মা'র বে আর কতকাল বাপের-বাড়ী থাকে? এই বলিয়া সে একবার দাদার মুখের প্রতি ও একবার শৈলেশের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু দু'জনের কেহই জবাব দিলনা। বিশেষতঃ, শৈলেশের মুখ যেন সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু, উমা চাহিয়াই আছে দেখিয়া সে কিছুক্ষণ পরে শুধু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, তিনি আর আসবেননা।

উমা অত্যন্ত অবিশ্বাসে জোর করিয়া বলিল, নিশ্চয় আসবেন না? হয়ত এই মাসের মধ্যেই এসে পড়তে পারেন। হাঁ দাদা, পারেননা?

ফিরিয়া আসা যে কত কঠিন দাদা তাহা জানিতেন। যাবার পূর্ব্বে শৈলেশের মুখের প্রত্যেক কথাটি তাঁহার বুকে গাঁথা হইয়াছিল, উমা কোনদিন যে সে সকল বিস্মৃত হইতে পারিবে তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। বন্ধুর প্রতি শৈলেশের পিতা অপরিসীম অবিচার করিয়াছে; ফিরিয়া আসার পরে বিজ্ঞ উপাধ্যায়ে বহুবিধ অপমান করিয়াছে এবং তাহার ... করিয়াছে শৈলেশ নিজে, তাহার ... দিকে। তথাপি হিন্দু নারীর শিক্ষা ও সংস্কার, স্নিগ্ধ উমার মধুর চরিত্রের সহিত মিলাইয়া তাহার স্বামি-গৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়াটা ক্ষেত্রমোহন কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিতনা। এই কথা মনে করিয়া তাহার যখনই কষ্ট হইত, তখনই এই বলিয়া সে আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিত যে, উমা নিজের প্রতি অনাদর অবহেলা সহিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যখন তাহার ধর্ম্মাচরণে বাধা দিল সে আঘাত সে সহিলনা। বোধ করি এই জন্যই বহুদিন পরে একদিন যখন তাহার স্বামি-গৃহে ডাক পড়িল তখন এতটুকু দ্বিধা এতটুকু অভিমান করে নাই, নিঃশব্দে এবং নির্বিচারে ফিরিয়া আসিয়াছিল। হিন্দু-রমণীর এই ধর্ম্মাচরণ রীতির সহিত সংস্কার-মুক্ত ও আলোক-প্রাপ্ত ক্ষেত্রমোহনের বিশেষ পরিচয় ছিলনা, এখন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করিয়া আর একজনের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আপনাকে বঞ্চিত করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার নিজেদের সমস্ত সমাজটাকেই যেন ক্ষুদ্র ও হীন মনে হইত। সে মনে মনে বলিত, এতখানি ধর্ম্মের তেজ ত আমাদের কোন মেয়ের মধ্যেই নাই। তাহার আশঙ্কা হইত বুঝি এই সত্যকার বস্তুটিই তাহাদের মধ্যে হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া গেছে। যে বিশ্বাস আপনাকে পীড়িত করিয়া পিছাইয়া দাঁড়ায়না, প্রকাণ্ড গভীরতা যাহার দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে দিয়া আপনাকে যাচাই করিয়া লয়, এ বিশ্বাস কই তাহার? কই উমার? আরও সে তো অনেককেই জানে, কিন্তু কোথায় ইহার তুলনা? ইহারই অনুভূতি একদিকে সঙ্কোচ ও আর একদিকে ভক্তিতে তাহার সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ করিয়া দিতে থাকিত। কারণ এই কয়টা দিনের মধ্যেই স্বামীকে যে উষা কতখানি ভালবাসিয়াছিল এ কথা ত তাহার অবিদিত ছিলনা! আবার পরক্ষণেই যখন মনে হইত, সমস্ত ভাসিয়া গিয়া এতবড় কাণ্ড ঘটিল কিনা শুধু একজন মুসলমান ভৃত্য লইয়া—যে আচার সে পালন করেনা, বাটীর মধ্যে তাহারই পুনঃ প্রচলন একেবারে তাহাকে বাড়ীছাড়া করিয়া দিল! অপরে যাই কেন না করুক, কিন্তু বৌ-ঠাকরুণকে স্মরণ করিয়া ইহারই সঙ্কীর্ণ তুচ্ছতায় এই লোকটি যেন একেবারে বিস্ময় ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়া পড়িত।

উমা প্রশ্ন করিয়া মুখপানে চাহিয়াই ছিল, জবাব না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, হাঁ দাদা বল্‌লেনা?

কি রে?

উমা কহিল, বেশ! আমি বল্‌ছিলুম বৌদি হয়ত এই মাসেই ফিরে আসতে পারেন। তোমার মনে হয়না দাদা?

ভগিনীর প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, যদি ধরাই যায় তিনি আসবেননা, বহুকাল তাঁর না এসেই কাটছিল, বাকিটাও না এসে কাটতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি অন্য উপায় নেই? আমি সেই কথাই বল্‌চি।

উমা ঠিক বুঝিলনা, সে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

শৈলেশ তাহার বিস্মিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাঁর ফিরে আসা আমি সঙ্গত মনে করিনে উমা। তিনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, কিন্তু সহধর্ম্মিণী তাঁকে আমি বল্‌তে পারিনে।

উমার বিরুদ্ধে এই অভদ্র ইঙ্গিতে ক্ষেত্রমোহন মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, ধর্ম্মই নেই আমাদের তা আবার সহধর্ম্মিণী! ওসব উচ্চাঙ্গের আলোচনায় কাজ নেই ভাই, আমি সংসার চালাবার মত একটা ব্যবস্থা প্রস্তাব করচি।

শৈলেশ গভীর বিস্ময়ে কহিল, ধর্ম্ম নেই আমাদের?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, কোন্‌খানে আছে দেখাও?

রক্তিবার করি, খাই-দাই থাকি, ব্যস্। আমাদের সহধর্ম্মিণী না হলেও চলে। অবশ্য তাঁর লোকের ছিল শ্রাদ্ধ-শান্তি, পূজো-পাঠ, ব্রত-নিয়ম, ধর্ম্ম নিয়েই মত্তে থাক্তো, তাদের ছিল সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন। আমাদের অত বায়নাক্কা কিসের?

শৈলেশ মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, সহধর্ম্মিণী ভাই! শ্রাদ্ধশান্তি পূজোপাঠ—

কথা তাহার শেষ হইলনা, ক্ষেত্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাই তাই তাই, তা ছাড়া আর কিছু নয়! তুমিও হিঁদু, আমিও হিঁদু—without offence—পূজোও করিনে, মন্দিরেও যাইনে, কেষ্ট বিষ্টুকে ধরে খোঁচাখুঁচি করার কু-অভ্যাসও আমাদের নেই—মেয়েরাত আরও harmless, আমরা সহজ মানুষ—লোক ভাল। কি হবে ভাই আমাদের অত বড় পাঁচ সাতটা অক্ষরের সহধর্ম্মিণী নিয়ে, ছোট্ট একটু স্ত্রী হলেই আমাদের খাসা চলে যাবে। তুমি ভাই দয়া করে একটু রাজী হও—ভবানীপুরের ওঁরা ভারি ধরেছেন,—তোমার বোন্‌টিরও ভয়ানক ইচ্ছে, কথাটা রাখো শৈলেশ।

শৈলেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি আমাকে বিদ্রূপ কোরচ ক্ষেত্র।

ব্যাপার দেখিয়া উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষেত্রমোহন ভীত হইয়া বারবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, না ভাই শৈলেশ, না। যদি ওরকম কিছু করেও থাকি, তোমার চেয়ে আমাকেই আমি বেশি করেছি।

শৈলেশ প্রতিবাদ করিলনা, কেবল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

১৩

কথাটাকে আর অধিক ঘাঁটা-ঘুঁটি না করিয়া ক্ষেত্রমোহন শৈলেশের ক্রোধ ও উত্তেজনাকে শান্ত হইবার পাঁচ-সাত দিন সময় দিয়া আর একদিন ফিরিয়া আসিয়া তখন ভবানীপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, ইহাই স্থির করিয়া সে উমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু সপ্তাহ গত না হইতেই ছাপরা কোর্টে হঠাৎ একটা মকদ্দমা পাওয়ায় তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে প্যাত্রী-পক্ষ ও পাত্র-পক্ষের তরফে বিভাকে আশা দিয়া গেল যে, কেস যতটা হোপ্‌লেস মনে হইতেছে, বস্তুতঃ, তাহা নয়। বরঞ্চ, মাছ চারের দিকেই ঝুঁকিয়াছে, হঠাৎ টোপ গিলিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নয়।

অনেকদিন পরে স্ত্রীর সহিত আজ তাহার সদ্ভাবে বাক্যালাপ হইল। উমার মুখে বিভা কিছু কিছু ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, আমি মনে করতুম উমা বৌদিদির তুমি পরম বন্ধু, তুমি যে আবার দাদার বিয়ের উদ্যোগ করতে পারো, কালকারের আগে এ কথা আমি ভাব্‌তেও পারতুমনা।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, মাসখানেক পূর্ব্বে কি আমিই ভাব্‌তে পারতুম? কিন্তু এখন শুধু ভাবা নয়, উচিত বলেই মনে হয়। উমা বৌঠাকরুণের বন্ধু আমি এখনও, এবং চিরদিন তাঁর শুভ কামনাই কোর্‌ব, কিন্তু যা' হবার নয়, হয়ে লাভ নেই, তার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেই বা ফল কি!

বিভা অতি-বিজ্ঞের চাপা-হাসি দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, তোমরা পুরুষ মানুষ বলেই বোধ হয় বৌ-ঠাকরুণটিকে বুঝতে এত দেরি হল, আমি কিন্তু দেখ্‌বামাত্রই তাঁকে চিনেছিলুম। ওঁকে নিয়ে আমরা চল্‌তে পারতুমনা।

ক্ষেত্রমোহন কহিল, সে তো চোখেই দেখ্‌তে পেলুম বিভা, তাঁকে সরে পড়তে হল। এবং, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে বোঝবার পার্থক্য ঘটেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একটু অন্য রকমের হলে জিনিষটা কি দাঁড়াতো এখন সে আলোচনা বৃথা। তবে, এ কথা তোমার মানি, ভুল আমার একটু হয়েছিল।

বিভা কহিল, যাক্‌, তা' হলেই হ'ল। ... আর হিঁদুয়ানীর সুখ্যাতিতে হঠাৎ যে রকম মেতে উঠেছিলে, আমার ত ভয় হয়েছিল। আমরা মুসলমান খৃষ্টান নই, কিন্তু নিজে ছাড়া সবাই ছোঁট হাতে খেলে-ছুঁলেই জাত যাবে 'এ দর্প কেন? ও ভটচাযিগিরি ছাড়া আর সব রাস্তাই নরকে যাবার এ ধারণা তাঁর বাপের বাড়ীতে চল্‌তে পারে, কিন্তু এখানে পারেনা। আর, পারেনা বলেই ত স্বামীর আশ্রয়ে তাঁর স্থান হলনা।

কথাটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। এমন করিয়া সত্যমিথ্যায় জড়ানো বলিয়া ক্ষেত্রমোহন নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিলনা।

এই সময়ে উমা ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

বিভা তাহার নিজের কথার সূত্র ধরিয়া কহিতে লাগিল, শুধু আপনার জাত বাঁচিয়ে যাওয়াটাই কি বৌদিদির সবচেয়ে বড় হ'ল? ধর, তোমার নালিশ যদি সত্যি হয়, আমার জন্যে দাদা যদি তাঁকে অপমান করেই থাকেন, তেমনি অপমান কি তাঁর দিকে ...

আমাকে করনি? তাই বলে কি তোমাকে ছেড়ে আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো? এই কি তুমি বল?

ক্ষেত্রমোহন কহিল, না, তা আমি বলিনে।

বিভা কহিল, বলতে পারোনা আমি জানি। উমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার দাদা হঠাৎ একটা নতুন জিনিসের বাইরেটা দেখেই মজে গিয়েছিলেন। হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামির শিক্ষা আমরা পাইনি, কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে যা' পেয়েছিলুম সে ঢের ভদ্র, ঢের সভ্য। একটু হাসিয়া কহিল, তোমার দাদার ভারি ইচ্ছে ছিল বৌ-ঠাকরুণের কাছ থেকে তুমি অনেক কিছু শেখো। বসে শোন্‌বার এখন সময় নেই ভাই, কিন্তু কি-কি তাঁর কাছে শিখ্‌লে আর কি-ই বা বাকি রয়ে গেল, তোমার দাদাকে না হয় শোনাও। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোট ভগিনীর সম্মুখে স্ত্রীর হাতের খোঁচা তাহাকে বেশি করিয়াই বিঁধিল, কিন্তু জবাব দিতে পারিলনা। হিন্দুয়ানীর অনেকখানি হইতেই তাহারা ভ্রষ্ট, কিন্তু মেয়েদের আচারনিষ্ঠা, সাবেক দিনের জীবন-যাত্রার ধারা কোনদিন তাহাকে অতিশয় আকর্ষণ করিত। এই জন্যই চোখের উপরে অকস্মাৎ উমাকে পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারই আচরণে আজ সকলের কাছে তাহার মাথা হেঁট হইয়া গেছে। এই বধূটিকেই কেন্দ্র করিয়া সে যে-শিক্ষা ও সংস্কারের কথা আত্মীয় পরিজন মধ্যে মেয়েদের কাছে সগর্বে বার বার বলিত, সেইখানেই তাহার অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। নিজের জন্য উমা নিজেই শুধু দায়ী, তাহার অন্যায় আর কিছুই স্পর্শ করে নাই,—করিতেই পারেনা এই কথাটা সে জোর দিয়া বলিতে চাহিলেও মুখে তাহার বাধিয়া যাইত। তাই স্ত্রী চলিয়া গেলে সে উমার কাছে কতকটা জবাব-দিহির মতই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, গোঁড়ামি সকল জিনিসেরই মন্দ, এ আমি অস্বীকার করিনে উমা,—হিন্দুয়ানীর ওই গলদটাই ঘুচানো চাই,—কিন্তু আমরা যে আরও মন্দ এ কথা অস্বীকার করলে ত আরও অন্যায় হবে।

দাদা ও বৌদিদির বাদ-বিতণ্ডার আলোচনায় উমা চিরদিনই মৌন হইয়া থাকিত, বিভার অনুপস্থিতিতেও তাই এখনও নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

সেই রাত্রে হাওড়া যাইবার পূর্বে ক্ষেত্রমোহন উমাকে ডাকিয়া কহিল, আমার ফিরতে বোধ করি চার পাঁচ দিন দেরি হবে, ইতিমধ্যে ভবানীপুরে ওঁদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়, বোলো, শৈলদাকে সম্মত করতে আমি পারবো।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল, বৌ-ঠাকরুণ তাহলে আর ফিরবেননা?

ক্ষেত্রমোহন বলিল, না। যতই ভাবছি মনে হচ্চে শৈলেশের চেয়ে তাঁর অপরাধই বেশি। তুমি ঠিক কথাই বলেচ। যে শিক্ষায় মানুষকে এত বড় সঙ্কীর্ণ এবং স্বার্থপর ক'রে তোলে, সে শিক্ষার মূল্য এককালে যতই থাক্ এখন আর নেই। অন্ততঃ, আমাদের মধ্যে তার আর পুনঃ প্রচলনের আবশ্যকতা নেই। তাই বটে। বৌ-ঠাকরুণের আচার-বিচারের বিড়ম্বনাই ছিল, বস্তু কিছু ছিলনা। থাকলে গৃহত্যাগ করতেনমা। আচ্ছা, চল্লুম। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া মোটরে গিয়া উপবেশন করিল।

মফস্বলের মকদ্দমা সারিয়া কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার পাঁচদিনের বদলে দিন দশেক বিলম্ব হইয়া গেল। বাটীতে পা দিয়া প্রথমেই দেখা মিলিল উমার। সেই খবর দিল যে, দিন দুই পূর্বে মাস ছয়েকের ছুটি লইয়া শৈলেশ বাবু আবার এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছেন। এবং সোমেনকেও স্কুল ছাড়াইয়া এবার সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন।

এমন হঠাৎ যে?

উমা কহিল, কি জানি। সোমেনকে নিতে এসেছিলেন, বললেন, শরীর ভাল নয়।

বিভা ঘরে প্রবেশ করিতে তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিল, শরীর ভাল না থাক্‌বারই কথা, কিন্তু সারবার ব্যবস্থা ও নয়। আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উমা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

১৬

আরও পাঁচটা জুনিয়র ব্যারিষ্টারের যে ভাবে দিন কাটে ক্ষেত্রমোহনের দিনও তেমনি কাটিয়া যাইতে লাগিল। হাতে টাকার টান্ পড়িলে হিন্দুয়ানী ও সাবেক চাল-চলনের অশেষ প্রশংসা করে, আবার অর্থাগম হইলেই চুপ করিয়া যায়,—যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলে। শৈলেশের সে বাস্তবিক শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহাকে চিনিত, তাহার মত দুর্বল প্রকৃতির মানুষকে দিয়া প্রায় সব কাজই করানো যায়, এই মনে করিয়া সে ভবানীপুর এখনও হাত-ছাড়া করে না নিজেদের এই বলিয়া ভরসা দিত যে, পশ্চিম ... ফিরে আসার যা বিলম্ব। বৌ-ঠাকরুণকে সে ...

পূর্ব্বে যেমনি স্নেহ ছিল, তেমনি শ্রদ্ধাই প্রায় এখনো শ্বশুর প্রতি আছে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কাজ নাই। যেখানে থাকুন, সুখে থাকুন, নিরাপদে থাকুন, ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটুক, কিন্তু শৈলেশের গৃহস্থালীর মধ্যে আর নয়। নিজের একটা ভুল এখন প্রায়ই মনে হয়, স্বামীকে উষা ভালবাসিতে পারে নাই, আর তাও কখনো সম্ভব নয়। ছেলেবেলা হইতে কড়া রকমের আচার-বিচারের ভিতর দিয়া ধাতটা তাহার কড়া হইয়াই গেছে, সুতরাং ইহকালের চেয়ে পরকালই তাহার বেশি আপনার; স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াও তাই এত সহজ হইয়াছে। তাহার নিজের মধ্যে যে স্বামী ছিল, উষার এই আচরণে সে যেমন ভীত, তেমনি ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার মনে হইত সোমেনকে যে সে এত সত্বর ভালবাসিয়াছিল, সেও কেবল সম্ভবপর হইয়াছিল তাহার কড়া কর্ত্তব্যের দিক দিয়া। সত্যকার স্নেহ নয় বলিয়াই যাবার দিনটিতে তাহার কোথাও কোন টান্ লাগে নাই।

এমনি ভাবেই যখন কলিকাতায় ইহাদের দিন কাটিতেছিল, তখন মাস দুই পরে সহসা এলাহাবাদ হইতে খবর আসিল যে, সোমেনের এই কচি বয়সেই শৈলেশ তাহার পৈতা দিয়াছে, এবং নিজে এক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্জামান একটা দিনের জন্যও পিতা পুত্রের বাদ যাইবার যো নাই, এবং মাছ-মাংস যে পাড়ায় আসে সে পথ দিয়া শৈলেশ হাঁটেনা।

শুনিয়া উমা চুপি চুপি হাসিতে লাগিল, বিভা কহিল, তামাসাটি কে করলেন? যোগেশবাবু?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, খবর যোগেশবাবুর কাছ থেকেই এসেছে সত্যি, কিন্তু তামাসা করবার মত ঘনিষ্ঠতা ত তাঁর সঙ্গে নেই।

বিভা কহিল, দাদার বন্ধু ত, দোষ কি? একটু থামিয়া বলিল, কেন জানো? বৌদিদির সমস্ত ব্যাপার দাদার কাছেই শুনেছেন, এবং এত লোকের মাঝখানে তুমিই শুধু তাঁর গোঁড়ামির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে,—তাই এ রসিকতাটুকু তোমার পরেই হয়েছে। সহাস্যে বলিতে লাগিল, কেস্ আরম্ভ করবার মাঝে মাঝে বুদ্ধিটা যদি আমার কাছে নাও ত মকদ্দমা বোধ হয় তোমাকে এত হারতে হয়না। হইতেছে,—একটু চট্ পট্ তৈরি হয়ে নাও, সন্ধিটার দিকেই উঠতে না পারলে কিন্তু লাবণ্য রাগ করবে। ছিছিছি দাদাটিকে আড়ালে ডেকে একটু বলে দিয়ো ভাই, ঠেকলে যেন এখন থেকে কম করেন। পয়সা যারা দেয় তারা খুসি হবে।

উমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গে... যোগেশবাবুর হঠাৎ ঠাট্টা করার হেতুটা যে বৌদি... ঠিক অনুমান করিয়াছেন তাহা সে বুঝিল।

ইহার দিন পাঁচ ছয় পরে, একখানা ... চিঠি আনিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দি... কহিলেন, যোগেশবাবুর বাবার লেখা। ব... সোত্তর-বায়াত্তর—চাক্ষুষ আলাপ নেই, চিঠি-পত্রে... পরিচয়। লোক কেমন ঠিক জানিনে, তবে এ... ঠিক জানি যে ঠাট্টার সুবাদ আমার সঙ্গে ... নেই।

দীর্ঘ পত্র, বাঙলায় লেখা। আদ্যোপান্ত ... দুই নিঃশব্দে পড়িয়া বিভা মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপ... কি? তোমাকে ত একবার যেতে হয়?

কিন্তু আমার ত একমিনিটের সময় নেই।

বিভা কহিল, সে বল্‌লে হবেনা। এ বিপ... আমরা না গেলে আর যাবে কে? এ চিঠির অর্দ্ধেক... যদি সত্যি হয়, সে যে ঘোরতর বিপদ তাতে... আর একবিন্দু সন্দেহ নেই!

ক্ষেত্রমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, ... বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু যাই ... করে? এবং গেলেই যে বিপদ কাটবে তারই ... ঠিকানা কি!

দু'জনে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলে... অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষেত্রমো... কহিলেন, শৈলেশের দ্বারা সমস্তই সম্ভব। ম... জোর বলে যে বস্তু, সে তার একেবারে নে... মরুকগে সে, কিন্তু দুঃখ এইটুকু যে, সঙ্গে ... ছেলেটাকেও সে বিগড়ে তুলচে। যেমন করে পা... এইখানে তোমার বাধা দেওয়া চাই।

বিভা বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহি... সে কান্না-কাটি, অভিমান সমস্তই করিতে পা... কিন্তু ঠেকাইবার সাধ্য তাহার নাই, তাহা সে ... মনে জানিত। ক্ষেত্রমোহন অনেকক্ষণ স্থির... থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, সন্দেহ আ... বরাবরই ছিল, কিন্তু একটি জিনিস আমি নি... ধরেছি বিভা। উষাকে তোমার দাদা সত্... ভালবেসেছিল। এত ভাল সে সোমে... মাকে কোনদিন বাসেনি। এ সব হয়ত তা... প্রতিক্রিয়া।

বিভা রাগ করিল। কহিল, তাই, এমনি করে তাঁর মন পাবার চেষ্টা করচেন? দেখ, ...

আমার দুর্বল হতে পারেন, কিন্তু ইতর ন'ন। কারও জন্যেই এই সঙ্ সাজার ফন্দি তাঁর মাথায় আস্‌বেনা।

এই প্রতিক্রিয়া বস্তুটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার বিভা তাহার কি জানে? শব্দটা শুধু ক্ষেত্রমোহন বইয়ে পড়িয়াছে: সেও ইহার বিশেষ কিছু জানেনা, তাই স্ত্রীর ক্রোধের প্রত্যুত্তরে সে চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে তর্ক-যুদ্ধ চালাইতে তাহার সাহস হইলনা।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া যাই হোক্ কাজের বেলায় বিভাই জয়ী হইল। স্বামীকে দিন দু'য়ের মধ্যেই কাজ-কর্ম ফেলিয়া এলাহাবাদ রওনা হইতে হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি অপ্রিয়। যোগেশবাবুর বাটীর কাছেই বাসা, কিন্তু, শৈলেশের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সে গুরু-ভাইদের সহিত শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম দর্শনে বৃন্দাবনে গিয়াছে, দেখা হইয়াছে সোমেনের সঙ্গে। তাহার শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মচারীর বেশ, শাস্ত্রসঙ্গত আচার বিচার, স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া সকাল সন্ধ্যায় ঠিক করি ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখাইয়া যান—এই বলিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমাকে দেখে সে বেচারার দু'চোখ ছল্‌ছল্ করতে লাগলো, তার চেহারা দেখে মনে হল যেন খাবার কষ্টটাই তার বেশি হয়েছে।

এই ছেলেটির প্রতি বিভার এক প্রকারের স্নেহ ছিল, তাহা অত্যন্ত বেশি না হইলেও বিদেশে দুঃখ পাইতেছে শুনিয়া, সে সহিতে পারিলনা। তাহার নিজের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তাকে জোর করে নিয়ে এলেনা কেন?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, ইচ্ছে যে হয় নি তা' নয়, কিন্তু ভেবে দেখলুম তাতে শেষ পর্য্যন্ত সুফল ফল্‌বেনা। ধর্ম্মের ঝোঁকটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি। শৈলেশ আমাদের ওপর ঢের বেশি বেঁকে যেতো।

বিভা চোখ মুছিয়া কহিল, এত ব্যাপার ঘটেছে, জান্‌লে আমি নিজেই তোমার সঙ্গে যেতুম।

১৭

চিঠি লেখা লেখি একপ্রকার বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, তথাপি কলিকাতায় আত্মীয় বন্ধুমহলে শৈলেশের অদ্ভুত কীর্ত্তি কথা প্রচারিত হইতে বাধে নাই। [illegible] বা স্থানে স্থানে বিবরণ একটু ঘোরালো হইয়াই রটিয়াছিল। ভবানীপুরে এ সংবাদ যে গোপন ছিলনা তাহা বলাই বাহুল্য। লজ্জায় বিভা মুখ দেখাইতে পারিতনা, শুধু স্বামীর কাছে সে দম্ভ করিয়া বলিত, দাদা আগে ফিরে আসুন। আমার সুমুখে কি কোরে এ-সব করেন আমি দেখবো!

ক্ষেত্রমোহন চুপ করিয়া থাকিতেন। বিভার দ্বারা বিশেষ কিছু যে হইবে তাহা বিশ্বাস করিতেননা, কিন্তু সমাজের সমবেত মর্য্যাল প্রেসরের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল দুর্ব্বল চিত্ত শৈলেশ হয়ত তাহা বেশি দিন ঠেকাইতে পারিবে না, এ ভরসা তিনি করিতেন।

এদিকে শৈলেশ আরও মাস-চারেক ছুটি বাড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাও শেষ হইতে আর মাস দুই বাকি চাকরি ছাড়িতে সে পারিবেনা, তাহা নিশ্চয় গঙ্গাস্নান ও ফোঁটা-তিলক যতই কেননা সে প্রয়াগে বসিয়া করুক, শ্রীগুরু ও গুরু-ভাইয়ের দল এ কুমৎলব তাহাকে প্রাণ গেলেও দিবেনা। তারপরে ফিরিয়া আসিলে একবার লড়াই করিয়া দেখিতে হইবে।

সেদিন চা খাইতে বসিয়া ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, এবার কিন্তু উষা বৌঠাকরুণ এলে তাঁকে তাড়াতাড়ি ভাইকে ডাকিয়ে, আর বাপের বাড়ী পালাবার ফন্দি করতে হবেনা। জপ-তপের মধ্যে দু'জনের বন্‌বে

বিভার মুখ মলিন হইল, জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আসার কথা তুমি শুনেচ নাকি?

না।

বিভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, পাড়াগাঁয়ে শুনেচি নানারকমের তুক্‌তাক আছে, আচ্ছা, তুমি বিশ্বাস কর?

ক্ষেত্রমোহন হাসিয়া কহিল, না। যদিও বা থাকে, তিনি এ সব করবেননা।

কেন করবেননা?

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, বৌঠাকরুণের ওপর [illegible] খুসি নই, তাঁর প্রতি আমার সে শ্রদ্ধাও আর নেই, কিন্তু এই সব হীন কাজ যে তিনি করতেই পারেননা তা' তোমাকে আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি।

বিভা ঠিক বিশ্বাস করিলনা। শুধু ধীরে ধীরে কহিল, যা ইচ্ছে হোক্, কিন্তু ছেলেটাকে আমি কেড়ে আন্‌বই, তোমাকেও আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌লুম।

বেহারা আসিয়া খবর দিল, বন্ধু দু'খানা বড় কার্পেট চাহিতে আসিয়াছে। বন্ধু শৈলেশের অনেক দিনের ভৃত্য, বিভা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সে কার্পেট নিয়ে কি করবে? বলিতে বলিতে উভয়েই বাহিরে আসিতেই বন্ধু সেলাম করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল।

কার্পেট হবে কি বন্ধু?

কি জানি মেমসাহেব, গান-বাজনা না কি হবে।

করবে কে ?

সাহেবের সঙ্গে তিন-চার জন লোক এসেছে, করবে বোধ হয় তারাই।

দাদা এসেছেন ?

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, শৈলেশ এসেছে ?

বন্ধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কাল রাত্রে সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। কার্পেট লইয়া সে প্রস্থান করিলে দু'জনেই নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই দিনটা কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া ক্ষেত্রমোহন পরদিন বিকালে বিভা ও উমাকে সঙ্গে করিয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্যাসমত নীচের লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পড়িল। দরজার সেই ভারি পর্দাটা নাই, ভিতরের সমস্তই চোখে পড়িল। একটা দিনেই বাড়ীর চেহারা বদলাইয়া গেছে। বইয়ের আলমারিগুলা আছে বটে, কিন্তু আর কোন আসবাব নাই। মেঝের উপর কম্বল ও তাহাতে ফর্সা জাজিম পাতিয়া জন দুই লোক নধর পরিপুষ্ট দেহের সর্ব্বত্র হরিনামের ছাপ মারিয়া, গলায় মোটা-মোটা তুলসীর মালা পরিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ সাহেব মেম দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের বিশ্রামে বিঘ্ন না ঘটাইয়া তিনজনে উপরে যাইতেছিলেন, দাঁড়িয়া পাচক-ব্রাহ্মণ নিষেধ করিয়া কহিল, উপরের ঘরে গোঁসাইনি আছেন।

গোঁসাইনিটা কে ?

পাচক ঠাকুর চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কোথায় ?

উত্তরে সে উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলে, ক্ষেত্রমোহন সেইখানে দাঁড়াইয়া শৈলেশ, শৈলেশ করিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ছুটিয়া আসিল সোমেন। হঠাৎ তাহার বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া বিভা কাঁদিয়া ফেলিল। পরণে সাদা থান, মাথায় মস্ত টিকি, গলায় তুলসীর মালা, সে দূর হইতে প্রণাম করিল, কিন্তু কাছে আসিল না। উমা ধরিতে যাইতেছিল, ক্ষেত্রমোহন ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক্ অ-বেলায় আর ছুঁয়ে কাজ নেই। ও-বেচারাকে হয়ত আবার নাইয়ে দেবে। বাবা কোথায় সোমেন ?

সোমেন কহিল, প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের কাছে বসে শ্রীভাগবত পড়চেন!

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম, শ্রীবাবাকে একবার খবরটা দাও।

তিনি খবর পেয়েছেন, আস্‌ছেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে খড়ম-পায়ে শৈলেশ নীচে আসিল। থান কাপড়, গায়ে জামা, মাথায় একটা সরু গোছের টিকি ছাড়া বাহিরের চেহারায় তাহা বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু ভিতরের দিকে যে অনেক বদল হইয়া গেছে তাহা চক্ষের পলকে চোখে পড়ে। অত্যন্ত বিনীত ভাব, মৃদু কথা,— উমা ও বিভা প্রণাম করিলে সে দূরে দাঁড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিল, স্পর্শ করিতে নিকটে আসিলনা।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বাড়ীতে একটু বসবার যায়গাও নেই নাকি হে ?

শৈলেশ লজ্জিত ভাবে কহিল, বাইরের ঘরটা নোঙ্‌রা হয়ে আছে,—পরিষ্কার করে নিতে হবে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তা'হলে এখনকার মত আমরা বিদায় হই। সোমেনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এখন চল্‌লুম। আমাদের বোধ হয় আর বড় একটা প্রয়োজন হবেনা, তবু বলে যাই বস্‌বার যায়গা যদি কখনো একটা হয় ত, খবর দিস্ বাবা! চল।

শৈলেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ীতে বিভা কাহারও সহিত একটা কথা কহিল না, তাহার দু'চক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া শুধু জল পড়িতে লাগিল। একটা কথা তাঁহারা নিঃসংশয়ে বুঝিয়া আসিলেন ও-বাড়ীতে তাঁদের আর স্থান নাই। দাদা যা'ই কেননা করুক, সোমেনকে সে জোর করিয়া কাড়িয়া আনিবে বলিয়া বিভা স্বামীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। মেয়ের সেই দাম্ভিক উক্তি স্বামি-স্ত্রীর উভয়েরই বার-বার মনে পড়িল, কিন্তু, নিদারুণ লজ্জায় ইহার আভাস পর্য্যন্তও কেহ উচ্চারণ করিতে পারিলনা।

ইহার পরে মাসাধিক কাল গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে কথাটা আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু-সমাজে এমন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে যে, লোকে সত্যের মধ্যেও আর যেন আবদ্ধ থাকিতে চাহেনা। মুখে মুখে অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া সমস্ত জিনিসটা এমন কুৎসিত আকার ধারণ করিয়াছে যে, কোথাও যাওয়া আসাও বিভার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, অথচ কোনদিকে কোন রাস্তাই কাহারও চোখে পড়িতেছেনা। ক্ষেত্রমোহন জানিতেন, সংসারে অনেক উত্তেজনাই কালক্রমে ম্লান হইয়া আসে, ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইয়া থাকাই তাহার উপায়, কিন্তু এই পরকালে লোভের ব্যবসাটাই একবার সুরু হইয়া গেলে আর সহজে থামিতে চাহেনা। অনিশ্চিতের

পথে এই অত্যন্ত সুনিশ্চিতের আশাই মানুষকে পাগল করিয়া যেন নিরন্তর ঠেলা দিয়া চালাইতে থাকে। ইহার উপরেও প্রচণ্ড বিভীষিকা উষা। বন্ধু ও শত্রুভাবে সর্বনাশের বনিয়াদ গাড়িয়া গেছে সে-ই। কোন মতে একটা খবর পাইয়া যদি আসিয়া পড়ে ত অনিষ্টের বাকি কিছু আর থাকিবে না। কেবল বিভাই নয়, তাহার উল্লেখে উষার, এমন কি ক্ষেত্রমোহনেরও আজ-কাল গা জ্বলিতে থাকে। বাস্তবিক, তাহাকে না আনিলে ত এ-ব্যাপাই কোন দিনই ঘটার সম্ভাবনা ছিলনা।

আজ রবিবারের সকাল বেলা স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া এই আলোচনাই করিতেছিলেন। সেই অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসার দিন হইতে ইঁহারা সে-মুখোও আর হন নাই, কিন্তু সে-বাড়ীর খবর পাইতে বাকি থাকিতনা। গুরু-ভ্রাতার দল অদ্যাবধি নড়িবার নামটি পর্যান্ত মুখে আনেন না এবং শ্রীগুরু ও গোঁসাই ঠাকুরাণী উপরের ঘরে তেমনি কায়েম হইয়াই বিরাজ করিতেছেন। সকাল-সন্ধ্যায় নাম-কীর্ত্তন অব্যাহত চলিয়াছে, ভোগাদির ব্যবস্থাও ক্রমশঃ উত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, এ সকল সংবাদ ঝি-চাকরের মুখে নিয়মিত ভাবেই বিভার কাণে পৌঁছে; কেবল অতিরিক্ত একটা কথা সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা জায়গা লইয়া শৈলেশ গুরুদেবের আশ্রম তৈরি করার সঙ্কল্প করিয়াছে, এবং এই হেতু অনেক টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছে।

বিভা মলিন মুখে কহিল, যদি সত্যই হয়, দাদাকে কি একবার বাঁচাবার চেষ্টাও করবেনা? ছেলেটা কি চোখের সামনে ভেসেই যাবে?

ক্ষেত্রমোহন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি করতে পারি বল?

বিভা চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া কি হইতে পারে সে তাহার কি জানে?

ক্ষেত্রমোহন সহসা বলিয়া উঠিলেন, সেই পর্য্যন্ত ত আর কখনো যাইনি, আজ চলনা একবার যাই?

বিভার বুকের মধ্যেটা আজ সত্যই কাঁদিতেছিল, তাই বোধ হয় আজ তথায় মান-অভিমানের স্থান হইলনা, সহজেই সম্মত হইয়া বলিল, চল।

উষাকে আজ তাহারা সঙ্গে লইলনা। এই মেয়েটির সম্মুখে লজ্জার মাত্রাটা আজ আর তাহাদের বাড়াইবার প্রবৃত্তি হইলনা। মোটর যখন তাহাদের শৈলেশের বাটীর সুমুখে আসিয়া থামিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়া গেছে। বাহিরের ঘরটা আজ খোলা, গুরু-ভাই যুগল মেঝের উপরে বসিয়া একটা বড় পুঁটুলি কসিয়া বাঁধিতেছেন। ক্ষেত্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, শৈলেশবাবু বাড়ী আছেন?

তাঁহারা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিয়া শেষে উত্তর দিলেন, না, তিনি পরশু গেছেন নবদ্বীপ ধামে।

কবে ফিরবেন?

কাল কিম্বা পরশু সকালে।

বাবুর ছেলে বাড়ীতে আছে?

তাঁহারা উভয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, আছে, এবং তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেলেন।

অতঃপর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দু'জনের একসঙ্গেই চোখে পড়িল লাইব্রেরি-ঘরের দ্বারে সেই পুরানো ভারি পর্দ্দাটা আজ আবার ঝুলিতেছে একটু ফাঁক করিতেই চোখে পড়িল পূর্ব্বের আসবাব-পত্র যথাস্থানে সমস্তই ফিরিয়া আসিয়াছে। বিভা কহিল, ওই দু'টো লোককে সরিয়ে দিয়ে দাদা আবার ঘরটার শ্রী ফিরিয়েছেন। এটুকু সুবুদ্ধিও যে তাঁর আর কখনো হবে আমার আশা ছিলনা। কিন্তু বলা তাহার শেষ না হইতেই সহসা পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। সোমেন বাহিরে কোথাও গিয়াছিল, রবারের একটা বল লুফিতে-লুফিতে আসিতেছে। কোথায় বা মালা, কোথায় বা টিকি, আর কোথায় বা তাহার ব্রহ্মচারীর বেশ। খালি গা, কিন্তু পরণে চমৎকার লালপেড়ে জরি-বসানো ধুতি,—মাথার চুল বাঙ্গালী-ছেলেদের মত পরিপাটি করিয়া ছাটা, পায়ে বার্ণিস-করা পাম্পশু। সে ছুটিয়া আসিয়া বিভাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, মা এসেছেন পিসিমা, রান্নাঘরে রাঁধচেন, চল—এই বলিয়া সে টানিতে লাগিল।

বিভা স্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, মা এসেছেন, না সোমেন? তাই ত বলি—

কাল দুপুর বেলা এসেছেন। চলুন পিসেমশাই রান্নাঘরে।

চল।

তিনজনে রন্ধনশালার সুমুখে আসিতেই ঊষা সাড়া পাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিভা পায়ের জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল। কহিল, কি কাণ্ড হয়েছে দেখ্‌লে বৌদি?

ঊষা হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল। হাসিয়া কহিল, দেখ্‌লুম বই কি ভাই। ছেলেটার আকৃতি দেখে কেঁদে বাঁচিনে! তাড়াতাড়ি

মালা-ফালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নাপ্তে ডাকিয়ে চুল কেটে দিই, নতুন কাপড়, জামা, জুতো কিনে আনিয়ে পরিয়ে তবে তার পানে চাইতে পারি। আচ্ছা, আপনিই বা কি করছিলেন, বলুন ত? এই বলিয়া সে কটাক্ষে ক্ষেত্রমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বল্‌বার তাড়া-হুড়ো নেই, বউঠাকরুণ, ধীরে-সুস্থে সমস্তই বল্‌তে পারবো, এখন ওপরে চলুন, আগে কিছু খেতে দিন। ভাল কথা, গুরু ভাই দু'টি ত দেখ্‌লুম বাইরে বসে পুঁটুলি কস্‌চেন, কিন্তু শ্রীপ্রভুপাদ যুগল-মূর্ত্তির কি করলেন? ওপরে তাঁরা ত নেই?

উষা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না, ভয় নেই, তাঁ
নবদ্বীপ ধামে গেছেন।

বলি, ফিরে আবার আস্‌চেন না ত?

উষা তেম্‌নি মৃদু হাসিয়া শুধু কহিল, না।

ক্ষেত্রমোহন কহিলেন, বৌঠাক্‌রুণ, আপনার
এরূপ সুবুদ্ধি হবে এ তো আমাদের স্বপ্নের অগোচর
ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-কুমারের স্বহস্তে তুলসী মালা ছিঁ
দিয়ে, টিকি কেটে দিয়ে,—এ সব কি বলুন ত?

উষা হাসিমুখে ক্ষেত্রমোহনের কথা ফিরাই
দিয়া কহিল, বেশ ত, বল্‌বার তাড়া-হুড়ো!
জামাইবাবু! ধীরে-সুস্থে বল্‌তে পারবো। এখ
ওপরে চলুন, আগে কিছু আপনাদের খেতে দিন

সমাপ্ত

ষোড়শী

[নাটক]

[পঞ্চম সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নাট্যমন্দির কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয়-রজনী শনিবার,—২১শে শ্রাবণ ১৩৩৪

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

জীবানন্দ চৌধুরী	...	...	
প্রফুল্ল রায়	...	...	জীবানন্দের সেক্রেটারী
এককড়ি নন্দী	...	...	গমস্তা
জনার্দ্দন রায়	...	...	মহাজন
নির্ম্মল বসু	...	...	ব্যারিষ্টার
শিরোমণি	...	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
তারাদাস চক্রবর্ত্তী	...	...	ষোড়শীর পিতা
সাগর সর্দ্দার	...	...	ষোড়শীর অনুচর

পূজারী, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্‌স্‌পেক্টার, সব্‌-ইন্‌স্‌পেক্টার, বল্লভডাক্তার, ফকির, হরিহর, বিশম্ভর, ভিক্ষুকদ্বয়, মহাবীর, বেহারা, ভৃত্য, পথিক, গাড়োয়ান, পাইক ইত্যাদি

স্ত্রী

ষোড়শী	...		গড়চণ্ডীর ভৈরবী
হৈমবতী	...	...	জনার্দ্দনের কন্যা নির্ম্মলের পত্নী

ভিক্ষুক-কন্যা, নারীগণ ইত্যাদি

ষোড়শী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চণ্ডীগড়—গ্রাম্যপথ

[বেলা অপরাহ্ণ-প্রায়। চণ্ডীগড়ের সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য-পথের পরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিতেছে। অদূরে বীজগাঁ'র জমিদারী কাছারীবাটীর ফটকের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। জন দুই পথিক দ্রুতপদে চলিয়া গেল, তাহাদেরই পিছনে একজন কৃষক মাঠের কর্ম শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তাহার বাঁ কাঁধে লাঙ্গল ডান হাতে ছড়ি, অগ্রবর্ত্তী অদৃশ্য বলদ-যুগলের উদ্দেশে হাঁকিয়া বলিতে বলিতে গেল, "ধলা, সিধে চ' বাবা, সিধে চল্! কেলো, আবার আবার! আবার পরের গাছ-পালায় মুখ দেয়!"

কাছারীর গমস্তা এককড়ি নন্দী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল এবং উৎকণ্ঠিত শঙ্কায় পথের একদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় গলা বাড়াইয়া কিছু একটা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পিছনের পথ দিয়া দ্রুতপদে বিশ্বম্ভর, প্রবেশ করিল। সে কাছারীর বড় পিয়াদা, তাগাদায় গিয়াছিল, অকস্মাৎ সম্বাদ পাইয়াছে বীজগাঁ'র নবীন জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী চণ্ডীগড়ে আসিতেছেন। ক্রোশ দুই দূরে তাঁহার পাল্‌কি নামাইয়া বাহকেরা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লইতেছিল, আসিয়া পড়িল বলিয়া।]

বিশ্বম্ভর। নন্দী মশাই, দাঁড়িয়ে কর্‌চেন কি? হুজুর আস্‌ছেন যে!

এককড়ি। (চমকিয়া মুখ ফিরাইল। এ দুঃসম্বাদ ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তাহারও কানে পৌঁছিয়াছে। উদাস কণ্ঠে কহিল) হুঁ।

বিশ্বম্ভর। হুঁ কি গো? স্বয়ং হুজুর আস্‌ছেন যে!

এককড়ি। (বিরক্ত স্বরে) আস্‌ছেন ত আমি কোরব কি? খবর নেই, এত্তালা নেই,—হুজুর আসছেন। হুজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারেবেনা!

বিশ্বম্ভর। (এই আকস্মিক উত্তেজনার অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া শুধু কহিল) আরে, তুমি কি মরিয়া হয়ে গেলে না কি?

এককড়ি। মরিয়া কিসের! মামার বিষয় পেয়েছে বই ত কেউ আর বাপের বিষয় বল্‌বেনা! তুই জানিস্ বিশু, কালীমোহন বাবু ওকে দূর করে দিয়েছিল, বাড়ী ঢুকতে পর্য্যন্ত দিতনা। ভেজ্য পুত্তুরের সমস্ত ঠিক ঠাক, হঠাৎ খামকা মরে গেল বলেই ত জমিদার! নইলে থাকতেন আজ কোথায়? আমি জানিনে কি!

বিশ্বম্ভর। কিন্তু জেনে সুবিধেটা কি হচ্ছে শুনি? এ মামা নয় ভাগ্নে। ও কথা দুলাগে কানে ... ভিটেয় তোমার সন্ধ্যে দিতেও কাউকে বাকি রাখ্‌বেনা। ধরবে আর চুপ ক'রে গুলি করে মারবে। এমন কত গণ্ডা এরই মধ্যে মেরে পুঁতে ফেলেছে জানো? তবে কেউ কথাটি পর্য্যন্ত কয়না।

এককড়ি। হাঃ—কথা কয়না! মগের মুল্লুক কিনা!

বিশ্বম্ভর। আরে মাতাল যে! তার কি ধর্ম্ম পবন আছে, না দয়া-মায়া আছে! বন্দুক পিস্তল ছুরি-ছোরা ছাড়া এক পা কোথাও ফেলেনা। মেরে ফেল্‌লে তখন করবে কি শুনি?

এককড়ি। তুই ত সেদিন সদরে গিয়েছিলি,—দেখেচিস্ তাকে?

বিশ্বম্ভর। না, ঠিক দেখিনি বটে, তবে সে দেখাই ইয়া গালপাট্টা, ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি, জবা-ফুলের মত চোখ ভাঁটার মত বন্ বন্ করে ঘুর্‌চে—

এককড়ি। বিশু, তবে পালাই চ'।

বিশ্বম্ভর। আরে পালিয়ে ক'দিন তার কাছে বাঁচবে নন্দী মশাই? চুলের মুঁটি ধরে টেনে এনে খাদ খুঁড়ে পুঁতে ফেলবে।

এককড়ি। কি তবে হবে বল্? মাতালটা যদি বসে বসে শান্তিকুঞ্জেই থাক্‌বো?

বিশ্বম্ভর। কতবার ত বলেছি নন্দী মশাই এ কাজ কোরোনা, কোরোনা, কোরোনা। বছরের পর বছর খাতায় কেবল শান্তিকুঞ্জের মিথ্যে মেরামতি খরচই লিখে গেলে, গরীবের কথায় ত আর কান দিলেনা।

এককড়ি। তুইও ত কাছারীর বড় সর্দার, তুইও ত—

বিশ্বম্ভর। দেখ, ও সব শয়তানি ফন্দি কোরো না বলচি! আমার ওপর দোষ চাপিয়েছ কি—ওগো, ওই যে একটা পাল্‌কি দেখা যায়!

[নেপথ্যে বাহকদিগের কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল। বিশ্বম্ভর পলায়নোদ্যত এককড়ির হাতটা ধরিয়া ফেলিতেই সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে]

এককড়ি। ছাড়্‌ না হারামজাদা।

বিশ্বম্ভর। (অস্ফুট চাপা কণ্ঠে) পালাচ্চো কোথায়? ধরলে গুলি করে মারবে যে! [এমনি সময়ে পাল্‌কি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে উভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পাল্‌কির অভ্যন্তরে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়াছিলেন, তিনি একটুখানি মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]

ওহে, এ গ্রামে জমিদারের কাছারী বাড়ীটা কোথায় তোমরা কেউ বল্‌তে পারো?

এককড়ি। (করজোড়ে) সমস্তই ত হুজুরের রাজ্য।

জীবানন্দ। রাজ্যের খবর জান্‌তে চাইনি। কাছারীটার খবর জানো?

এককড়ি। জানি হুজুর। ওই যে।

জীবানন্দ। তুমি কে?

[এককড়ি ও বিশ্বম্ভর হাঁটু গাড়িয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

এককড়ি। হুজুরের নফর এককড়ি নন্দী।

জীবানন্দ। ওহো, তুমি এককড়ি—চণ্ডীগড় সাম্রাজ্যের বড় কর্ত্তা? কিন্তু দেখ এককড়ি, একটা কথা বলে রাখি তোমাকে। চাটুবাক্য অপছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু তার একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকাটাও পছন্দ করি! এটা ভুলোনা। তোমার কাছারীর তশিল কত?

এককড়ি। আজ্ঞে, চণ্ডীগড় তালুকের আয় প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা।

জীবানন্দ। হাজার পাঁচেক?—বেশ।

(বাহকেরা পাল্‌কি নীচে নামাইল। জীবানন্দ অবতরণ করিলেননা, শুধু পা দু'টা বাহির করিয়া ভূমিতলে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন,)

বেশ। আমি এখানে দিন পাঁচ ছয় আছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমার হাজার দশেক টাকা চাই এককড়ি। তুমি সমস্ত প্রজাদের খবর দাও যেন কাল তারা এসে কাছারীতে হাজির হয়।

এককড়ি। যে আজ্ঞে। হুজুরের আদেশে কেউ গরহাজির থাকবে না।

জীবানন্দ। এ গাঁয়ে দুষ্ট বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো?

এককড়ি। আজ্ঞে, না তা' এমন কেউ,—শুধু তারাদাস চকোত্তি,—তা' সে আবার হুজুরের প্রজা নয়।

জীবানন্দ। তারাদাসটা কে?

এককড়ি। গড় চণ্ডীর সেবায়েৎ।

জীবানন্দ। এই লোকটাই কি বছর দুই পূর্ব্বে একটা প্রজা উৎখাতের মামলায় আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) হুজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায়না। আজ্ঞে, এই সেই তারাদাস।

জীবানন্দ। হুঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল। এ কতখানি জমি ভোগ করে?

এককড়ি। (মনে মনে হিসাব করিয়া) ষাট সত্তর বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ। একে তুমি আজই কাছারীতে ডেকে আনিয়ে জানিয়ে দাও যে বিঘে প্রতি আমার দশটাকা নজর চাই।

এককড়ি। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে সে যে নিষ্কর দেবোত্তর, হুজুর।

জীবানন্দ। না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে একফোঁটা নেই। [illegible] না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এককড়ি। আজই তাকে হুকুম জানাচ্ছি।

জীবানন্দ। শুধু হুকুম জানানো নয়, টাকা তাকে দু'দিনের মধ্যে দিতে হবে।

এককড়ি। কিন্তু হুজুর—

জীবানন্দ। কিন্তু থাক্‌ এককড়ি। এই সোজা রাস্তাইয়ের ভারে আমার শান্তিকুঞ্জ না? মহাবীর, পাল্‌কি তুল্‌তে বল।

[বাহকেরা পাল্‌কি লইয়া প্রস্থান করিল।

এককড়ি। যা' ভেবেচি তাই যে ঘট্‌লো রে বিশু! এ যে দিয়ে সোজা শান্তিকুঞ্জেই ঢুকতে চায়।

...র। নয়ত কি তোমার কাছারীর খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে চাইবে?

...ড়ি। সেখানে হয়ত ঢোকবার পথ নেই। হয়ত দোর জানালা সব চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে, হয়ত তার ঘরে ঘরে বাঘ-ভালুকে বসবাস করে আছে,—সেখানে কি যে আছে আর কি যে নেই কিছুই যে জানিনে বিশম্ভর!

...র। আমিই কি জানি না কি তোমার ...র জানালার খবর? আর বাঘ-ভালুকের কাছে ত আমি খাজনা আদায়ে যাইনি গো!

...কড়ি। এই রাত্তিরে কোথায় আলো, কোথায় লোকজন, কোথায় খাবার দাবার—

...ম্ভর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলে লোকজন জুটতে পারে, কিন্তু আলো আর খাবার দাবার—

...কড়ি। তোর কি! তুই ত বল্‌বিই রে নচ্ছার পাজি ব্যাটা হারামজাদা—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শান্তিকুঞ্জ

[বাকুই নদতীরে চণ্ডীগড়ের জমিদার ৺রাধামোহনের নির্ম্মিত বিলাসভবন "শান্তিকুঞ্জ"। সংস্কারের অভাবে আজ তাহা জীর্ণ, শ্রীহীন, ভগ্নপ্রায়। তাহারই একটা কক্ষে তক্তপোষের উপরে বিছানা, বিছানায় চাদরের অভাবে একটা বহুমূল্য শাল পাতা; শিয়রের দিকে একটা গোল টেবিল তাহাতে মোটা বাঁধানো একখানা বইয়ের উপর আধপোড়া একটা মোমবাতি তাহারই পাশে একটা পিস্তল। হাতের কাছে একটা টুল, তাহাতে সোডার বোতল, সুরাপূর্ণ গ্লাস ও মদের বোতল। বোতলটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পার্শ্বে দামী একটা সোনার ঘড়ি,—ঘড়িটা ছাইয়ের আধার স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে,—আধপোড়া একখণ্ড চুরুট হইতে তখনও ধূমের রেখা উঠিতেছে; সম্মুখের দেয়ালে গোটাদুই নেপালী কুকরি টাঙানো, কোণে একটা বন্দুক ঠেস দিয়া রাখা, তাহারই অদূরে মেঝের উপর একটা শৃগালের মৃত দেহ হইতে রক্তের ধারা বহিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা শূন্য মদের বোতল; একটা ডিসে উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষ তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই, ইহারই সন্নিকটে একখানা দামী ঢাকাই চাদরে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—... মেঝেতে লুটাইতেছে। জীবানন্দ চৌধুরী বি... নায় আড় হইয়া পড়িয়া। পায়ের দিকে জানালাটা ভাঙা, তাহার ফাঁক দিয়া বাহিরে একটা গাছের ডালের খানিকটা ভিতর ঢুকিয়াছে। দুই দিকে দুইটি দরজা,—দর... ঠেলিয়া জীবানন্দর সেক্রেটারি প্রফুল্ল প্রবেশ করিল]

প্রফুল্ল। সেই লোকটা এখানেও এসেছিল দাদা।

জীবানন্দ। কে বল্‌ত?

প্রফুল্ল। সেই মাদ্রাজী সাহেবের কর্ম্মচারী, ... আখের চাষ আর চিনির কারখানার জন্যে স... দক্ষিণের মাঠটা কিনতে চান। সত্যিই কি ... বিক্রী করে দেবেন?

জীবানন্দ। নিশ্চয়। আমার এখন ভয়ানক টা... দরকার।

প্রফুল্ল। কিন্তু অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হবে।

জীবানন্দ। তা' হবে, কিন্তু আমার সর্ব্বনা... বাঁচবে।

প্রফুল্ল। আর একটি লোক বাইরে বসে আছেন, ... নাম জনার্দ্দন রায়। আসতে বলব?

জীবানন্দ। না ভায়া, এখন থাক। সাধু সঙ্গ ... যখন তখন করতে নেই—শাস্ত্রে নিষেধ আ...

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) লোকটা শুনেছি খুব ধনী।

জীবানন্দ। শুধু ধনী নয়, বহুগুণী। চিঠা, তমসুক, দলিল, যথা ইচ্ছা ইনি প্রস্তুত ... দিতে পারেন, নকল নয়, অনুকরণ নয়, একেবা... অভিনব, অপূর্ব্ব। যাকে বলে সৃষ্টি। মহাপু... ব্যক্তি।

প্রফুল্ল। এ সব লোককে প্রশ্রয় দেবেননা দা...

জীবানন্দ। তার প্রয়োজন নেই প্রফুল্ল, ... নিজের প্রতিভায় সে উচ্চে বিচরণ ক... আমার প্রশ্রয় সেখানে নাগাল পাবেনা।

প্রফুল্ল। শুনলাম সমস্ত মাঠটা আপনার এ... নয়, দাদা। এ সম্বন্ধে,—

জীবানন্দ। না প্রফুল্ল, এ সম্বন্ধে তোমাকে আমি কইতে দেবনা। দেনায় গলা পর্য্যন্ত ডুবে ... এর পরে তোমার সৎ অসতের ভূত ঘাড়ে চা... আর রসাতলে তলিয়ে যাবার দেরি হবেনা।

[এক পাত্র মদ্য পান করিয়া]

জীবানন্দ। তুমি ভাবচো রসাতলের দেরিই কত? দেরি নেই সে আমি জানি। আ...

একটা কথা তোমার চেয়ে বেশি জানি প্রফুল্ল, এর কূল-কিনারাও নেই।

[প্রফুল্ল নিঃশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল]

জীবানন্দ। ওই তোমার মস্ত দোষ প্রফুল্ল, শেষ হওয়া জিনিসটাও নিঃশেষ হচ্ছে শুনলে তোমার চোখ ছল্ ছল্ করে আসে। যাও ত ভায়া একবার পাঠিয়ে দাও ত। আর দেখ, তোমাকে একবার সদরে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা কইতে হবে। বুঝ্‌লে?

প্রফুল্ল। (মাথা নাড়িয়া) তা'হলে এখনো ত বেলা আছে আজই ত যেতে পারি। সাহেবের সঙ্গে গাড়ী আছে।

জীবানন্দ। বেশ, তা'হলে এঁর গাড়ীতেই যাও।

[প্রফুল্লর প্রস্থান ও এককড়ির প্রবেশ]

জীবানন্দ। টাকা আদায় হচ্ছে এককড়ি?

এককড়ি। হচ্ছে হুজুর।

জীবানন্দ। তারাদাস টাকা দিলে?

এককড়ি। [illegible] দিতে চায়নি। শেষে কান ধ'রে [illegible], ব্যাঙের নাচ নাচাবার প্রস্তাব করতেই দিতে রাজি হয়ে বাড়ী গেছে। আজ দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দ। তারপর?

এককড়ি। মহাবীর সিংকে সঙ্গে দিয়ে হুজুরের পাল্‌কি বেহারাদের পাঠিয়েছি তাকে ধরে আনতে।

জীবানন্দ। (মদ্য পান করিয়া) ঠিক হয়েছে। তোমাদের এখানে বোধ করি বিলিতি মদের দোকান নেই। তা না থাক, যা আমার সঙ্গে আছে তাতেই একটা দিন চলে যাবে। কিন্তু— আরও একটা কথা আছে এককড়ি।

এককড়ি। আজ্ঞে করুন?

জীবানন্দ। দেখ—এককড়ি, আমি বিবাহ—হাঁ— বিবাহ আমি করিনি—বোধ হয় কখনো কোরবও না। (একটু পরে) কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব,—বলি মহাভারত পড়েচ ত?— তার ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি,—শুকদেব হয়েও উঠিনি,—বলি কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই?

এককড়ি। (লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল)

জীবানন্দ। অপর সকলের মত যাকে তা[illegible] এসব কথা বল্‌তে আমি ভালবাসিনে [illegible] ঠকতে হয়। আচ্ছা এখন যাও।

এককড়ি। আমি তারাদাসকে দেখি [illegible] এর মধ্যে প্রজা বিগড়ে না দেয়। [যা[illegible]

জীবানন্দ। প্রজা বিগ্‌ড়ে দেবে? আমি [illegible] থাক্‌তে?

এককড়ি। হুজুর, পারে ওরা।

জীবানন্দ। তারাদাসকেই ত জানি, আবার [illegible] এল কারা?

এককড়ি। চক্কোত্তির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চক্কোত্তি মশাই নিজে তত লোক মন্দ নয়, কিন্তু মেয়েটাই হচ্ছে আসল সর্বনাশী। দেশের যত বোম্বেটে বদমাসগুলো হয়েছে যেন একেবারে তার গোলাম।

জীবানন্দ। বটে? কত বয়স? দেখতে কেমন?

[ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ সন্ধ্যার আবছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল]

এককড়ি। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হ'তে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর ত সে যেন এক কাট-খোট্টা সিপাই। না আছে মেয়েলি ছিরি, না আছে মেয়েলি ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে। তাতেই ত দেশের ছোট লোকগুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্ছেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।

জীবানন্দ। (উৎসাহ ও কৌতূহলে সোজা উঠিয়া বসিয়া) বল কি এককড়ি? ভৈরবীর ব্যাপারটা [illegible] খুলে বল ত শুনি?

এককড়ি। ভৈরবী ত কারু নাম নয় হুজুর। [illegible] চণ্ডী প্রধান সেবিকাদের ওই হ'ল উপাধি। বর্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী এর আগে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল মাতঙ্গিনী। মার আদেশে তাঁর সেবায়েৎ কখনো পুরুষ হতে পারে না, চিরদিন মেয়েরাই হয়ে আস্‌ছে।

জীবানন্দ। তাই না কি? এ তো কখনো শুনিনি।

এককড়ি। মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীকে আর ভৈরবীর স্পর্শ করবারও যো নেই। তাই দূরদেশ থেকে দুঃখী গরীবদের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়াও দেখতে পায় না। এই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসচে।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) বল কি এককড়ি, একেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ, রাত্রে নিরিবিলি একপাত্র সুধা ঢেলে দেওয়া—[illegible] খলশা ছিয়ে চাটি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো,—একেবারে কিছুই করতে পায় না?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) না হুজুর, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই, কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গাঁয়ে আর পুরুষ নেই? মাতু ভৈরবীকেও দেখেছি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখছি। লোকগুলো কি আর থামকা—তার সাক্ষী দেখুন না—কথায় কথায় হুজুরের সঙ্গেই মামলা মোকদ্দমা বাধিয়ে দেয়!

জীবানন্দ। মেয়ে মোহান্ত আর কি! তাতে দোষ নেই। এককড়ি, আলোটা জ্বালো তো।

এককড়ি। (আলো জ্বালিয়া) এখন আমি চললুম।

জীবানন্দ। আচ্ছা যাও। বইখানা দিয়ে যাও তো।

(বই দিয়া প্রণাম করিয়া এককড়ি প্রস্থান করিল)

[জীবানন্দ শুইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। একটু পরে বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ হইল]

জীবানন্দ। কে?

সর্দার। (ষোড়শীকে লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিল) শালা তারাদাস ভাগ গিয়া। হুজুর উসকো বেটীকো পাকড় লায়া।

জীবানন্দ। [বই ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্মিত ভাবে] কাকে? ভৈরবীকে? (কিছুক্ষণ পরে) ঠিক হয়েছে। আচ্ছা যা।

[সর্দার অনুচর পাইকদের লইয়া প্রস্থান করিল]

জীবানন্দ। তোমাদের আজ টাকা দেবার কথা। টাকা এনেচ? (ষোড়শীর কণ্ঠস্বর ফুটিলনা) আনোনি জানি। কিন্তু কেন?

ষোড়শী। আমাদের নেই।

জীবানন্দ। না থাকলে সমস্ত রাত্রি তোমাকে পাইকদের ঘরে আটক থাকতে হবে। তার মানে জানো?

[ষোড়শী দ্বারের চৌকাঠটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া মূর্চ্ছা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল; এই ভয়ানক বিবর্ণ, মুখের চেহারা জীবানন্দের চোখে পড়িল, মিনিট খানেক সে কেমন যেন আচ্ছন্নের ন্যায় বসিয়া রহিল। তারপরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া ষোড়শীর কাছে গেল। আলোটা তাহার মুখের সম্মুখে ধরি একদৃষ্টে ষোড়শীর গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রু কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সু অবহু দেহ, সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দি নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটি গেলে পর]

জীবানন্দ। (ফিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দি মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপর্যুপ পান করিয়া) তোমার নাম ষোড়শী জা (ষোড়শী নীরব) তোমার বয়স কত? (কোন উত্তর না পাইয়া কঠিন স্বরে) চুপ করে থেকে বিশেষ কোন লাভ হবে না। জবাব দাও।

ষোড়শী। (মৃদুস্বরে) আমার বয়স আটাশ।

জীবানন্দ। বেশ। তাহলে খবর যদি সত্য হয় এই উনিশ কুড়ি বৎসর ধরে তুমি ভৈরবীগি করচ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েছ। দি পারবে না কেন?

ষোড়শী। আপনাকে আগেই ত জানিয়েছি আম টাকা নেই।

জীবানন্দ। না থাকলে আরও [illegible] তাই কর। যাদের টাকা আছে তাদের [illegible] জমি বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রী করে হোক [illegible]

ষোড়শী। তারা পারে, জমি তাদের। দি দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার, বিক্রী করবার আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ। (হঠাৎ হাসিয়া) নেবার অধিকার, ছাই আমারই আছে? কে কপর্দকও ক তবুও নিচ্ছি, কেননা আমার চাই। চাওয়াটাই হচ্ছে সংসারের খাঁটী অধিকা তে মারও যখন দেওয়া চাই-ই, তখন,—বুঝলে (কিছু পরে) যাক্, এত রাত্রে কি একা ক যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছি তাদের আর সঙ্গে দিতে চাইনে।

ষোড়শী। (সবিনয়ে) আপনার হুকুম হলেই যে পারি।

জীবানন্দ। (সবিস্ময়ে) একলা? এই অন্ধকা রাত্রে? ভারি কষ্ট হবে যে!

(হাসিতে লাগিল

ষোড়শী। না, আমাকে এখুনি যেতেই হবে।

জীবানন্দ। [সহাস্যে] বেশত, টাকা না হয় ক দেবে ষোড়শী। তা ছাড়া আরো অনেক ঢের সুবিধে—

জানিয়ে

ষোড়শী। আপনার টাকা, আপনার সুবিধা আপনারই থাক্, আমাকে যেতে দিন!

[কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সেই পাইকদের মুখে কিছুদূরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনিই থামিয়া দাঁড়াইল]

জীবানন্দ। (মুখ অন্ধকার করিয়া কঠিন স্বরে) তুমি মদ খাও?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তোমার কয়েকজন পুরুষ বন্ধু আছে শুনেছি। সত্যি?

ষোড়শী। [মাথা নাড়িয়া) না, মিছে কথা।

জীবানন্দ। [ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া] তোমার পূর্ব্বেকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন,—সত্যি? মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভাল ছিল না—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি না মিছে?

ষোড়শী। [লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে] সত্যি বলেই শুনেছি।

জীবানন্দ। শুনেছ? ভাল। তবে হঠাৎ তুমিই বা এমন দলছাড়া, গোত্রছাড়া ভাল হতে গেলে কেন? [হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া পরুষ কণ্ঠস্বরে] মেয়ে মানুষের সঙ্গে তর্কও আমি করিনে, তাদের মতামতও কখনো জানতে চাইনে। তুমি ভাল কি মন্দ, চুল চিরে তার বিচার করবারও আমার সময় নেই। আমি বলি, চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যেভাবে কেটেচে তোমারও তেমনিভাবে কেটে গেলেই যথেষ্ট। আজ তুমি এই বাড়ীতেই থাকবে।

[হুকুম শুনিয়া ষোড়শী বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল]

জীবানন্দ। তোমার সম্বন্ধে কি কোরে যে এতটা সহ্য করেচি জানিনে, আর কেউ এ বেয়াদপি করলে এতক্ষণ তাকে পাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েচি।

ষোড়শী। [অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া, গলায় আঁচল দিয়া করযোড়ে] আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ। কেন বলত? এ রকম কান্নাও নতুন নয়, এরকম ভিক্ষেও এই নূতন শুনচিনে! কিন্তু তাদের সব স্বামী পুত্র ছিল,—কতকটা না হয় বুঝতেও পারি। [ষোড়শী শিহরিয়া উঠিল] কিন্তু তোমার তো সে বালাই নেই। পোনর যোল বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে তুমি ত চোখেও দেখনি। তাছাড়া তোমাদের ত ওতে দোষই নেই।

ষোড়শী। [করযোড়ে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে] স্বামীকে আমার ভাল মনে নেই সত্যি, কিন্তু তিনিও আছেন! যথার্থ বল্‌চি আপনাকে, কখনো কোনো অন্যায়ই আমি আজ পর্য্যন্ত করিনি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন,—

জীবানন্দ। [হাঁক দিয়া] মহাবীর—

ষোড়শী। [আতঙ্কে কাঁদিয়া] আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন, কিন্তু—

জীবানন্দ। আচ্ছা, ও বাহাদুরি করগে ওদের ঘরে গিয়ে। মহাবীর—

ষোড়শী। [মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া] কারও সাধ্য নেই আমার প্রাণ থাকতে নিয়ে যেতে পারে। আমার যা' কিছু দুর্দ্দশা—যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক—আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক!

জীবানন্দ। (কঠিন নিষ্ঠুর হাস্য করিল) তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না! আমি অনেক শুনি। মেয়ে মানুষের ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই,—ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে—নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্ছিনে।

মহাবীর। (দ্বার প্রান্তে আসিয়া) হুজুর!

জীবানন্দ। (সম্মুখের কবাটটায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী। (সজলদৃপ্ত-লোচনে) আমার সর্ব্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন, হুজুর! কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না!

জীবানন্দ। দু'একদিন। তার পরে পারবে। সেই লিভারের ব্যথাটা আজ সকাল থেকেই টের পাচ্ছিলাম। এখন হঠাৎ ভারী বেড়ে উঠ্‌লো—আর বেশি বিরক্ত কোরো না,—যাও।

মহাবীর। (তাড়া দিয়া) আরে উঠ্‌ না মাগী'—চোল!

জীবানন্দ। (ভয়ানক ধমক দিয়া) খবরদার, শুয়োরের বাচ্চা, ভাল কোরে কথা বল্‌! ফের যদি কখনো আমার হুকুমছাড়া কোনো মেয়ে-মানুষকে ধরে আনিস্ তো গুলি করে মেরে ফেলব। (মাথার বালিশটা পেটের কাছে

টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া যাতনায় অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া) আজকের মত ও-ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতী-পনার বোঝাপড়া হবে। আঃ—এই, যা'না আমার সুমুখ থেকে একে সরিয়ে নিয়ে।

মহাবীর। (আস্তে আস্তে বলিল) চলিয়ে—

(ষোড়শী নির্দেশমত নিরুত্তরে পাশের অন্ধকার ঘরে যাইতেছিল)।

জীবানন্দ। ষোড়শী, একটু দাঁড়াও, প্রফুল্ল নেই, সে সদরে গেছে—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী। জানি।

জীবানন্দ। তাহলে একটু কাজ করে যাও। ওই যে বাক্সটা, ওর মধ্যে আর একটা ছোট কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট বড় শিশি আছে, যার গায়ে বাঙলায় 'মরফিয়া' লেখা, তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর আলোটা ধর।

[মহাবীর আলো ধরিল]

ষোড়শী। (বাতির আলোকে কম্পিত-হস্তে শিশিটা বাহির করিয়া) কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ। (তীব্র বেদনায় অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া) ঐ তো বল্লুম খুব একটুখানি। আমি উঠ্‌তেও পারচিনে, আমার হাতেরও ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাচের ঝিনুক আছে, তার অর্দ্ধেকেরও কম। একটু বেশী হয়ে গেলে এ ঘুম তোমার চণ্ডীর বাবা এসেও ভাঙাতে পারবে না।

[পরিমাণ স্থির করিতে ষোড়শীর হাত কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে অনেক যত্নে অনেক সাবধানে নির্দেশমত ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

জীবানন্দ। (হাত বাড়াইয়া সেই বিষ লইয়া চোখ বুজিয়া মুখে ফেলিয়া দিল) খুব কমই দিয়েচ,—ফল হবে না হয়ত। আচ্ছা এই থাক্।

[ষোড়শী পাশের ঘরে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় এককড়ি নিতান্ত ব্যস্ত ও ব্যাকুল ভাবে প্রবেশ করিয়া ও এদিক ওদিক চাহিয়া জীবানন্দের কানের কাছে চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল। জীবানন্দের মুখের ভাবে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। ষোড়শী দ্বারপ্রান্তে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল]

জীবানন্দ। (হাত নাড়িয়া ষোড়শীকে) তোমার ভয় নেই, কাছে এসো। (ষোড়শী আসিলে) পুলিশের লোক বাড়ী ঘিরে ফেলেচে,—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেছেন,—এলেন বলে। (ষোড়শী চমকিয়া উঠিল) জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ট্যুরে বেরিয়ে ক্রোশখানেক দূরে তাঁবু ফেলেছিলেন, তোমার বাবা এই রাত্রেই তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত জানিয়েছেন। কেবল তাতেই এতটা হো[ত] না, জে-সাহেবের নিজেরই আমার উপর ভা[রি] রাগ। গত বৎসর দু'বার ফাঁদে ফেল্‌বার চে[ষ্টা] করেছিল, কিন্তু পারেনি,—আজ একেবারে হা[তে] হাতে ধরে ফেলেচে—(একটু হাসিল)।

এককড়ি। (মুখ চূণ করিয়া) হুজুর, এবার বোধ [হয়] আমাদেরও আর রক্ষা নেই।

জীবানন্দ। সম্ভব বটে। (ষোড়শীকে) শোধ নি[তে] চাওত এই-ই সময়। আমাকে জেলে দিতে পারো।

ষোড়শী। এতে জেল হবে কেন?

জীবানন্দ। আইন। তাছাড়া জে-সাহেবের হাতে পড়েচি। বাছড়বাগান মেসে থাক্‌তে এরই কা[ছে] একবার দিন কুড়ি হাজত বাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলে না,—আর জামিনই [বা] তখন হোতো কে!

ষোড়শী। (উৎসুক কণ্ঠে) আপনি কি কখ[নো] বাছড়বাগানের মেসে ছিলেন?

জীবানন্দ। হাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডে [জড়িয়ে] পড়ে ফ্যাসাদে হয়েছিলুম,— ব্যাটা অ্যালান যোষ কিছু[তে] ছাড়লে না,—পুলিশে দিলে। যাক, সে অনে[ক] কথা। সে আমাকে চোনেনি, বেশ চিনে আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু ব্যথায় শয্যাগ[ত] হয়ে পড়েচি নড়বার যো নেই।

ষোড়শী। (কোমল কণ্ঠে) ব্যথাটা কি আপনা[র] কম্‌চে না?

জীবানন্দ। না। তাছাড়া এ সারবার ব্যথাও নয়।

ষোড়শী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আমাকে কি করতে হবে?

জীবানন্দ। শুধু বল্‌তে হবে তুমি নিজের ইচ্ছায় এসো[ছো] নিজের ইচ্ছায় আছো। তার বদলে তোমাকে সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেবো, হাজার টাকা নগদ দেব, আর নজরের টাকার ত কথাই নেই।

[এককড়ি কি বলিতে যাইয়া ষোড়শীর মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেল]

ষোড়শী। (সোজা চাহিয়া) একথা স্বীকার করা[র] অর্থ বোঝেন? তার পরেও কি আমার জমিতে

টাকাকড়িতে প্রয়োজন থাকতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

জীবানন্দ। (বিবর্ণমুখে) তাই বটে ষোড়শী, তাই বটে। জীবনে আজও ও তুমি পাপ করোনি,—ও তুমি পারবে না সত্যি। (একটু হাসিয়া) টাকাকড়ির বদলে যে সম্ভ্রম বেচা যায় না,—এ যেন আমি ভুলেই গেছি। তাই হোক, যা সত্যি তাই তুমি বোলো,—জমিদারের তরফ থেকে আর কোনো উপদ্রব তোমার ওপর হবে না।

[এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবার কি বলিতে গেল, রুদ্ধ দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাতের শব্দ শুনিয়া বিবর্ণ মুখে থামিয়া গেল]

জীবানন্দ। (সাড়া দিয়া) খোলা আছে, ভিতরে আসুন।

[দরজা উন্মুক্ত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্‌স্‌পেক্টর, কয়েকজন কনেষ্টবল ও তারাদাস চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন]

তারাদাস। (ভিতরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া) ধর্ম্মাবতার, হুজুর, এই আমার মেয়ে, মা চণ্ডীর ভৈরবী। আপনি এসেছেন তাই, নাহলে আজ ওকে টাকার জন্যে খুন করে ফেলতো ধর্ম্মাবতার।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (ষোড়শীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমারই নাম ষোড়শী? তোমাকেই বাড়ী থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না, আমি নিজের ইচ্ছায় এসেচি। কেউ আমার গায়ে হাত দেয় নি।

তারাদাস। (চেঁচামেচি করিয়া উঠিল) না হুজুর, ভয়ানক মিথ্যে কথা, গ্রামশুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ী থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে কহিলেন) তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্য কথা বল। তোমাকে বাড়ী থেকে ধরে এনেছে?

ষোড়শী। না, আমি আপনি এসেচি।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এখানে তোমার কি প্রয়োজন?

ষোড়শী। আমার কাজ ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট। এত রাত্রেও বাড়ী ফিরে যেতে দেরি হচ্ছিল।

তারাদাস। (চেঁচাইয়া) না হুজুর, সমস্ত মিছে,—সমস্ত বানানো আগাগোড়া শিখানো কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া হাসিলেন এবং শিস্ দিতে দিতে প্রথমে বন্দুকটা এবং পরে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন) I hope you have permission for this.

[ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

[তারাদাস হতজ্ঞানের ন্যায় স্তব্ধ অভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল]

ম্যাজিষ্ট্রেট। (নেপথ্যে) হামারা ঘোড়া লাও।

[ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল]

তারাদাস। [অকস্মাৎ বুকফাটা ক্রন্দনে সকলকে সচকিত করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীর পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিয়া] বাবু মশায়, আমার কি হবে! আমাকে যে এবার জমিদারের লোক জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

ইন্‌সপেক্টার। (তিনি বয়সে প্রবীণ, শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া সদয়কণ্ঠে) ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো গে। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমার সহায় রইলেন,—আর কেউ তোমাকে জুলুম করবে না। (কটাক্ষে জীবানন্দের দিকে চাহিলেন)

তারাদাস। (চোখ মুছিতে মুছিতে) সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু!

ইন্‌সপেক্টার। (মুচকি হাসিয়া) না ঠাকুর, রাগ করেন নি, তবে, আজকের এই ঠাট্টাটুকু শিগ্গির সহজে ভুলতে পারবেন, এমন মনে হয় না। তা ছাড়া আমরাও মরিনি, থানাও যাহোক একটা আছে। (আড়চোখে জীবানন্দের দিকে চাহিয়া, কিছু পরে) এখন চল ঠাকুর, যাওয়া যাক্। এই রাত্রে যেতেও ত হবে অনেকটা।

সাব ইন্‌সপেক্টার। (বয়সে তরুণ, অল্প হাসিয়া) মেয়েটি রেখে ঠাকুরটি কি তবে একাই যাবেন না কি?

[কথাটায় সবাই হাসিল—কনেষ্টবলগুলা পর্য্যন্ত। এককড়ি কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তারাদাসের চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল]

তারাদাস। [ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া সগর্জ্জনে) যেতে হয় আমি একাই যাবো। আবার ওর মুখ দেখব,—আবার ওকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবো আপনারা ভেবেচেন?—

ইন্‌স্‌পেক্টার। (সহাস্যে) মুখ তুমি না দেখতে পারো কেউ মাথার দিব্যি দেবে না ঠাকুর। কিন্তু যার বাড়ী, তাকে বাড়ী ঢুকতে না দিয়ে আর যেন নতুন ফ্যাসাদে পোড়ো না।

তারাদাস। (আস্ফালন করিয়া) বাড়ী কার? বাড়ী আমার। আমিই ভৈরবী করেচি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির হাতে। (সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া) নইলে কে ও জানেন? শুনবেন ওর মায়ের—

ইন্‌স্‌পেক্টার। (থামাইয়া দিয়া) থামো, ঠাকুর থামো, রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেল্‌তে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। (ষোড়শীর প্রতি) তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল, আর দেরী কোরোনা।

[ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না]

সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) যাবার বিলম্ব আছে বুঝি?

ষোড়শী। (মুখ তুলিয়া চাহিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারের প্রতি) আপনারা যান, আমার যেতে এখনো দেরি আছে।

তারাদাস (উন্মত্তের মত) দেরি আছে! হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই! (লাফাইয়া উঠিয়া ষোড়শীকে আঘাত করিতে গেল)

ইন্‌স্‌পেক্টার। (তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া) ফের যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাবো। চল, ভাল মানুষের মত ঘরে চল।

[তারাদাসকে টানিয়া লইয়া তিনি ও সব রাজ-কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল, এককড়িও পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল। দূর হইতে তারাদাসের গর্জ্জন গালাগালি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর শোনা যাইতে লাগিল]

জীবানন্দ। (ইঙ্গিতে ষোড়শীকে আরো একটু কাছে ডাকিয়া) তুমি এঁদের সঙ্গে গেলে না কেন?

ষোড়শী। ওঁদের সঙ্গে ত আমি আসিনি।

জীবানন্দ। (কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'চার দিন দেরি হবে, কিন্তু টাকাটা কি তুমি আজই নিয়ে যাবে?

ষোড়শী। তাই দিন।

জীবানন্দ। (বিছানার তলা থেকে একতাড়া নো[ট] বাহির করিল। সেইগুলা গণনা করিতে করি[তে] ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখি[য়া] একটু হাসিয়া বলিল) আমার কিছুতেই মন করে না, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হা[তে] তুলে দিতে বাধ বাধ ঠেকচে।

ষোড়শী। (শান্ত নম্র কণ্ঠে) কিন্তু তাইত দেবা[র] কথা ছিল।

জীবানন্দ। কথা যাই থাক্ ষোড়শী, আমাকে বাঁচা[তে] তুমি যা খোয়ালে, তার দাম টাকায় ধার্য্য করা[র] এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচা[ই] ছিল ভাল।

ষোড়শী। (তার মুখে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া) কিন্তু মে[য়ে] মানুষের দাম ত আপনি এই দিয়েই চিরদি[ন] ধার্য্য করে এসেছেন। [জীবানন্দ নিরুত্তর—কিছু পরে], বেশ আজ যদি আপনার সে ম[ত] বদলে থাকে, টাকা না হয় রেখেই দি[ন], আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আমা[কে] কি সত্যিই এখনো চিন্তে পারেন নি? ভা[ল] করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ। (নীরবে বহুক্ষণ নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া) বোধ হয় পেরেচি ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?

ষোড়শী। (তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল) আমার নাম ষোড়শী। ভৈরবীর দশমহাবিদ্যা[র] নাম ছাড়া আর কোনো নাম থাকে না। কি[ন্তু] অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ। (নিরুৎসুক কণ্ঠে) কিছু কিছু মনে আছে বৈকি। তোমার মায়ের হোটেলে মাঝে মাঝে খেতে যেতাম। তখন তুমি ছোট ছিলে। কি[ন্তু] আমাকে ত তুমি অনায়াসে চিন্‌তে পেরেচ?

ষোড়শী। অনায়াসে না হলেও পেরেচি। অলকা[র] মাকে মনে পড়ে?

জীবানন্দ। পড়ে। তিনি বেঁচে আছেন?

ষোড়শী। না—বছর দশেক আগে তাঁর কাশীলাভ হয়েছে। আপনাকে তিনি বড় ভালবাসতেন, না!

জীবানন্দ। (উদ্বেগে) হাঁ—একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি।

ষোড়শী। না, কিন্তু আপনি সেজন্য মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। কারণ অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেননি, জামাইকে

যৌতুক বলে দিয়েছিলেন। (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) চেষ্টা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে সেদিনটাও ঠিক এমনি দুর্দিন ছিল। আজ ষোড়শীর ঋণটাই খুব ভারি বোধ হচ্চে, কিন্তু সেদিন ছোট্ট অলকার কুলটা মায়ের ঋণটাও কম ভারি ছিল না চৌধুরী মশাই।

জীবানন্দ। তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ঐ ক'টা টাকার জন্তে তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন।

ষোড়শী। বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেননি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি নিজে। কিন্তু, যাক্ ওসব বিশ্রী আলোচনায়। বিবাহ আপনি করেননি, করেছিলেন শুধু একটু তামাসা। সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তারপরে আজ প্রথম দেখা।

জীবানন্দ। কিন্তু তারপরে ত তোমার সত্যিকার বিবাহই হয়েচে শুনেচি।

ষোড়শী। তার মানে আর একজনের সঙ্গে? এই না? কিন্তু নিরুপায় বালিকার ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা যদি ঘটেই থাকে, তবুও আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ। যাই-হোক্, কিন্তু তোমার মা জান্তেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাবার হাত থেকে আলাদা রাখবার জন্তেই তিনি যাহোক্ একটা—

ষোড়শী। বিবাহের গণ্ডী টেনে দিয়েছিলেন? তা হবেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, এবং আমিই অলকা কি না, এতকাল পরে তা নিয়েও দুশ্চিন্তা করবার আপনার দরকার নেই।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থাকিয়া) কিন্তু, ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ কোরে বল, তাহলে—

ষোড়শী। আসল কথাটা কি? বিবাহের কথা? কিন্তু সেইত মিথ্যে। তাছাড়া সে সমস্ত অলকার, আমার নয়। সারারাত এখানে কাটিয়ে গিয়ে গু-গল্প করলে ষোড়শীর সর্বনাশের পরিমাণ তাতে একটুকু কমবে না।

জীবানন্দ। (কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া) ষোড়শী, আজ আমি এত নীচে নেবে গেছি যে গৃহস্থের কুলবধূর দোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাসবে, কিন্তু সেদিন অলকাকে বিবাহ করে চৌধুরীর জমিদার বংশের বধূ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভাল কাজ হোতো?

ষোড়শী। সে ঠিক জানিনে, কিন্তু সত্য কাজ হোত এ জানি। কিন্তু আমি মিথ্যে বক্‌চি, এখন এসব আর আপনার কাছে বলা নিষ্ফল। আমি চল্লুম,—আপনি কোনো কিছু দেবার চেষ্টা করে আর আমাকে অপমান করবেন না।

জীবানন্দ। (এককড়ি প্রবেশ করিতেই তাহাকে) এককড়ি, তোমাদের এখানে কোনো ডাক্তার আছেন? একবার খবর দিয়ে আনতে পারো? তিনি যা চাবেন আমি তাই দেব।

এককড়ি। ডাক্তার আছে বই কি হুজুর,—আমাদের বল্লভ ডাক্তারের হাত যশ। (ষোড়শীর দিকে চাহিল)

জীবানন্দ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) তাঁকেই আন্‌তে পাঠাও এককড়ি, আর একমিনিট্ দেরি কোরো না।

এককড়ি। আমি নিজেই যাচ্চি। কিন্তু হুজুরকে একলা—

জীবানন্দ। (দুঃসহ বেদনায় মুহূর্তে বিবর্ণ ও উপুড় হইয়া পড়িয়া) উঃ—আর আমি পারিনে!

ষোড়শী। তুমি বল্লভ ডাক্তারকে আনোগে এককড়ি, এখানে যা করবার আমি কোরব এখন।

[এককড়ি ব্যস্ত ভাবে চলিয়া গেল।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ উপুড় থাকিয়া মুখ তুলিয়া) ডাক্তার আসে নি? কত দূরে থাকেন জানো?

ষোড়শী। কাছেই থাকেন, কিন্তু তাই বলে তিন চার মিনিটেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ। সবে তিন চার মিনিট্? আমি ভেবেছি আধ ঘন্টা—কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি তাঁকে আন্‌তে গেছে। (উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িল); হয় ত তিনিও ভয়ে এখানে আসবেন না অলকা! (তাহার কণ্ঠস্বর ও চোখের দৃষ্টিতে নিরাশ্বাসের অবধি রহিল না)

ষোড়শী। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, স্নিগ্ধস্বরে) ডাক্তার আসবেন বই কি!

জীবানন্দ। বোধ করি আমি বাঁচব না। আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্চে, মনে হচ্চে, পৃথিবীতে আর বুঝি হাওয়া নেই।

ষোড়শী। আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্চে?

জীবানন্দ। হুঁ। অলকা, আমাকে তুমি মাপ কর। (একটু থামিয়া) আমি ঠাকুর দেবতা মানিনে, —দরকারও হয় না। কিন্তু একটু আগেই মনে মনে ডাকছিলাম। জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি অন্ত নেই। আজ থেকে-থেকে

কেবলি মনে হচ্ছে বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়েই যেতে হবে। (ক্ষণেক থামিয়া) মানুষ অমর নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ দাগ দিয়ে রাখেনি—কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারচিনে—উঃ—মাগো!

[ব্যথার তীব্রতায় সর্ব্বশরীর যেন আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল]

[ষোড়শী একটু ইতস্ততঃ করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আঁচল দিয়া ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিয়া, পাখার অভাবে আঁচল দিয়াই বাতাস করিতে লাগিল। জীবানন্দ কোন কথা কহিল না, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে ধীরে কোলের উপর টানিয়া লইল]

জীবানন্দ। (ক্ষণেক পরে) অলকা—

ষোড়শী। আপনি আমাকে ষোড়শী বলে ডাকবেন।

জীবানন্দ। আর কি অলকা হতে পারো না?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। কোনোদিন কোন কারণেই কি—

ষোড়শী। আপনি অন্য কথা বলুন। (জীবানন্দ নীরব রহিল, ক্ষণেক পরে) কষ্টটা কি কিছুই কমেনি?

জীবানন্দ। (ঘাড় নাড়িয়া) বোধ হয় একটু কমেছে। আচ্ছা যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার করতে পারিনে?

ষোড়শী। না, আমি সন্ন্যাসিনী,—আমার নিজের কোন উপকার করা কারো সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। আচ্ছা এমন কিছুই কি নেই, যাতে সন্ন্যাসিনীও খুসি হয়?

ষোড়শী। তা হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্যে কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন?

জীবানন্দ। (একটু ক্ষীণ হাসিয়া) আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এ দোষ আজও কেউ দেয়নি। তাছাড়া এখন বলচি বলেই যে ভাল হয়েও বোঝবো, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই,—এম্‌নিই বটে! এম্‌নিই বটে! সারা জীবনে এ ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

[ষোড়শী নীরবে তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল]

জীবানন্দ। (হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া) সন্ন্যাসিনীর কি সুখ দুঃখ নেই? সে খুসি হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?

ষোড়শী। কিন্তু সে তো আপনার হাতের মধ্যে ন[illegible]

জীবানন্দ। যা মানুষের হাতের মধ্যে? তো[illegible] কিছু?

ষোড়শী। তাও আছে, কিন্তু ভাল হয়ে যদি কথ[illegible] জিজ্ঞাসা করেন তখনই জানাবো।

জীবানন্দ। (তাহার হাতটাকে বুকের কা[illegible] টানিয়া) না, না, আর ভালো হয়ে নয়,—[illegible] কঠিন অসুখের মধ্যেই আমাকে বল! মানুষ[illegible] অনেক দুঃখ দিয়েচি, আজ নিজের ব্যথার ম[illegible] পরের ব্যথা, পরের আশার কথাটা একটু শু[illegible] নিই। নিজের দুঃখের একটা সান্ত্বনা হোক!

[বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। ষোড়শী নিজে[illegible] হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইল]

ষোড়শী। ডাক্তার বাবু বোধ হয় এলেন।

[ডাক্তার ও এককড়ি প্রবেশ করিল]

[ডাক্তার ষোড়শীকে এখানে দেখিয়া একেবা[illegible] আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কিন্তু কিছু না বলিয়া নীর[illegible] শয্যাপ্রান্তে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হই[illegible] লেন; ষোড়শী এই সময়ে প্রস্থান করিল]

এককড়ি। যদি ভালো করতে পারেন ডাক্তার বা[illegible] বকসিসের কথা ছেড়েই দিন,—আমরা সবা[illegible] আপনার কেনা হয়ে থাকবো।

ডাক্তার। (পরীক্ষা শেষ করিয়া) অতিরি[illegible] কঠি[illegible] রোগ জন্মেছে। সাবধান না হলে পিলে [illegible] লিভার পাকা অসম্ভব নয়, এবং তাতে ভয়ে[illegible] কথা আছে। তবে সাবধান হলে নাও পাক[illegible] পারে এবং তাতে ভয়ের কথাও কম। তবে [illegible] কথা নিশ্চয় যে ওষুধ খাওয়া আবশ্যক।

জীবানন্দ। এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া সম্ভব [illegible] না তা বলতে পারেন?

ডাক্তার। যদি যেতে পারেন তাহলেই সম্ভব, নইে[illegible] কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। এখানে থাকলে ভাল হবে কি না বল[illegible] পারেন?

ডাক্তার। (বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া) আজ্ঞে [illegible] হুজুর, তা বলতে পারিনে। তবে একথা নিশ[illegible] যে এখানে থাকলেও ভাল হতে পারেন, আবা[illegible] কলকাতা গিয়ে ভাল নাও হতে পারেন।

এককড়ি। হুজুরের ব্যথাটা—

ডাক্তার। এরকম ব্যথা হঠাৎ বাড়ে, আবার হঠা[illegible] কমে যায়। কাল সকালেই হুজুর সুস্থ হয়ে উঠ[illegible]

পারেন। তবে একথা নিশ্চয় যে আমাকে আবার আস্‌তে হবে।

[এককড়ির কাছ থেকে 'ভিজিট্' লইয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন]

জীবানন্দ। কি হবে এককড়ি?

এককড়ি। ভয় কি হুজুর, ওষুধ এল বলে। বয়ঙ্ক ডাক্তারের একশিশি মিক্‌চার খেলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

জীবানন্দ। (ষোড়শী যে-দ্বারপথে একটু আগে বাহির হইয়া গেছে সেই দিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া) ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে—

[এককড়ি বাহিরে গিয়া ক্ষণেক পরে পুনরায় প্রবেশ করিল]

এককড়ি। তিনি নেই, বাড়ী চলে গেছেন হুজুর! ভোর হয়ে এসেচে!

জীবানন্দ। (ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে) আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন না। এমন হতেই পারে না এককড়ি!

এককড়ি। হাঁ হুজুর, তিনি ডাক্তারবাবু আসবার পরেই চলে গেছেন। বাইরে সর্দ্দার বসে আছে, সে দেখেছে ভৈরবী ঠাকরুণ সোজা চলে গেলেন।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ চোখের সোজা তাকাইয়া থাকিয়া) তা হলে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তুমিও যাও এককড়ি। আমি একটু ঘুমুব।

[এককড়ি আলো নিভাইয়া দিল। জীবানন্দ জানালার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আলো নিভাইতেই অতি প্রত্যুষের আবছায়া আড়া জানালা দিয়া ঘরে ছড়াইয়া পড়িল]

তৃতীয় দৃশ্য

চণ্ডী-মন্দিরের পথ। বেলা পূর্ব্বাহ্ণ।

[জনৈক ভিক্ষুক ও তাহার কন্যার প্রবেশ]

কন্যা। আর যে চলতে পারিনে বাবা, মায়ের মন্দির আর কত দূরে?

ভিক্ষুক। ঐ যে আগে আগে কত লোক চলে যাচ্ছে মা, বোধ হয় আর বেশি দূরে নয়।

কন্যা। কে গান গাইতে গাইতে আসচে বাবা, ওকে শুধোও না?

[গান গাহিতে গাহিতে দ্বিতীয় ভিক্ষুকের প্রবেশ]

তোর পাওয়ার সময় ছিল যখন, ওরে অবোধ মন,
মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন।

প্রথম ভিক্ষুক। মায়ের মন্দির আর কত দূরে বাবা?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। ঐ যে—

তখন ছিল মণি, ছিল মাণিক
পথের ধারে ধারে—
এখন ডুবলো তারা দিনের শেষে
বিষম অন্ধকারে।

প্রথম ভিক্ষুক। হাঁ গা—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। কি গো কি?

প্রথম ভিক্ষুক। বিষ্ণু গাঁ থেকে আসছি বাবা, পথ যেন আর ফুরোয় না। শুনি যে জনার্দ্দন রায় মশায়ের নাতির কল্যাণে আজ মায়ের পূজো। বামুন বোষ্টম ভিখিরী যে যা' চাইবে তাই নাকি রায় মশায়—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। রায় মশায় নয়, রায় মশায় নয়, তার জামাই। পশ্চিম মুল্লুকের ব্যারিষ্টার,—রাজা বললেই হয়। দু' সরা চিঁড়ে মুড়কি, এক সরা সন্দেশ, আর আটগণ্ডা পয়সা নগদ—

ভিক্ষুক-কন্যা। (পিতার প্রতি) হাঁ বাবা, তুমি যে বলেছিলে মেয়েদের একখানা করে রাঙা-পেড়ে কাপড় দেবে?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। দেবে, দেবে। যে যা' চাইবে। রায় মশায়ের মেয়ে হৈমবতী কাউকে না বলতে জানে না।

আজ মিথ্যে যে তোর খোঁজা খুঁজে
মিথ্যে চোখের জল,
তারে কোথায় পাবি বল,
(তোর) অতল জলে তলিয়ে গেল
শেষ সাধনার ধন।

ভিক্ষুক-কন্যা। বাবা, চাইলে হয়ত তুমিও পাবে একখানা কাপড়, মা?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। পাবে পাবে, একটু পা চালিয়ে এসো—

তোর পাওয়ার সময় ছিল যখন
ওরে অবোধ মন,
মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন।

[সকলের প্রস্থান।

[কথা কহিতে কহিতে ষোড়শী ও ফকির সাহেব প্রবেশ করিলেন]

ফকির। যে সব কথা আমার কানে গেছে মা, চুপ করে থাকতে পারলেম না চলে এলাম। কিন্তু, আমি ত কিছুতেই ভেবে পাইনে ষোড়শী, সেদিন কিসের জন্য ও লোকটাকে তুমি এমন কোরে বাঁচিয়ে দিলে।

ষোড়শী। ঐ পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হোতো ফকির সাহেব ?

ফকির। সে বিবেচনার ভার ত তোমার ছিল না মা, ছিল রাজার, তাই তাঁর জেলের মধ্যেও হাসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করেন। কিন্তু, শুধু এই যদি কারণ হয়ে থাকে ত তুমি অন্যায় করেছ বল্‌তে হবে।

[ষোড়শী নিঃশব্দে মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল]

ফকির। যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ত্রুটি তোমাকে শুধ্‌রে নিতে হবে ষোড়শী।

ষোড়শী। তার অর্থ ?

ফকির। ঐ লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই এ তুমি জানো। শাস্তি হওয়া উচিত।

ষোড়শী। [ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া] আমি সমস্ত জানি। তাঁকে শাস্তি দেওয়াই হয়ত আপনাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার কথা কাউকে বল্‌বার নয়। তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোন দিন পারব না।

ফকির। সেদিন পারো নি সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও কি পারবে না ?

ষোড়শী। না।

ফকির। আত্মরক্ষার জন্যেও না ?

ষোড়শী। না, আত্মরক্ষার জন্যেও না।

ফকির। আশ্চর্য্য। [ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া] তুমি ত এখন মন্দিরে যাচ্চো ষোড়শী, আমি তা হ'লে চল্লেম।

[ষোড়শী হেঁট হইয়া নমস্কার করিল ; ফকির প্রস্থান করিলেন। অন্যমনস্কের ন্যায় ষোড়শী চলিবার উপক্রম করিতেই সহসা সাগর দ্রুতবেগে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল]

সাগর। হাঁ মা, তোমার বাবা তারাদাস ঠাকুর নাকি ঘরে ঘরে তালা বন্ধ ক'রে তোমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে ? তারা সবাই মিলে নাকি মৎলব করেছে তোমাকে চণ্ডীমন্দির থেকে বিদায় করে আবার নতুন ভৈরবী আন্‌বে ? সে হবেনা মা, সাগর সর্দ্দার বেঁচে থাক্‌তে তা' হবেনা বলে দিচ্চি।

ষোড়শী। এ খবর তুই কোথায় শুন্‌লি সাগর ?

সাগর। শুনেছি মা, এই মাত্র শুন্‌তে পেয়ে তোমার কাছে জান্‌তে ছুটে এসেছি। তুমি মেয়ে মানুষ, তোমাকে একলা পেয়ে যদি জমিদারের লোক বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে সে কি তোমার অপরাধ ? অপরাধ সমস্ত গ্রামের। অপরাধ এই সাগরের যে কুটুম বাড়ীতে গিয়ে আমোদে মেতেছিল—মায়ের খবর রাখ্‌তে পারেনি। অপরাধ তার খুড়ো হরিহর সর্দ্দারের যে গাঁয়ের মধ্যে উপস্থিত থেকেও এতবড় অপমানের শোধ নিতে পারেনি।

ষোড়শী। কিন্তু এই যদি সত্যি হয়ে থাকে সাগর, তোরা দু'জন খুড়ো ভাইপোতে উপস্থিত থাকলেই বা কি করতিস্‌ বল্‌ ত ? জমিদারের কত লোকজন একবার ভেবে দেখ দিকি।

সাগর। তা' দেখেছি মা। তাঁর ঢের লোক, ঢের পাইক পিয়াদা। গরীব বলে আমাদের দুঃখ দিতেও তারা কম করেনা। কিন্তু দিক্ আমাদের দুঃখ, আমরা ছোটলোক বইত না। কিন্তু তোমার হুকুম পেলে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার এক-বার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের কাছে বলি দিতে পারি, মা, কোন শালা আটকাতে পারবেনা।

ষোড়শী। [শিহরিয়া] বলিস্ কি সাগর, তোরা কি এত নিষ্ঠুর এমন ভয়ঙ্কর হতে পারিস্ ? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের ?

সাগর। এইটুকু ? তোমার গায়ে হাত দেওয়াকে তুমি এইটুকু বল মা ? তারাদাস ঠাকুরকেও আমরা মাপ করতে পারি, জনার্দ্দন রায়কেও হয়ত পারি, কিন্তু সুবিধে পেলে জমিদারকে আমরা সহজে ছাড়বনা। [ক্ষণেক থামিয়া] কিন্তু ওরা যে সব বলাবলি করে মা, তুমি নাকি ওঁকেই সে রাত্রে হাকিমের হাত থেকে রক্ষে করেছ ? না কি বলেছ, তোমাকে ধরে নিয়ে কেউ যায়নি, নিজে ইচ্ছে করেই গিয়েছিলে ?

ষোড়শী। এমন ত হতে পারে সাগর, আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম।

সাগর। তাই ত বিষম খটকা লেগেছে মা, তোমার মুখ দিয়ে ত কখনো মিছে কথা বার হয়না। তবে এ কি! কিন্তু সে যাই হোক, যাই

কেননা গ্রামশুদ্ধ লোকে বলে বেড়াক, আমরা ক'ঘর ছোট জাত তোমায় ভূমিজ প্রজারা তোমাকেই মা বলে জেনেছি; যদি চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাও মা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো, কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাবো যে কারা গেল!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ষোড়শী। সাগর! একটা কথা তোকে বল্‌তে পারলেমনা বাবা, তোদের দায়িত্ব হয়ত আর বইতে আমি পারবনা।

[এককড়ির প্রবেশ]

ষোড়শী। কে, এককড়ি?

এককড়ি। (সসম্ভ্রমে) আপনার কাছেই এলাম। হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ষোড়শী। কোথায়?

এককড়ি। কাছারিতে বসে প্রজাদের নালিশ শুন্‌ছেন। যদি অনুমতি করেন ত পাল্‌কি আন্‌তে পাঠাই।

ষোড়শী। পাল্‌কি? এটি তাঁর প্রস্তাব, না তোমার সুবিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি। আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ হুজুরের স্বয়ং আদেশ।

ষোড়শী। (হাসিয়া) তোমার হুজুরের বিবেচনা আছে তা জানি, কিন্তু সম্প্রতি পাল্‌কি চড়বার আমার ফুরসৎ নেই এককড়ি। হুজুরকে বোলো আমার অনেক কাজ।

এককড়ি। ও বেলায় কিম্বা কাল সকালেও কি সময় হবেনা?

ষোড়শী। না।

এককড়ি। কিন্তু হলে ভাল হোতো। আরও দশ-জন প্রজার নালিশ আছে কিনা।

ষোড়শী। [কঠোর স্বরে] তাঁকে বোলো এককড়ি, বিচার করার মত বুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজাদের করুনগে। আমি তাঁর প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে।

[ষোড়শী দ্রুত পদে প্রস্থান করিল, এবং এককড়ি কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া হৈম ও নির্ম্মল প্রবেশ করিল। হৈমর হাতে পূজার উপকরণ]

হৈম। যে দয়ালু লোকটি তোমাকে সেদিন অন্ধকার রাতে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন, সত্যি বল তিনি কে? তাঁকে আমি চিনেছি।

নির্ম্মল। চিনেছ? কে বলত তিনি?

হৈম। আমাদের ভৈরবী! কিন্তু তুমি তাঁকে পেলে কোথায় তাই শুধু আমি ঠাউরে উঠতে পারিনি।

নির্ম্মল। পারোনি? পেয়েছিলাম তাঁকে অনেক দূরে। তোমাদের ফকির সাহেবের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনে ভারি কৌতূহল হয়েছিল তাঁকে দেখবার। খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম, নদীর পারে তাঁর আশ্রম, সেখানে গিয়ে দেখি তোমাদের ভৈরবী আছেন বসে।

হৈম। তার কারণ, ফকিরকে তিনি গুরুর মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সত্যিই কি তোমাকে একেবারে হাত ধরে অন্ধকারে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলেন?

নির্ম্মল। সত্যিই তাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন প্রচণ্ড ঝড়-জলের মধ্যে ভয়ঙ্কর অন্ধকারে অজানা পথে আমি অন্ধের সমান, নারী হয়েও তিনি অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু পরের জন্য এ কাজ তুমি পারতেনা হৈম।

হৈম। না।

নির্ম্মল। তা' জানি। [ক্ষণেক থামিয়া] দেখ হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিন্‌তে পারিনি সত্যি, কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বুঝেছি এঁর সম্বন্ধে বিচার করায় ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটেনা। হয়, সতীত্ব জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই বাহুল্য বস্তু,—তোমাদের মত যথার্থ রূপটা ইনি চেনেননা, না হয়, [illegible] দুর্নাম এঁকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করতে পারেনা।

হৈম। তুমি কি সেদিনের জমিদারের ঘটনা মনে ক'রেই এই সব বল্‌চো?

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য নয়। শাস্ত্রে বলে সাত পা একসঙ্গে গেলেই বন্ধুত্ব হয়। অত বড় পথটায় ওই দুর্ভেদ্য আঁধারে একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করে অনেক পা গুটি গুটি এক সঙ্গে গেলাম, একটি একটি ক'রে অনেক প্রশ্নই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেম, কিন্তু পূর্ব্বেও যে-রহস্যে ঢাকা ছিলেন পরেও ঠিক তেমনি রহস্যেই গা ঢাকা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন,— কিছুই তাঁর হদিস্ পেলাম না।

হৈম। তোমার জেরাও মান্‌লেননা, বন্ধুত্বও স্বীকার করলেননা?

নির্ম্মল। না, গো না, কোনটাই না!

হৈম। [হাসিয়া ফেলিয়া] একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্মল। এতবড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়েই বার করে নিতে চাও নাকি? কিন্তু নিজেকে জান্‌তেও যে দেরী লাগে হৈম।

হৈম। দেরী লাগুক তবু পুরুষের হয়। কিন্তু মেয়ে মানুষের এম্‌নি অভিশাপ আমরণ নিজের অদৃষ্ট বুঝ্‌তেই তার কেটে যায়।

নির্মল। (হৈমের হাত ধরিয়া) তুমি কি পাগল হয়েছ হৈম? চল, আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাই, হয়ত, পুজোর বিলম্ব হয়ে যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দির

[গড়চণ্ডীর মন্দির ও সংলগ্ন প্রশস্ত অলিন্দ। সম্মুখে দীর্ঘ প্রাকার বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে নাটমন্দিরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। দক্ষিণদিকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পথ। সকালে কাঁচা রোদের আলো চারিদিকে পড়িয়াছে; মন্দিরের অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনার্দন রায়, শিরোমণি ঠাকুর, নির্মল বসু, ষোড়শী হৈম এবং আরও কয়েকজন নরনারী।

শিরোমণি। (ষোড়শীকে) আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিতেছেন তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না, তাঁর এই সংকল্প তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য্য সুসিদ্ধ হবে না।

ষোড়শী। (পাণ্ডুর মুখে) বেশ, তাঁর কাজ যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

শিরোমণি। কেবল এইটুকুই ত নয়! আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না! মায়ের ভৈরবী তোমাকে রাখ্‌লে আর চলবে না। কে আছ, একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাকো ত।

[একজন ডাকিতে গেল]

ষোড়শী। কেন চলবে না?

জনৈক ব্যক্তি। সে তোমার বাবার মুখেই শুন্‌তে পাবে।

জনার্দন। আগামী চৈত্রসংক্রান্তিতে নতুন ভৈরবী অভিষেক হবে, আমরা স্থির করেচি।

[তারাদাস একটী দশ বছরের মেয়ে স[illegible] করিয়া প্রবেশ করিল]

হৈম। (তারাদাসের দিকে চাহিয়া) যা সম[illegible] শুন্‌চি বাবা, তাতে কি ওঁর কথাই সত্যি ব[illegible] মেনে নিতে হবে?

জনার্দন। নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম। (ছোট মেয়েটীকে দেখাইয়া) ঐটীকে যখ[illegible] উনি যোগাড় করে এনেছেন তখন মিথ্যে ক[illegible] কি ওঁর এতই অসম্ভব? তাছাড়া সত্যি মিথে[illegible] যাচাই করতে হয় বাবা, শুধু এক তরফা র[illegible] দেওয়া চলে না। (সকলেই বিস্মিত হইল)

শিরোমণি। (স্মিতহাস্যে) বেটি কৌসুলির মি[illegible] কিনা তাই জেরা ধরেচে। আচ্ছা, আমি মি[illegible] থামিয়ে। (হৈমকে) এটা দেবীর মন্দির[illegible] পীঠস্থান! বলি এটাত মানিস?

হৈম। (ঘাড় নাড়িয়া) মানি বৈকি!

শিরোমণি। তা যদি হয়, তাহলে তারাদাস বামুনে[illegible] ছেলে হয়ে কি দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে মিছে [illegible] কইচে পাগলি? (প্রবল হাস্য করিলেন)।

হৈম। আপনি নিজেও ত তাই, শিরোমণি মশা[illegible] অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে ক[illegible] সৃষ্টি করে গেলেন। আমিত [illegible] ওঁকে দিয়ে কাজ করালে আমার সি[illegible]বেনা।

[শিরোমণি হতবুদ্ধির মত হইলেন]

জনার্দন। (কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে) বলনি[illegible] রকম?

হৈম। না বাবা বলিনি। বলা দূরে থাক্‌, ও ম[illegible] আমি মনেও করিনে। বরঞ্চ ওঁকে দিয়েই অ[illegible] পূজো করাবো এতে ছেলের আমার কল্যা[illegible] হোক, আর অকল্যাণই হোক্‌। (ষোড়[illegible] প্রতি) চলুন মন্দিরের মধ্যে—আমাদের স[illegible] বয়ে যাচ্চে।

জনার্দন। (ধৈর্য্য হারাইয়া অকস্মাৎ উঠি[illegible] দাঁড়াইয়া ভীষণ কণ্ঠে) কখনো না। আ[illegible] বেঁচে থাক্‌তে ওকে কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে [illegible] না। তারাদাস, বলত ওর মায়ের কথাট[illegible] একবার শুনুক সবাই।

শিরোমণি। (সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া) [illegible] তারাদাস থাক্‌। ওর কথা আপনার মে[illegible] হয়ত বিশ্বাস করবে না রায় মশায়।

বলুক। চণ্ডীর দিকে মুখ করে ওই নিজের মায়ের কথা নিজে বলে যাক্। কি বল চাটুয্যে? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্‌চায? কেমন? ও-ই নিজে বলুক।

[ষোড়শীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল]

হৈম। আপনারা ওঁর বিচার করতে চান্ নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এত বড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেবো না। (ষোড়শীর প্রতি) চলুন আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে—

ষোড়শী। না বোন, আমি পূজো করিনে, যিনি একাজ নিত্য করেন তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়! (পূজারীর প্রতি) কিন্তু,—ছোট্‌ঠাকুর মশাই তুমি ইতস্ততঃ কোরচ কিসের জন্যে? আমার আদেশ রইলো দেবীর পূজা যথারীতি সেরে তুমি নিজের প্রাপ্য নিয়ো। বাকী মন্দিরের ভাঁড়ারে বন্ধ কোরে চাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো! (হৈমর প্রতি) আমি আবার আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি এতেই তোমার ছেলের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হবে।

[ষোড়শী প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন পুরোহিত পূজার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন]

জনার্দ্দন। (নির্ম্মল ও হৈমর প্রতি) যাও মা তোমরাও পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে যাও,—পূজোটি যাতে সুসম্পন্ন হয় দেখোগে।

[নির্ম্মল ও হৈম মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন]

জনার্দ্দন। যাক্ বাঁচা গেছে শিরোমণি মশায়, ষোড়শী আপনিই চলে গেল। ছুঁড়ি জিদ করে যে আমার নাতির মানস-পূজাটি পণ্ড করে দিলেনা এই ঢের।

শিরোমণি। এ যে হতেই হবে ভায়া, মা মহামায়ার মায়া কি কেউ রোধ করতে পারে? এ যে ওঁরই ইচ্ছে।

[এই বলিয়া তিনি যুক্তকরে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন]

যোগেন ভট্‌চায। (গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) অ্যাঁ, এ যে স্বয়ং হুজুর আসছেন।

[সকলেই ত্রস্ত এবং চকিত হইয়া উঠিল। জীবানন্দ ও তাঁহার পশ্চাতে কয়েকজন পাইক ও ভৃত্য প্রভৃতি প্রবেশ করিল]

শিরোমণি ও জনার্দ্দন রায়। আসুন, আসুন, আসুন। (কেহ নমস্কার করিল, অনেকেই প্রণাম করিল)

জনার্দ্দন। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন। আজ আমার দৌহিত্রের কল্যাণে মায়ের পূজা দেওয়া হচ্চে।

জীবানন্দ। বটে? তাই বুঝি বাইরে এত জন সমাগম?

[জনার্দ্দন সবিনয়ে মুখ নত করিলেন]

শিরোমণি। হুজুরের দেহটি ভাল আছে?

জীবানন্দ। দেহ? (হাসিয়া) হাঁ ভালই আছে তাই ত আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, বহুলোকে ভিড় করে এই দিকে আসচে। সঙ্গ নিলাম। অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণ এবং সাধু-সঙ্গ তিনটেই বরাতে জুটে গেল। কিন্তু, রায়মশায়কেই জানি, আপনাকেত বেশ চিনতে পারলামনা ঠাকুর?

জনার্দ্দন। ইনি সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি। প্রাচীন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, গ্রামের মাথা বললেই হয়।

জীবানন্দ। বটে? বেশ, বেশ, বড় আনন্দ লাভ করলাম। তা এইখানেই একটু বসা যাকনা কেন?

[বসিতে উদ্যত হইলে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

শিরোমণি। (চীৎকার করিয়া) আসন, আসন বসবার একটা আসন নিয়ে এসো কেউ—

জীবানন্দ। ব্যস্ত হবেন না শিরোমণি মশাই, আমি অতিশয় বিনয়ী লোক। সময় বিশেষে রাস্তায় শুয়ে পড়তেও অভিমান বোধ করিনে,—এতো ঠাকুর বাড়ী। বেশ বসা যাবে।

[জীবানন্দ উপবেশন করিলেন]

জনার্দ্দন। একটা গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে আমরা সবাই আপনার কাছে যাবো স্থির করেছিলাম, শুধু আপনি পীড়িত মনে করেই যেতে পারিনি।

জীবানন্দ। গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে?

শিরোমণি। হাঁ হুজুর, গুরুতর বই কি। ষোড়শী ভৈরবীকে আমরা কেউ চাইনে।

জীবানন্দ। চাননা?

শিরোমণি। না, হুজুর।

জীবানন্দ। একটুখানি জনশ্রুতি আমার কানেতেও পৌঁচেছে। ভৈরবীর বিরুদ্ধে আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

[সকলেই নীরব রহিল]

জীবানন্দ। বলতে কি আপনাদের করুণা বোধ হচ্চে?

জনার্দন। হুজুর সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের অভিযোগ—

জীবানন্দ। কি অভিযোগ?

জনার্দন। আমরা গ্রামস্থ ষোল-আনা ইতর ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ। (একটু হাসিয়া) তা দেখ্‌তে পাচ্ছি। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ওইটী কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয়?

[তারাদাস সাড়া দিল না, মাটীতে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিল]

শিরোমণি। (সবিনয়ে) রাজার কাছে প্রজা সন্তান-তুল্য, তা সে দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীকে আমরা নিশ্চয় স্থির করেছি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমার নিবেদন, হুজুর তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জীবানন্দ। (চকিত) কেন? তার অপরাধ?

দু'তিন জন ব্যক্তি। (সমস্বরে) অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ। তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেছেন রায়মশায়, যার জন্য তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক?

[জনার্দন শিরোমণিকে বলিতে চোখের ইঙ্গিত করিল]

জীবানন্দ। না, না, উনি অনেক পরিশ্রম করেছেন, বুড়ো মানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

জনার্দন। (চোখে ও মুখে দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভাব আনিয়া)। ব্রাহ্মণকন্যা—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ। গো-ব্রাহ্মণে আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উঠে পড়ে লেগেছেন তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েছে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

জনার্দন। (শিরোমণির প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া) হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্ছেন তখন আ[র] ভয় কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন না।

শিরোমণি। (ব্যস্ত হইয়া) সত্যি কথায় কিসের জনার্দন? তারাদাসের মেয়েকে আ[র] আমরা কেউ রাখবো না হুজুর! তার স্ব[ভাব] চরিত্র ভারি মন্দ হয়ে গেছে,—এই আপনা[কে] আমরা জানিয়ে দিচ্ছি।

[জীবানন্দর পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্[মাৎ] গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল]

জীবানন্দ। তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খ[বর] আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন?

[সকলে ঘাড় নাড়িল]

জীবানন্দ। তাই সুবিচারের আশায় বেছে বে[ছে] একেবারে ভীষ্ম দেবের শরাপন্ন হয়ে[ছেন] রায়মশায়?

শিরোমণি। আপনি দেশের রাজা,—সুবিচার ক[রুন] অবিচার বলুন, আপনাকেই করতে হ[বে] আমাদেরও তাই মাথা পেতে নিতে হ[বে] সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

জীবানন্দ। (মৃদু হাসিয়া) দেখুন শিরোমণি ম[শায়] অতি-বিনয়ে আপনাদেরও খুব ছোট হয়ে [যাবার] নেই, অতি-গৌরবে আমাকেও [আকাশে] তোলবার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু জা[নতে] চাই এ অভিযোগ কি সত্য?

[অনেকেই উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল]

শিরোমণি। অভিযোগ? সত্য কিনা!—আ[মাদের] আমরা না হয় পর, কিন্তু তারাদাস, তু[মি] বল্তে রাজদ্বার, যথাধর্ম্ম বোলো—

[তারাদাস একবার পাংশু একবার [রক্তবর্ণ] হইয়া উঠিতে লাগিল। জনার্দনের ক্রুদ্ধ এ[বং] দৃষ্টি খোঁচা মারিয়া যেন তাহাকে বারম্বার উ[ত্তেজিত] করিতে লাগিল। সে একবার ঢোঁক গিলিয়া একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল]

তারাদাস। হুজুর—

জীবানন্দ। (হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া) ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কলঙ্কের কথ[া] আমি যথাধর্ম্ম বললেও শুনবনা। বরং আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম্ম বলুন।

[ভৃত্য অন্তরালে ছিল, সে টম্‌ব্লার ভরিয়া ইসপি সোডা প্রফুল্লর হাতে আনিয়া দিল। তিনি ক নিশ্বাসে পান করিয়া বেহারার হাতে ফিরাইয়া লেন]

জীবানন্দ। আঃ—বাঁচলাম। আপনাদের অজস্র বাক্য-সুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপ্‌চাপ যে! কি হ'ল আপনাদের যথাধর্ম্মের?

[শিরোমণি নাকে কাপড় দিয়াছিলেন]

জীবানন্দ। (সহাস্যে) শিরোমণি মশায় কি ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের কাজটা সেরে নিলেন নাকি?

[অনেকেই হাসিয়া মুখ ফিরাইল]

শিরোমণি। (হতবুদ্ধি হইয়া) এই যে বলি হুজুর। আমি যথাধর্ম্মই বলব।

জীবানন্দ। (ঘাড় নাড়িয়া) সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু, একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাটা যদি বা থাকে, ধর্ম্মটা থাকবে কি? আমার নিজের বিশেষ কোন আপত্তি নেই,—ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে,—তবু আমি বলি ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্ত্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান্—এই না?

সকলে। (মাথা নাড়িয়া)—হাঁ, হাঁ।

জীবানন্দ। এঁকে নিয়ে আর সুবিধা হচ্ছে না?

শিরোমণি। (প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া) সুবিধে অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া ফেলিয়া) অর্থাৎ গ্রামের ভাল মন্দের আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার ভালমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কিনা জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায় না? দেখুন না চেষ্টা করে। বরঞ্চ, আমাদের এককড়িটিকেও না হয় সঙ্গে নিন্, এ বিষয়ে তার বেশ একটু হাতযশ আছে।

[সকলে অবাক হইয়া রহিল]

জীবানন্দ। এঁদের সতীপনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাকে আর নাড়া-চাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাকলেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবদেরও ভৈরবী নইলে চলে না, এ অতি সনাতন প্রথা,—সহজে টলানো যাবে না। দেশশুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত বা দেবী নিজেও খুসী হবেন না,—একটা হাঙ্গামা বাধবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তাঁর নাকি হাতে গোণা যেতনা। কি বলেন, শিরোমণি মশাই, আপনিত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব?

শিরোমণি। (শুষ্কমুখে জনান্তিকে) কি জানি, শুনেছে না কি!

[প্রফুল্ল প্রবেশ করিল, তার হাতে ইংরিজি বাংলা কয়েকখানা সংবাদ-পত্র ও কতগুলো খোলা চিঠি পত্র]

জীবানন্দ। কিহে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে।

প্রফুল্ল। (ঘাড় নাড়িয়া) সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধা হোতো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এগুলো দেখবার কি এখন সময় হবে? অত্যন্ত জরুরী।

জীবানন্দ। তা বুঝেছি, নইলে এখানে আনবে কেন? কিন্তু দেখবার সময় আমার এখনও হবে না, অন্য সময়েও হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্ছে। ওই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি কার, উকিলের, না একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা ত দেখচি সলোমন সাহেবের। বাঁটা, বিলিতি সুধার গন্ধ যেন কাগজ ফুঁড়ে বার হচ্চে। কি বলেন সাহেব? ডিক্রী-জারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা হেঁচ্‌ড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রাহ্মণ্য তেজ কিছু যদি বাকি থাক্‌তো, তো এই ইহুদি ব্যাটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধতে হোতো না।

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল হইয়া) কি বলচেন দাদা? থাক্, থাক্ আর এক সময় হবে। (ফিরিতে উদ্যত হইল)।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) আরে লজ্জা কি ভায়া, এঁরা সব আপনার লোক, জ্ঞাতগোষ্ঠী, এমন কি মণিমাণিক্যের এপিঠ ওপিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না! তাছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরি-মৃগ; সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই? প্রফুল্ল, রাগ কোরোনা ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে

বড় বাকি রাখিনি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারবো বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ নোট্ টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আনতে পারতে হে—

প্রফুল্ল। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিয়া) দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবে না। সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ। (গম্ভীর হইয়া) সন্ধান করে নিয়ে আসেন? তাহলে ত বেঁচে যাই প্রফুল্ল। রায় মশায়, আপনি ত গুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

জনার্দন। (ম্লান মুখে উঠিয়া) বেলা হ'ল যদি অনুমতি করেন ত—

জীবানন্দ। বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লর ঝাঁক বেড়ে যাবে। তাছাড়া ভৈরবীর কথাটাও শেষ হয়ে যাক্। কিন্তু আমি যাও বল্‌লেই কি সে যাবে?

জনার্দন। সে ভার আমাদের।

জীবানন্দ। কিন্তু আর কাউকেত বাহাল করা চাই। ও ত খালি থাকতে পারে না।

অনেকে। সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ। যাক্ বাঁচা গেল, তবে সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা চণ্ডীও সাম্‌লাতে পারেন না। আপনাদের লাভ লোক্‌সান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা, কেউ দেখ্‌তরে এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা এদিকে যে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেয়ারা। (প্রবেশ করিয়া প্রভুর ব্যগ্র-ব্যাকুল হস্তে পূর্ণ-পাত্র দিয়া) তিনি রান্না-বাড়ীর ঘরগুলো দেখ্‌চেন।

জীবানন্দ। এর মধ্যেই? ডাক তাকে। (মদ্যপান)

[ইহার পর হইতে পূজার্থীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল ও পূজা শেষ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল—তাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল]

[এককড়ি প্রবেশ করিল]

জীবানন্দ। আজ যে ভৈরবীকে তলব করেছিলাম, কেউ তাকে খবর দিয়েছিল?

এককড়ি। আমি নিজে গিয়েছিলাম।

জীবানন্দ। তিনি এসেছিলেন?

এককড়ি। আজ্ঞে না।

জীবানন্দ। না কেন? (এককড়ি অধোমুখে নীর[illegible]) তিনি কখন আসবেন জানিয়েছেন?

এককড়ি। (তেমনি অধোমুখে) এত লোকে[র] সামনে আমি সে কথা হুজুরে পেশ করতে পা[রি] না।

জীবানন্দ। এককড়ি তোমার গোমস্তাগিরি কায়[দা] একটু ছাড়। তিনি আসবেন, না, না?

এককড়ি। না।

জীবানন্দ। কেন?

এককড়ি। তিনি আসতে পারবেন না। [তি]নি বল্লেন, তোমার হুজুরকে বোলো এককড়ি, [য]ে বিচার করবার মত বিদ্যে বুদ্ধি থাকেত নি[জের] প্রজাদের করুনগে—আমার বিচার কর[বার] জন্যে আদালত খোলা আছে।

জীবানন্দ। (অন্ধকারমুখে) হুঁ—আচ্ছা তুমি য[াও]

[এককড়ির প্রস্থান]

প্রফুল্ল সেই যে চিনির কোম্পানীর সঙ্গে [ছা]বিশে জমি বিক্রীর কথা হয়েছিল তার [চিঠি] লেখা হয়েছে?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে, হয়েছে।

জীবানন্দ। এক্ষুণি তুমি গিয়ে সেটা পাকা[পাকি] করগে। লিখে দাও জমি তারা পাবেন।

প্রফুল্ল। তাই হবে।

[পূজার্থী ও পূজার্থিনীরা যাইতেছে আসিতে[ছে]

জীবানন্দ। আজ যে পূজার বড় ভিড় দেখ্‌ছি, রোজই এই রকম?

জনার্দন। আজকের একটু বিশেষ আয়োজ[ন] আছেই, তাছাড়া এই চড়কের সময়টায় বি[শেষ] ধরে এমনিই হয়। লোকজনের ভিড় বাড়তেই থাকবে।

জীবানন্দ। তাই না কি? বেলা হ'ল, এখ[ন] হ'লে আসি। (হাসিয়া) একটা মজা দে[খুন] রায় মশায়, চণ্ডীগড়ের লোকগুলো প্রায়ই [জানে না] যায় যে জমিদার এখন কালীমোহন [নয়,] জীবানন্দ চৌধুরী। অনেক প্রভেদ না?

[জনার্দন কি যে জবাব দিবে ভাবিয়া পাই[ল না] শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

জীবানন্দ। এখানে বীজগাঁর প্রজা নয় এমন একটা প্রাণীও নেই। ঠিক না শিরোমণি মশায়?

শিরোমণি। তাতে আর সন্দেহ কি হুজুর!

জীবানন্দ। না, আমার সন্দেহ নেই, তবে আর কারও না সন্দেহ থাকে। আচ্ছা, নমস্কার শিরোমণি মশায়, চল্লাম। (হাসিয়া) কিন্তু, ভৈরবী বিদায়ের পালাটা শেষ করা চাই। চল প্রফুল্ল, যাওয়া যাক!

[প্রস্থান।

শিরোমণি। (জমিদার সত্যই গেল কিনা উঁকি মারিয়া দেখিয়া) জনার্দ্দন, কিরূপ মনে হয় ভায়া?

জনার্দ্দন। মনে ত অনেক কিছুই হয়।

শিরোমণি। মহাপাপিষ্ঠ,—লজ্জা সরম আদৌ নেই।

জনার্দ্দন। (গম্ভীরমুখে) না।

শিরোমণি। ভারি দুর্ম্মুখ। মানীর মান-মর্য্যাদার জ্ঞান নেই।

জনার্দ্দন। না।

শিরোমণি। কিন্তু দেখলে ভায়া কথার ভঙ্গী? সোজা না বাঁকা, সত্য না মিথ্যা, তামাসা না তিরস্কার, ভেবে পাওয়াই দায়। অর্দ্ধেক কথাত বোঝাই গেল না যেন হেঁয়ালি। পাষণ্ড সত্যি বল্‌লে না আমাদের বাঁদর নাচালে ঠিক ঠাহর করা গেল না। জানে সব, কি বল?

[জনার্দ্দন নিরুত্তর]

শিরোমণি। যা ভাব্‌ছিলাম তাই। ব্যাটা হাবা গোবা নয়—বিশেষ সুবিধে হবে না বলেই যেন শঙ্কা হচ্চে, না?

জনার্দ্দন। মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি। তার আর কথা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। না গেল একে ধরা, না গেল তাকে মারা। তোমার কি ভায়া, পয়সার জোর আছে, ছুঁড়ী যক্ষের মত আগলে আছে, গেলে সুমুখের বাগান-বেড়াটা তোমার টানা দিব্য চৌকোশ হতে পারবে! কিন্তু বাঘের গর্ত্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষে আমি মারা পড়ি।

জনার্দ্দন। আপনি কি ভয় পেয়ে গেলেন না কি?

শিরোমণি। না না, ভয় নয়, ভয় নয়,—কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেলে তা তো তোমারও মুখ দেখে অনুভব হচ্চে না। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই,—কথাও যেমন হেঁয়ালি, কাজও তেমনি অদ্ভুত! ও যে ধরে গলা টিপে মদ খাইয়ে দেয়নি এই আশ্চর্য্য। এককড়ির মুখে ভৈরবী ঠাকরুণের হুমকিও ত শুন্‌লে? তোমরা চুপ করে ছিলে আমিই যেন কথা কয়েছি,—ভাল করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় না কি। দুয়ের মাঝখানে পড়ে শেষকালে না বেড়াজালে ধরা পড়ি!

জনার্দ্দন। (উদাসকণ্ঠে) সকলই চণ্ডীর ইচ্ছে। বেলা হ'ল, সন্ধ্যের পর একবার আস্‌বেন।

শিরোমণি। তা' আস্‌বো। কিন্তু ঐযে আবার এঁরা ফিরে আস্‌চেন হে!

[মন্দির-প্রাঙ্গণের একটা দ্বার দিয়া ষোড়শী ও তাহার পশ্চাতে সাগর ও তাহার সঙ্গী প্রবেশ করিল। অন্যদ্বার দিয়া জীবানন্দ, প্রফুল্ল, ভৃত্য ও কয়েকজন পাইক প্রবেশ করিল]

জীবানন্দ। চলে যাচ্ছিলাম, শুধু তোমাকে আসতে দেখে ফিরে এলাম! এককড়িকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এবং তারই মুখে তোমার জবাবও শুন্‌লাম। তোমার বিরুদ্ধে রাজার আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার বুদ্ধি আমার নেই, কিন্তু নিজের প্রজাদের শাসনে রাখবার বিদ্যে জানি। সমস্ত গ্রামের প্রার্থনা মত তোমার সম্বন্ধে কি আদেশ করেছি শুনেছ?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তোমাকে বিদায় করা হয়েছে। নূতন ভৈরবী করে, তাকে মন্দিরের ভার দেওয়া হবে। অভিষেকের দিনও স্থির হয়ে গেছে! তুমি আজ মশায় প্রভৃতির হাতে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে! এ বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে?

ষোড়শী। আমার বক্তব্যে আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ। না, নেই। তবে আজ সন্ধ্যার পরে এইখানেই একটা সভা হবে। ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পারো। ভাল কথা, শুন্‌তে পেলাম আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের না কি তুমি বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা কোরচ?

ষোড়শী। তা জানিনে। তবে আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ। (অধর দংশন করিয়া) পারবে?

ষোড়শী। পারা না পারা মা চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ। তারা মরবে।

ষোড়শী।— মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

[ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যে সে কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে]

জীবানন্দ। (এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া) তোমার নিজের প্রজা আর কেউ নাই। তারা যাঁর প্রজা তিনি নিজে দস্তখত করে দিয়েছেন। তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ষোড়শী। (মুখ তুলিয়া) আপনার আর কোন হুকুম আছে ? নেই ? তাহলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

জীবানন্দ। বল।

ষোড়শী। আজ দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই, এবং সন্ধ্যায় মন্দিরের কোথাও সভা-সমিতির স্থানও হবে না। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি। (সহসা চীৎকার করিয়া) কখনো না ! কিছুতেই নয় ! এসব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে না বলে দিচ্ছি,—

[জীবানন্দ ছাড়া সকলেই ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল]

জনার্দ্দন। (উষ্মার সহিত) তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর জায়গা কেন হবে না শুনি ঠাকরুণ ?

ষোড়শী। (বিনীতকণ্ঠে) আপনি ত জানেন রায় মশাই, এখন চড়কের উৎসব। যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায় ?

জনার্দ্দন। (আত্মবিস্মৃত হইয়া সগর্জ্জনে) হতেই হবে ! আমি বলছি হতে হবে !

ষোড়শী। (জীবানন্দকে) ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তবে ওসব করবার এখন সুযোগ হবে না, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়া বলে দেবেন। আমার সময় অল্প ; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চল্‌লাম।

জীবানন্দ। (তপ্তস্বরে) কিন্তু আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি, আজই এসব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

ষোড়শী। জোর কোরে ?

জীবানন্দ। হাঁ জোর কোরে ?

ষোড়শী। সুবিধে অসুবিধে যাই-ই হোক ?

জীবানন্দ। হাঁ, সুবিধে অসুবিধে যাই-ই হোক।

ষোড়শী। (পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে সাগরকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া) সাগর, তোদে[র] সমস্ত ঠিক আছে ?

সাগর। (সবিনয়ে) আছে মা, তোমার আশীর্ব্বা[দে] অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী। বেশ। জমিদারের লোক আজ একট[া] হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে[।] এই গাজনের সময়টায় রক্তপাত হয় আমা[র] তা ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে[।] এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ, এদে[র] কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় ন[া] আসতে পারে। হঠাৎ মারিস্‌নে,—শুধু বা[র] করে দিবি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ষোড়শীর কুটীর

[সন্ধ্যা এইমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। গৃহে অভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাহিরে ষোড়[শী] উপবিষ্ট। এমনি সময়ে নির্ম্মল ও হৈম প্রবে[শ] করিল। পিছনে ভৃত্য।

ষোড়শী। এস, এস, কিন্তু এ কি কাণ্ড ! তোমাদে[র] যে আজ দুপুরের গাড়ীতে যাবার কথা ছিল ?

[নির্ম্মল ও হৈম নিকটে উপবেশন করিল]

হৈম। কথা ছিল, কিন্তু যাইনি। এঁকেও যে[তে] দিইনি। দিদির এই নতুন ঘরখানি চোখে দে[খে] না গেলে দুঃখ করতে হোতো।

নির্ম্মল। চোখে দেখে গিয়েও দুঃখ কম করতে হ[বে] মনে হয় না।

হৈম। সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখলেই ছি[ল] ভাল। এ ঘরের আর যা দোষ থাক্, অপবাদে[র] অপবাদ শিরোমণি মশায় কেন, বোধ হয় আম[ার] বাবাও দিতে পারেন না। কিন্তু এ পাগলা[মি] কেন করতে গেলে দিদি, এ ঘরে ত তুমি থাক[তে] পারবে না !

ষোড়শী। এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে ব[হু] মানুষকে ত থাকতে হয় ভাই।

ম। তা'হলে সত্যিই কি তুমি সব ছেড়ে দেবে?

র্মল। তা' ছাড়া কি উপায় আছে বল্‌তে পারো? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক দিবানিশি বিবাদ করে টিক্‌তে পারে না।

হেম। আমরা সমস্তই শুনেছি। তুমি সন্ন্যাসিনী, সবই তোমার সইবে কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী। দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয় সইবে না কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু সেই মিথ্যে কথার সঙ্গে ঝগড়া করে মিথ্যে কাজের সৃষ্টি করতে আমার লজ্জা করে বোন্‌।

হেম। দিদি, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার সব কথা আমরা বুঝতে পারিনে, কিন্তু তোমাকে দেখে কি আমার মনে হয় জানো? আমার শ্বশুরকে কোন্ এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন। খাপখানা তার ধুলো বালিতে মলিন হয়ে গেছে কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও একটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা, তেমনি খাঁটি, তেমনি কঠিন। তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয় দেশশুদ্ধ লোকে সবাই ভুল করেছে, আসল কথা কেউ কিছুই জানে না।

ষোড়শী। (হৈমের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া লইয়া) আজ তোমাদের কেন যাওয়া হ'ল না হৈম? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে, না?

হৈম। আমার ছেলের কথা তুললেই তুমি রাগ কর, সে আর বোলব না, কিন্তু ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাতে আমার এই অন্ধ মানুষটিকে যিনি হাত ধ'রে নদী পার কোরে এনে নিঃশব্দে দিয়ে গেছেন, তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়েই বা আমরা যাই কি ক'রে? কিন্তু যাবার আগে এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয়, এই প্রবাসী বোনটিকে তখন ভুলো না।

হৈম। (ষোড়শীকে নীরব দেখিয়া) কথা দিতে বুঝি চাওনা দিদি?

ষোড়শী। কথা দিলাম, ভুলবনা। ভুলিওনি হৈম। আঘাত পেয়ে পেয়ে আজই তোমাকে একখানা চিঠি লিখ্‌ছিলাম, ভেবেছিলাম, তুমি চলে গেলে সেখানা তোমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু শেষ করতে পারলামনা, হঠাৎ মনে পড়লো এর জন্যে হয়ত তোমার বাবার সঙ্গেই শেষ বিবাদ বেধে যাবে।

হৈম। যেতেও পারে। কিন্তু আরও যে [illegible] মস্ত কথা আছে দিদি। আমার [illegible] মানুষটিকে তুমি রক্ষে করেছ তা [illegible] সংসারে ত আমার কিছুই নেই।

ষোড়শী। সত্যিই কিছু নেই হৈম।

হৈম। না, নেই। আর এই সত্যি কথাটিই বলে যাবো বলে আজ যেতে পারিনি।

ষোড়শী। (হাসিয়া) কিন্তু এই ছোট্ট কথাটুকুর জন্যে ত একজনই যথেষ্ট ছিল ভাই, নির্মলবাবুকে অনায়াসে যেতে দিতে পারতে?

হৈম। এঁকে? একলা? হায়, হায়, দিদি, বাইরে থেকে তোমরা ভাবো প্রচণ্ড ব্যারিষ্টার, মস্ত লোক। কিন্তু আমিই জানি শুধু এই বিনি মাইনের দাসীটিকে পেয়েছিলেন বলেই উনি জগতে টিকে গেলেন। বাস্তবিক দিদি, পুরুষ [illegible] এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বাইরের দিকে [illegible] যতবড়, যত দুর্দ্দাম, যত শক্তিমান, [illegible] দিকে তিনি তেমনি অক্ষম, তেমনি দুর্বল, তেমনি অপটু। দরকারের সময় কোথায় হারাবে এঁদের কাগজ-পত্র, বার হবার সময়ে কোথায় যাবে জামা-কাপড়-পোষাক, রাস্তায় বেরিয়ে কোথায় ফেল্‌বে পকেটের টাকাকড়ি —কোন্ ভরসায় একলা ছেড়ে দিই বল ত? (সহাস্যে) একটুখানি চোখের আড়াল করেছিলাম বলেই ত সেদিন অমন বিপদ বাধিয়েছিলেন। ভাগ্যে তুমি ছিলে।

ভৃত্য। মা, কালকের মত আজও ঝড়-জল হতে পারে,—মেঘ উঠেচে।

হৈম। আজ তা'হলে উঠি। মেঘের জন্যে [illegible] দিদি, তোমার কাছে থেকে উঠ্‌তে ইচ্ছে করে [illegible] কিন্তু কাল সকালেই যাত্রা করতে হবে—আ[illegible] গেলে আর কাজের অন্ত নেই। এঁকে নি[illegible] পালিয়ে এসেছি, লুকিয়ে বাড়ী ঢুকতে হবে,— বাবা না দেখতে পান। এতক্ষণে খোকা হয় ঘুম ভেঙে উঠে বসে কাঁদচে, তাকে আবার দু[ধ] খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে, এঁর খাওয়া-দাওয়া আমি ছাড়া আর কেউ বোঝেনা, আড়ালে থেকে সে ব্যবস্থা করতে হবে,—তার পরে রেল গাড়ীতে দীর্ঘ পথের সমস্ত আয়োজনই আমাকে নিজে হাতে ক'রে নিতে হবে। কারও উপর নির্ভর করবার যো নেই। স্বামী পুত্র, চাকর-বাকর —তার কত ঝঞ্ঝাট, কত ভার,—আমার নিশ্বাস ফেলবারও সময় নেই দিদি।

...। এতে ত তোমার কষ্ট হয় বোন্?
...। (হাসিমুখে) তা' হয়। তবু, এই আশীর্ব্বাদ আমাকে কর তুমি, যেন এই কষ্ট মাথায় নিয়েই একদিন যেতে পারি। আর ফিরে যদি আবার জন্ম নিতেই হয় যেন এম্‌নি কষ্টই বিধাতা আমার অদৃষ্টে লিখে দেন। সেদিনও যেন এম্‌নি নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ না পাই।
...। তোমার কথাটা আমি বুঝেচি হৈম। ... যেন তোমার আনন্দের মধুচক্র। ভার যতই বাড়চে ততই এর অঙ্গ রন্ধ্র মধুতে ভরে ভরে উঠচে। তাই হোক্, এই আশীর্ব্বাদই তোমাকে আজ করি।
...। (সহসা পদধূলি লইয়া) তাই কর দিদি, মেয়ে মানুষের জীবনে এর বড় আশীর্ব্বাদ আর কি আছে!
...। আঃ, কি বকে যাচ্চো বল ত? আজ তোমার হল কি?
...। কি যে হয়েছে তুমি তার জান্‌বে কি?
...ড়শী। জানার শক্তিই আছে না কি আপনাদের?
...। আপনাদের অর্থাৎ পুরুষদের ত? না, এতবড় কঠিন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার সাধ্য নেই আমাদের সে কথা মানি, কিন্তু আপনিই বা এ সত্য জানলেন কি করে?
...। কেন? দেবীর ভৈরবী বলে? কিন্তু ভৈরবী কি নারী নয়? ওগো মশায়, এ তত্ত্ব আমাদের চেষ্টা করে শিখ্‌তে হয়না। আমাদের জন্মকালে বিধাতা স্বহস্তে তাঁর দুই হাত পূর্ণ করে আমাদের বুকের মধ্যে ঢেলে দেন। সে সম্পদের কাছে ইন্দ্রাণীর ঐশ্বর্য্যও কামনা করিনে এ কি সত্যি নয় দিদি?
...ড়শী। সত্যি বই কি ভাই।
...। মা, মেঘ যে বেড়েই আসচে!
...। এই যে উঠি বাবা। অনেক বাচালতা করে গেলাম দিদি, মাপ কোরো।
...। হৈমকে যে চিঠিখানা লিখ্‌ছিলেন তাঁর হাতে দিলে সময়ও বাঁচতো, খরচও বাঁচতো।
...ড়শী। (হাসিয়া) না দিলেও বাঁচ্‌বে। হয়ত আর তার প্রয়োজনই হবেনা।
...। ঈশ্বর করুন নাই যেন হয়, কিন্তু ভুলে আপনার প্রবাসী ভক্ত দু'টিকে বিস্মৃত হবেননা।
...। আসি দিদি। (পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) তোমার মুখের পানে চেয়ে আজ কত-কি যেন মনে হচ্চে। দিদি! মনে হচ্চে, এমন যেন তোমাকে আর কখনো দেখিনি,—যেন সহসা কোথায় কত দূরেই চলে গিয়েছ।
নির্ম্মল। নমস্কার। প্রয়োজনে যেন ডাক পাই।

[সকলের প্রস্থান]

ষোড়শী। হৈম, তুমি যেন আজ আমার কত যুগের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে গেলে বোন্। কে?

[সাগরের প্রবেশ]

সাগর। আমি সাগর।
ষোড়শী। তোদের আর সবাই? কাল যারা দল বেঁধে এসেছিল?
সাগর। আজও তারা তেম্‌নি দল বেঁধে গেছে হুজুরের কাছারি বাড়ীতে। আর বোধ হয় তোমারই বিরুদ্ধে—
ষোড়শী। বলিস্ কি সাগর? আমারই বিরুদ্ধে?
সাগর। আশ্চর্য্য হবার ত কিছুই নেই মা! সর্ব্ব প্রকার আপদে বিপদে চিরকাল তোমার কাছে এসে দাঁড়ানোই সকলের অভ্যাস। প্রথমটা সেই অভ্যাসটাই বোধ হয় তারা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। কিন্তু আজ জমিদারের একটা চোখ রাঙানিতেই তাদের হুঁস হয়েছে।
ষোড়শী। ভাল। কিন্তু সভাটা যে ...মন্দিরে হবার কথা ছিল?
সাগর। কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু গ্রামের কেউ রাজী হলেন না। তাঁরাত এদিক্‌কার মানুষ,—আমাদের খুড়ো ভাইপোকে হয়ত চেনেন।
ষোড়শী। কি ... হল সভাতে?
সাগর। তা সব ভাল। এই মঙ্গলবারেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তোমারও ভাবনা নেই—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ'খানেক টাকা পেতে পারবে।
ষোড়শী। প্রার্থনা জানাতে হবে বোধ করি হুজুরের কাছে?
সাগর। বোধ হয় তাই।
ষোড়শী। আচ্ছা, জমি-জমা যাদের সমস্ত গেল তাদের উপায় কি স্থির হল?
সাগর। ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তার অন্যথা হবেনা।
ষোড়শী। আর তোদের?
সাগর। আমাদের খুড়ো ভাইপোর? (একটু হাসিয়া) সে ব্যবস্থাও রায়মশায় করেছেন,

নিতান্ত চুপ করে বসে ছিলেননা। পাকা লোক, দারোগা পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ দশেকের মধ্যে একটা ডাকাতি হতে যা দেরি।

ষোড়শী। (ভয় পাইয়া) হাঁরে, একি তোরা সত্যি বলে মনে করিস্?

সাগর। মনে করি? এতো চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা। আমাদের জেলের বাইরে রাখ্‌তে পারে এ সাধ্য আর কারও নেই। (একটু থামিয়া) তা বলে, যাদের জেল হবে না তাদের দুর্ভাগ্য কিছু কম নয় মা।

ষোড়শী। কেন রে?

সাগর। তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যাহোক্ আমরা দু'টো খেতে পাবো, কিন্তু এরা তাও পাবে না। রায়-মশায়ের কাছে ধার করে জমিদারের সেলামি জুগিয়েছে, সেই খতগুলো সব ডিক্রী হতে যা বিলম্ব, তারপরে তাঁর নিজ জোতে জন খেটে দু'মুটো জোটে ভালো, না হয়—

ষোড়শী। না হয় কি?

সাগর। না হয় আসামের চা-বাগান ত আছেই। কেন মা তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেল-ডাঙাটার আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল?

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) পড়ে।

সাগর। আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা বাগানে। কিন্তু, আমি দেখেছি ছেলেবেলায় তাদের জমি-জমা, হাল বলদ। দু'মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্দ্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্দ্ধেক রায় মশায়ের।

ষোড়শী। (শুব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা, সাগর, এসব তুই শুনলি কার মুখে?

সাগর। স্বয়ং হুজুরের মুখেই।

ষোড়শী। তাহলে এ সকল তাঁরই মতলব?

সাগর। (চিন্তা করিয়া) কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ষোড়শী। এ তো গেল তোদের কথা সাগর। কিন্তু আমি ত একা। জমিদার ইচ্ছে করলে ত আমারও প্রতি অত্যাচার করতে পারেন?

সাগর। তা' জানিনে মা, শুধু জানি তুমি একা নও। (ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া) মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নে গুরুর নিষেধ আছে (বলেনও সঙ্কোচে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া)—হরিহরসর্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশবিশ ক্রোশের লোকে জানে,—তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষত মা, পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবে না।

ষোড়শী। (দুইচক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল) সাগর এ কি সত্যি?

সাগর। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাতের লাঠি ষোড়শীর পায়ের কাছে রাখিয়া) বেশ ত মা, সেই আশীর্ব্বাদই করনা যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শী। (চোখের দৃষ্টি একবার একটু খানি কোমল হইয়া আবার তেমনি জ্বলিতে লাগিল) আচ্ছা সাগর, আমি ত শুনেছি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই?

সাগর (সহাস্যে) মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বলচিনে মা।

ষোড়শী। কেবল প্রাণ দিতেই পারিস আর নিতে পারিস নে?

সাগর। পারিনে? এই আদেশের জন্যে কত ভিক্ষেই না চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই যে হুকুমটুকু তোমার মুখ থেকে বার করতে পারলামনা, মা।

ষোড়শী। না, সাগর না। অমন কথা তোরা মুখেও আনিস্‌নে বাবা।

সাগর। কিন্তু মন থেকে যে কথাটা তাড়াতে পারছিনে মা।

[পূজারী প্রবেশ করিল]

পূজারী। মন্দিরের দোর বন্ধ করে এলাম, মা।

ষোড়শী। চাবি?

পূজারী। এই যে মা। (চাবির গোছা হাতে দিয়া) রাত হ'ল এখন তাহ'লে আসি?

ষোড়শী। এস, বাবা।

[পূজারীর প্রস্থান।

ষোড়শী। সাগর, ফকির সাহেব চলে গেছেন। তিনি কোথায় আছেন, খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে পারিস্ বাবা?

সাগর। কেন মা?

ষোড়শী। তাঁকে আমার বড় প্রয়োজন। তোরা ছাড়া তাঁর চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই

সাগর। কিন্তু তোমার কাছেই ত কতবার শুনেছি তিনি সিদ্ধ সাধু পুরুষ। যেখানেই থাকুন তাঁকে যথার্থ মন দিয়ে ডাকলেই এসে উপস্থিত হন।

ষোড়শী। (চমকিয়া) তাই ত সাগর, এতবড় কথাটা আমি কি করে ভুলেছিলাম! আর আমার চিন্তা নেই, আমার এতবড় দুঃসময়ে তিনি না এসে কিছুতেই পারবেন না।

সাগর। আমারও বিশ্বাস তাই। কিন্তু কথায় কথায় রাত্রি অনেক হ'ল মা, তুমি বিশ্রাম কর, আসি?

ষোড়শী। এসো।

সাগর। (ঈষৎ হাসিয়া) ভয় নেই মা, সাগর তোমাকে একলা রেখে কোথাও বেশিক্ষণ থাক্‌বেনা।

[প্রস্থান।

[তখন পর্য্যন্ত ষোড়শীর আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকার্য্য সমাধা হয় নাই, সে এই আয়োজনে ব্যাপৃত থাকিয়া]

ষোড়শী। সাগর আমাকে কতবড় কথাই না স্মরণ করিয়ে দিলে। ফকির সাহেব! যেখানেই থাকুন, এ বিপদে আপনার দেখা আমি পাবোই পাবো।

[নেপথ্যে। আসতে পারি কি?]

ষোড়শী। (সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে) আসুন আসুন,—আমি যে সমস্ত মন দিয়ে শুধু আপনাকেই ডাকছিলাম!

[জীবানন্দ প্রবেশ করিল।

জীবানন্দ। এত বড় পতিভক্তি কলিকালে দুর্লভ। আমার পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি কই?

ষোড়শী। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া, সভয়ে) আপনি? আপনি এসেছেন কেন?

জীবানন্দ। তোমাকে দেখতে! একটু ভয় পেয়েছ বোধ হচ্ছে। পাবারই কথা। কিন্তু দুশ্চিন্তা নেই, সঙ্গে পিস্তল আছে তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

[ষোড়শী নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

জীবানন্দ। তবু, দোরটা বন্ধ করে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাক্‌। কি বল?

[এই বলিয়া জীবানন্দ অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া দিল]

ষোড়শী (ভয়ে কণ্ঠস্বর তাহার কাঁপিতেছিল) সাগর নেই—

জীবানন্দ। নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী। আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ। জানি বলে? কিন্তু আপনারা কার আমি ত বাপ্পও জান্‌তাম না।

ষোড়শী। নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আ[illegible] প্রতি অত্যাচার করতে এসেছেন? [illegible] আপনার কি করেছি আমি?

জীবানন্দ। লোক নিয়ে অত্যাচার করতে এসে[illegible] তোমার প্রতি? মাইরি না। বরঞ্চ, কেমন করছিল বলে ছুটে দেখ্‌তে এসেছি।

[ষোড়শীর চোখে জল আসিতেছিল, এই উপর[illegible] তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। জীবানন্দ অ[illegible] বসিয়া তাহার আনত মুখের প্রতি লুব্ধ তৃষিত চাহিয়া রহিল।]

জীবানন্দ। অলকা?

ষোড়শী। বলুন?

জীবানন্দ। তোমার এখানে তামাক-টামা[illegible] ব্যবস্থা নেই বুঝি?

[ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই অধোমুখে হইয়া রহিল।]

জীবানন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া) আ[illegible] কপাল ভাল ছিল। দেবীরাণী তাঁ[illegible] আনিয়ে ছিল সত্যি, কিন্তু অথুরি তা[illegible] খাইয়েছিল, এবং ভোজনান্তে দক্ষিণাও [illegible] ছিল। বিদায়ের পালাটা আর তুল্‌ব না, বঙ্কিম বাবুর বইখানা পড়েচ ত?

ষোড়শী। আপনাকে ধরে আন্‌লে সেইমত ব্য[illegible] [illegible]ত—অনুযোগ করতে হত না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) তা বটে। টানা [illegible] দাঁড়দড়ার বাঁধাবাঁধিই মানুষের নজরে [illegible] ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই [illegible] শুদ্ধ সকলেই দেখে; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে [illegible] দেখা যায় না,—হাঁ, অলকা, তোমাদের শা[illegible] তাঁকে কি বলে? অতনু, না? বেশ [illegible] (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) যৎসামান্য অ[illegible] ছিল; কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচর[illegible] সন্ধান পেলে জামাই আদর করবে না। [illegible] কি, শ্বশুরবাড়ী এসেচি বলে হয়ত বিশ্বাস কর[illegible] চাইবে না,—ভাব্‌বে প্রাণের দায়ে বুঝি মি[illegible] বলচি।

[লজ্জায় ষোড়শী আরও অবনত হইল]

জীবানন্দ। তামাকের ধুঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চল্‌তো কিন্তু ধুঁয়া নয় এমন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক, নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী। কিছু কি? মদ?

জীবানন্দ। (হাসিয়া মাথা নাড়িল) এবারে ভুল হল। ওর জন্যে অন্য লোক আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েছ,—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারবনা। অতএব, তোমার কাছে যদি চাইতেই হয়, চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের পথে ঠেলে দেয়না। ডাল ভাত, মেঠাই-মণ্ডা চিঁড়ে মুড়ি যা হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই?

[ষোড়শী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল]

জীবানন্দ। আজ সকালে মন ভাল ছিলনা। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ, সুস্থদেহ যে কি আমি জানিনে! সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম, কত যে হাঁটলাম বল্‌তে পারিনে,—ফিরতে ইচ্ছেই হলনা। সূর্যদেব অস্ত গেলেন, একলা জলের ধারে দাঁড়িয়ে কি যে ভাল লাগল বল্‌তে পারিনে। কেবল তোমাকে মনে পড়্‌তে লাগল। মনে পড়্‌লো আমার কাছারি-বাড়ীতে এতক্ষণে লোক জমেছে,—তোমাকে নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থাটা আজ শেষ করাই চাই। ফিরে এসে সভায় যোগ দিলাম, কিন্তু টিকতে পারলামনা। —একটা ছুতো করে পালিয়ে এসে দাঁড়ালাম ওই মনসাগাছটার পিছনে।

ষোড়শী। তার পরে?

জীবানন্দ। দেখি, দাঁড়িয়ে সাগর সর্দার এবং তুমি। আলাপ আলোচনা সমস্তই কানে গেল, তাৎপর্য্য গ্রহণ করতেও বিলম্ব হলনা। ভাবলাম, আমাদের মত সাধু ব্যক্তিরা যে এহেন নির্বোধ ভৈরবীকে দূর করে দিতে চেয়েছে সে ঠিকই হয়েছে। সে রাত্রে বাড়ী ঘেরাও করে পুলিশ পিয়াদা হাত-কড়া নিয়ে হাজির, সামান্য একটা মুখের কথার জন্য স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পর্য্যন্ত কি পীড়াপীড়ি,—আর তুমি বল্‌লে কিনা আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি। আজ ছোট্ট একটু খানি সুখের জন্যে সাগর চাঁদের কত অনুনয় বিনয়, কত সাধাসাধি,—আর তুমি বলে বস্‌লে কিনা এমন কথা মুখেও আনিসনে বাবা। অভিমানে বাবাজীবন মুখখানি ম্লান করে চলে গেলেন সে তো স্বচক্ষেই দেখলাম। মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললাম জয় মা চণ্ডীগড়ের চণ্ডী! তোমার এই অধম সন্তানের প্রতি এত কৃপা না থাকলে কি আর এই মেয়েমানুষটির বার বার এমন কোরে বুদ্ধি লোপ কর! এখন একবার একে বিদায় করে আমাকে হত্তে বসাও মা, জনার্দ্দন আর এককড়ি, এই দুই তালবেতালকে সঙ্গে নিয়ে আমি এম্‌নি সেবা তোমার সুরু করে দেব যে, একদিনের পূজোর চোটে তোমার মাটির মূর্ত্তি আহ্লাদে একেবারে পাথর হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তি-তত্ত্বের এ সব বড় বড় কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু এখন ক্ষিদের জ্বালায় যে আর দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী। কিন্তু বাড়ী গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ। অর্থাৎ, আমার বাড়ীর খবর আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো। (এই বলিয়া সে একটুখানি হাসিল)।

ষোড়শী। আপনি সারাদিন খান্‌নি, আর বাড়ীতে আপনার খাবার বাবস্থা নেই, একি কখনো হতে পারে?

জীবানন্দ। না পারবে কেন? আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি। আজ খামকা রাগ করলে চলবে কেন অলকা? (বলিয়া সে তেম্‌নি মৃদু হাসিল)

জীবানন্দ। আমার যে শান্তিময় জীবনযাত্রা সেদিন চোখে দেখে এসেছ সে বোধ হয় ভুলে গেছ। আজ তাহলে আমি—

ষোড়শী। (ব্যাকুলকণ্ঠে) দেবীর সামান্য একটু প্রসাদ আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন?

জীবানন্দ। খুব পারবো। কিন্তু সামান্য একটু প্রসাদ? সে তো নিশ্চয় তোমার নিজের জন্যে আনা অলকা।

ষোড়শী। নইলে কি আপনার জন্যে এনে রেখেছি এই আপনি মনে করেন?

জীবানন্দ। (হাসিমুখে) না, তা করিনে। কিন্তু, ভাবচি, তোমাকে ত বঞ্চিত করা হবে।

ষোড়শী। সে ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমাকে বঞ্চিত করায় আপনার নূতন অপরাধ কিছু হবে না।

জীবানন্দ। না, অপরাধ আর আমার হয় না। একেবারে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত খেয়াল মনে উঠেছে অলকা, যদি না হাসো ত তোমাকে বলি।

ষোড়শী। বলুন।

জীবানন্দ। কি জানো, মনে হয়, হয় ত আজও বাঁচতে পারি, হয় ত, আজও মানুষের মত,—কিন্তু এমন কেউ নেই যে আমার,—কিন্তু তুমিই পারো শুধু এই পাপিষ্ঠের ভার নিতে,—নেবে অলকা?

ষোড়শী। কি বল্‌চেন?

জীবানন্দ। (আত্মসমর্পণের আশ্চর্য্য কণ্ঠ স্বরে) সত্যি আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা।

ষোড়শী। (চমকিয়া এক মুহূর্ত্ত থামিয়া) অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করছেন, আমাকে দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান্‌। আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমাকে পারবেন না।

জীবানন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবলি মনে হয়েছে এই কঠোর আশ্চর্য্য রমণীকে অভিভূত করেছেন সে মানুষটা কে?

ষোড়শী। (আশ্চর্য্য হইয়া) তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি?

জীবানন্দ। না। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বারবার চুপ করে গেছে। যাক, এবার আমি যাই, কি বল?

ষোড়শী। কিন্তু আপনার যে কি কাজের কথা ছিল?

জীবানন্দ। কাজের কথা? কিন্তু কি যে ছিল আমার আর মনে পড়চে না। শুধু এই কথাই মনে পড়ছে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। অলকা, তোমার কি সত্যিই আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী। আবার কি রকম? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েছে।

জীবানন্দ। আর তোমার মা যে তোমাকে আমাকে দিয়েছিলেন সেটাই কি সত্যি নয়?

ষোড়শী। না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেন্‌নি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্য কোথাও ছিল না।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া; যেন, কতদূর হইতে কথা কহিল) অলকা, একথা তোমার সত্য নয়।

ষোড়শী। কোন্ কথা?

জীবানন্দ। তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলা[ম] সে কাহিনী কখনো কাউকে বলব না, কি[ন্তু] সেই কাউকের মধ্যে আজ তোমাকে ফেলতে পারচিনে। তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কি[ন্তু] ভগবান তোমাকে ঠকাবার সুযোগ আমাকে দেন্‌নি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

ষোড়শী। বলুন?

জীবানন্দ। আমি সত্যবাদী নই; কিন্তু আজকে[র] কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্র[হণ] করবার মতলব আমার ছিল না,—ছিল কেব[ল] তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য। কিন্তু সে রাত্রে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না ব[লে] ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছেও আর হোলো না।

ষোড়শী। তবে কি ইচ্ছে হল?

জীবানন্দ। থাক্, সে তুমি আর শুনতে চেয়োনা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত শুনলে আপনিই বুঝবে, এ[ত] সে বোঝায় ক্ষতি বই লাভ আমার হবে না কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই ন[য়], আমি তোমাকে ফেলে পালাইনি।

ষোড়শী। আপনার না পালানোর ইতিবৃত্ত এ[খন] ব্যক্ত করুন।

জীবানন্দ। আমি নির্ব্বোধ নই, যদি ব্যক্ত[ই করি] তার সমস্ত ফলাফল জেনেই কোরব। তোমা[র] মায়ের এত বড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রা[জী] হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের [...] আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তা[র] শাস্তি কোরব। সে শাস্তি হল, কিন্তু পুলিশে[র] ওয়ারেণ্ট শাস্তি হল না। ছ'মাস জেলে গেল —সেই যে শেষ রাত্রে বার হয়েছিলাম, অ[ার] ফেরবার অবকাশ হল না।

ষোড়শী। (রুদ্ধ নিশ্বাসে) তারপরে?

জীবানন্দ। (মৃদু হাসিয়া) তারপরেও, মন্দ না[।] জীবানন্দ বাবুর নামে আরও একটা ওয়ারে[ণ্ট] ছিল। মাস কয়েক পূর্ব্বে রেলগাড়ীতে এক[জন] বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্হিত হ[ন।] অতএব আরও দেড় বৎসর। একুনে এই বা[র] দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদ[ার] বাবু যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃ প্রবেশ করলে[ন] তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় তার মা!

[দু'জনেই ক্ষণিক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল]

জীবানন্দ। আর একবার সভায় যেতে হবে! অলকা, আমি তা হলে।

ষোড়শী। সভায় আপনার অনেক কাজ, না গেলেই নয়। কিন্তু কিছু না খেয়েও ত যেতে পারবেননা।

জীবানন্দ। পারবনা? তাহলে আনো। কিন্তু মস্ত বদ অভ্যেস আমার, খেয়ে আর নড়তে পারিনে।

ষোড়শী। না পারেন, এইখানেই বিশ্রাম করবেন।

জীবানন্দ। বিশ্রাম কোরব? যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

ষোড়শী। (হাসিয়া) সে সম্ভাবনা ত রইলই। কিন্তু পালাবেননা যেন। আমি খাবার নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

[গৃহকোণে একখানা পত্রের খণ্ডাংশ পড়িয়াছিল, জীবানন্দর দৃষ্টি পড়িতেই তাহা সে তুলিয়া লইয়া দীপালোকে পড়িয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের সরস ও প্রফুল্ল মুখের চেহারা গম্ভীর ও অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। ষোড়শী খাবারের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার মনে পড়িল ঠাঁই করা হয় নাই, তাই সে পাত্রটা তাড়াতাড়ি একধারে রাখিয়া দিয়া আসনের অভাবে কম্বলই পুরু করিয়া পাতিল এবং নিজের একখানি বস্ত্র পাট করিয়া পাতিয়া দিতেছিল এমনি সময় জীবানন্দ কথা কহিল]

জীবানন্দ। ওটা কি হচ্ছে?

ষোড়শী। আপনার ঠাঁই করচি। শুধু কম্বলটা ফুটবে।

জীবানন্দ। ফুটবে, কিন্তু আতিশয্যটা ঢের বেশি ফুটবে। ঘর জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

[কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল]

জীবানন্দ। (হাতের কাগজ দেখাইয়া) ছেঁড়া চিঠি,—সবটুকু নেই। যাকে লিখেছিলে তার নামটা শুনতে পাইনে?

ষোড়শী। কার নাম?

জীবানন্দ। যিনি দৈত্য বধের জন্য চণ্ডীগড়ে অবতীর্ণ হবেন, যিনি দ্রৌপদীর সখা, যিনি—আর বলব?

[এই ব্যঙ্গোক্তির ষোড়শী উত্তর দিতে পারিলনা, কিন্তু তাহার চোখের উপর হইতে ক্ষণকাল পূর্ব্বের মোহের যবনিকা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল]

জীবানন্দ। এই আহ্বান-লিপির প্রতি ছত্রটি কর্ণে অমৃত বর্ষণ করবে তাঁর নামটি?

ষোড়শী। (আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া) নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ। প্রয়োজন আছে বই কি। প... জানতে পারলে হয়ত আত্মরক্ষার একটা ... করতে পারি।

ষোড়শী। আত্মরক্ষার প্রয়োজন ত একা আপ... নয় চৌধুরী মশায়। আমারও ত থাকতে ...

জীবানন্দ। পারে বই কি।

ষোড়শী। তাহলে সে নাম আপনি শুনতে পাবেন না। কারণ, আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ। বেশ, তা যদি না থাকে রক্ষা পাওয়াটা আমারই দরকার এবং তাতে লেশমাত্র ত্রুটি হবেনা জেনো।

[ষোড়শী নিরুত্তর]

জীবানন্দ। তুমি জবাব না দিতে পারো, কিন্তু তোমার এই বীর পুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা নয়।

ষোড়শী। জানবেন বই কি। পৃথিবীর বীর পুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ। সে ঠিক। কিন্তু এই কাপুরুষকে বারবার অপমান করবার ভারটা তোমার বীরপুরুষটি সইতে পারলে হয়। যাক্, এ চিঠি ছিঁড়লে কেন?

ষোড়শী। এর জবাব আমি দেবনা।

জীবানন্দ। কিন্তু সোজা নির্ম্মল সাহেবকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন! এ শব্দভেদী বাণ শি... তাঁরই শেখানো না কি?

ষোড়শী। তার পরে?

জীবানন্দ। তার পরে আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সংবাদ আমি অপরের কাছে শুনেছি, কিন্তু রায় মশায়কে যতই প্রশ্ন করেচি, ততই তিনি চুপ করে গেছেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সবচেয়ে কেন বেশি।

ষোড়শী। (সচকিতে) নির্ম্মলের সম্বন্ধে আপনি কি শুনেছেন?

জীবানন্দ। সমস্তই। তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাসতে পারলামনা,—আমার আনন্দ করবার এ কথা নয়। সেই ঝড় জল অন্ধকার রাত্রে একাকী তার হাত ধরে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া

…আপনার সাহসের অবধি নেই।

…থাকবে কি কোরে নির্ম্মলবাবু, …আসুন ঘরে।

…আর যাবো না, আমাকে এখনি …

…খানেই বলুন।

[…উভয়ের উপবেশন]

…হলে চলে যাওয়াই স্থির?

…যাওয়া স্থগিত রইল। রাত্রে …শুনতে পেলাম আজ সন্ধ্যাবেলায় …আপনার বিচার হবে। সে …উপস্থিত থাকতে চাই।

…জন্তে? নিছক কৌতূহল, না …করতে চান?

…চেষ্টা কোরব বটে।

জীবানন্দ। এ …ক্ষতি হয়, কষ্ট হয়, শ্বশুরের সঙ্গে হলে যথাস্থানে … ক'টা ছত্র আ…ও?

…দিতে পারেনি…।

…ঠকাতে পারে… [ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল]

[…(হেসে) আপনি হাসলেন যে বড়?

জীবানন্দ। কেমন…

ষোড়শী। হাঁ। …কিন্তু হাসচি আর একটা কথা …

জীবানন্দ। এ সব …আগেকার দিনে ভৈরবীরা না …দের ভেড়া বানিয়ে রাখতো।

ষোড়শী। হাঁ, সত্যি …য় তারা কি কোরত নির্ম্মল-

জীবানন্দ। (আহ…) …বেড়াতো, না লড়াই বাধিয়ে …দীপ শিখাটা উজ্… …খতো!

…প্রতি তীক্ষ্ণ চক্ষে … কি … বলিতে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত … হাসিতে লাগিল]

নির্ম্মল। (পরিহাসে যোগ দিয়া, নিজেও হাসিয়া) হয়ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে খেতো।

ষোড়শী। সে তো ভয়ের কথা নির্ম্মল বাবু।

নির্ম্মল। (সহাস্তে মাথা নাড়িয়া) ভয় একটু আছে বই কি।

ষোড়শী। একটু থাকা ভাল। তৈমকেও সাবধান করে দেওয়া উচিত।

নির্ম্মল। তার মানে?

ষোড়শী। মানে কি সব কথারই থাকে না কি? (হাসিয়া) কুটুমের অভ্যর্থনা ত হল। অবশ্য খুসি-খুসি দিয়ে যতটুকু পারি ততটুকু,—তার বেশি ত সবল নেই ভাই,—এখন আসুন দু'টো কাজের কথা কওয়া যাক।

নির্ম্মল। বলুন?

ষোড়শী। (গম্ভীর হইয়া) দু'টি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায় মহাশয়, আর একটি জমিদার—

নির্ম্মল। আর একটি আপনার বাবা।

ষোড়শী। বাবা? হাঁ, তিনিও বটে।

নির্ম্মল। আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রভুটীকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্ত আপনার শত্রুতা করচেন?

ষোড়শী। দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রী করে ফেলতে চান। কিন্তু আমি থাকতে সে কোনমতেই হবার যো নেই।

নির্ম্মল। (সহাস্তে) সে আমি সামলাতে পারবো।

ষোড়শী। কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেন না।

নির্ম্মল। কি সে সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী। (শান্ত স্বরে) সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্য হোক্ মিথ্যে হোক্, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্ম্মলবাবু। আমি এই কথাটাই তাদের বলতে চাই।

নির্ম্মল। (সবিস্ময়ে) নিজের মুখ দিয়ে এ কথা যে স্বীকার করার সমান!

ষোড়শী। তা' হবে।

নির্ম্মল। কিন্তু ওরা যে বলে—

ষোড়শী। কারা বলে?

নির্ম্মল। অনেকেই বলে সে সময়ে, অর্থাৎ, ম্যাজিষ্ট্রেটের আসার রাত্রে আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী। তারা কি দেখেছিল নাকি? তা' হবে, আমার ঠিক মনে নেই; যদি দেখে থাকে সে সত্যি। তাঁর সেদিন ভারি অসুখ, আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি শুয়েছিলেন।

নির্ম্মল। (অল্পকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) তার পরে?

ষোড়শী। কোনমতে দিন কেটে যাচ্চে, কিন্তু সেদিন থেকেই কিছুতে আর মন বসাতে পারিনে, সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকছে।

নির্ম্মল। কি মিথ্যে?

ষোড়শী। সব। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এতদিনের যা কিছু সমস্তই—

নির্মল। তবে কিসের জন্তে ভৈরবীর আসন রাখতে চান ?

ষোড়শী। এমনিই। আর আপনি যদি বলেন এতে কাজ নেই—

নির্মল। না না, আমি কিছু বলিনে। কিন্তু এখন আমি উঠ্‌লাম। আপনার হয়ত কত কাজ নষ্ট করলাম।

ষোড়শী। কুটুম্বের অভ্যর্থনা, বন্ধুর মর্য্যাদা রক্ষা করা, এ কি কাজ নয় নির্মলবাবু ?

নির্মল। সকাল হ'ল, এখন আসি ?

ষোড়শী। আসুন। আমারও স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আমিও চল্‌লাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

[সাগর সর্দ্দার ও ফকির সাহেবের প্রবেশ]

সাগর। না, এ চল্‌বে না,—কোনমতেই চল্‌বে না ফকির সাহেব। মা নাকি বলেচেন সমস্ত ত্যাগ করে যাবেন : আপনাকে বল্‌চি এ চল্‌বে না।

ফকির। কেন চল্‌বে না সাগর ?

সাগর। তা' জানিনে। কিন্তু যাওয়া চল্‌বে না। গেলে আমরা তাঁর দীন দুঃখী প্রজারা সব থাক্‌বো কোথায় ? বাঁচবো কি করে ?

ফকির। কিন্তু তোমরা কি শোননি ষোড়শী কত বড় লজ্জা এবং ঘৃণায় সমস্ত ত্যাগ করে যাচ্ছেন ?

সাগর। শুনেচি। তাই আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনি কিসের জন্ত মা সাহেবের হাত থেকে সে রাত্রে জমিদারকে বাঁচাতে গেলেন।

[ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া]

সাগর। ভেবে নাই পেলাম, ফকির সাহেব, কিন্তু এটুকু ত ভেবে পেয়েছি যাঁকে মা বলে ডেকেছি সন্তান হয়ে আমরা তাঁর বিচার করতে যাবো না।

ফকির। তোমরা অনকতক বিচার না করলেই কি চণ্ডীগড়ে তাঁর বিচার করবার মানুষের অভাব হবে সাগর ?

সাগর। কিন্তু তারাই কি মানুষ ? আমরা তাঁর ছেলে,—আমাদের অন্তরের বিশ্বাসের চেয়ে কি তাদের বাইরের বিচারটাই বড় হবে ফকির সাহেব ? তাদের কি আমরা চিনিনে ? একদিন যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে তারা, সেও যেমন সত্যি-পাওনার দাবীতে, আবার জেলে যখন দিলে সেও তেমনি সত্যি-সাক্ষীর জোরে !

ফকির। সে আমি জানি।

সাগর। কিন্তু সব কথা ত জানোনা। খুড়ো ভাইপোয় জেল খেটে ফিরে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, মা, আমরা যে মরি। মা রাগ করে বল্‌লেন, তোরা ডাকাত, তোদের মরাই ভাল। অভিমানে ঘরে ফিরে গেলাম। খুড়ো বল্‌লে, ভগবান ! গরীবকে বিশ্বাস করতে কেউ নেই। পরের দিন সকালবেলা মা আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বল্‌লেন, তোদের কাছে আমি মস্ত অপরাধ করেছি বাবা, আমাকে তোরা ক্ষমা কর্। তোদের কেউ বিশ্বাস না করুক আমি বিশ্বাস কোরব। এখনো বিঘে কুড়ি জমি আমার আছে, তাই তোরা ভাগ করে নে। চণ্ডীর খাজনা তোরা যা ইচ্ছে দিস্, কিন্তু অসৎপথে কখনো পা দিবিনে এই আমার সর্ত্ত।

ফকির। কিন্তু লোকে যে বলে—

সাগর। বলুক। শুধু মা জান্‌লেই হল সে বিশ্বাস আমরা কখনো ভাঙিনি। জানো ফকির সাহেব, আমাদের জন্তেই এককড়ি তাঁর শত্রু, আমাদের জন্তেই রায় মশায় তাঁর দুষমন। অথচ, তারা জানেওনা কার দয়ায় আজও তারা বেঁচে আছে।

ফকির। কিন্তু আমাকে তোরা ধরে আন্‌লি কেন ?

সাগর। কেন ? শুনেছি, মুসলমান হয়েও তুমি তাঁর গুরুর চেয়ে বড়। তোমার নিষেধ ছাড়া মাকে কেউ আটকাতে পারবেনা।

ফকির। কিন্তু এত বড় অন্যায় নিষেধ আমি কিসের জন্তে করব সাগর ?

সাগর। করবে মানুষের ভালর জন্তে।

ফকির। কিন্তু ষোড়শী ঘরে নেই। বেলা বাড়ে, আমিও ত আর অপেক্ষা করতে পারিনে। এখন আমি চল্‌লুম।

সাগর। পারবে না থাক্‌তে ? করবে না নিষেধ ? কিন্তু ফল তার ভাল হবে না।

ফকির। এ সব কথা মুখেও এনো না সাগর।

সাগর। মাও বলেন ও কথা মুখে আনিস্ নে সাগর ! বেশ মুখে আর আনব না—আমাদের মনের মধ্যেই থাক্।

[ফকিরের প্রস্থান।

সাগর। সন্ন্যাসী ফকির তুমি, জানো না ডাকাতের বুকের জ্বালা। আমাদের সব গেছে, এর ওপর

যাও যদি ছেড়ে যায় আমরা বাকি কিছুই রাখবনা।

[প্রস্থান।

[নির্ম্মল ও ষোড়শীর প্রবেশ]

ষোড়শী। ডেকে নিয়ে এলাম সাধে? ছি, ছি, কি দাঁড়িয়ে যা' তা শুনছিলেন বলুন ত! দেবীর মন্দিরে, তাঁর উঠনের মাঝখানে জটলা করে কতকগুলো কাপুরুষে মিলে বিচারের ছলনায় দু-জন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে,—তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। আসুন আমার ঘরে।

[দুয়ারে আসন পাতা ছিল, নির্ম্মলকে সমাদর করিয়া তাহাতে বসাইয়া ষোড়শী নিজে অদূরে উপবেশন করিল]

ষোড়শী। আপনি নাকি বলেছেন আমার মামলা মকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন। একি সত্যি।

নির্ম্মল। হাঁ, সত্য।

ষোড়শী। কিন্তু কেন নেবেন?

নির্ম্মল। বোধ হয় আপনার প্রতি অত্যাচার হচ্চে বলে।

ষোড়শী। কিন্তু আর কিছু বোধ করেন না ত? (এই বলিয়া সে মুচকিয়া হাসিল) থাক্‌, সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে এই কূট-কচালে শাস্ত্রের, না? আচ্ছা সে যাক্‌। মকদ্দমার ভার যেন নিলেন, কিন্তু যদি হারি তখন ভার কে নেবে? তখন পেছোবেন না ত?

নির্ম্মল। না, তখনও না।

ষোড়শী। ইস্‌! পরোপকারের কি ঘটা! (হাসিয়া) আমি কিন্তু হৈম হলে এই সব পরোপকার বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভাল মানুষই নই,—আমার কাছে ফাঁকি চল্‌ত না। রাত্রি-দিন চোখে চোখে রেখে দিতাম।

নির্ম্মল। (বিস্ময়ে, ভয়ে, আনন্দে) চোখে চোখে রাখলেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে সুরু হয় চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌঁছায় না, একথা কি আজও জান্‌তে পারোনি তুমি।

ষোড়শী। পেরেছি বইকি (হাসিল; বাহিরের শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া চাহিয়া) এই যে ইনি এসেছেন!

নির্ম্মল। কে? ফকির সাহেব?

ষোড়শী। না, জমিদার বাবু। বলেছিলাম সভা ভাঙ্‌লে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আস্‌ছেন।

নির্ম্মল। (বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া) তা'হলে আপনি আমাকে এ কথা বললেন না কেন?

ষোড়শী। বেশ! একবার 'তুমি' একবার 'আপনি'! (হাসিয়া) ভয় নেই, উনি ভারি ভদ্রলোক; লড়াই করেন না। তা'ছাড়া আপনাদের পরিচয় নেই;—সেটাও একটা লাভ। (দ্বারের নিকটে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন।

জীবানন্দ। (প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া) ইনি? নির্ম্মলবাবু বোধ হয়?

ষোড়শী। হাঁ, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত কি? ওঁদের কৃপাতেই ত টিকে আছি, নইলে মামার জমিদারি পাওয়া পর্য্যন্ত যে সব কীর্ত্তি করা গেছে তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত এতদিন আন্দামানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হত!

ষোড়শী। চৌধুরী মশাই, উকিল-ব্যারিষ্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওঁরাই পাবেন? আণ্ডা-মান প্রভৃতি বড় ব্যাপারে না হোক্‌ কিন্তু ছোট বলে, এদেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়,—দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতেও পারে না?

জীবানন্দ। (অপ্রস্তুত হইয়া) ধন্যবাদ পাবার লোক হলেই পাবে।

ষোড়শী। (হাসিয়া) এই যেমন সভায় দাঁড়িয়ে এই মাত্র এক দফা দিয়ে এলেন?

[জীবানন্দ স্তব্ধ হইয়া রহিল]

ষোড়শী। নির্ম্মলবাবু না থাকলে আজ আপনার সঙ্গে আমি ভারি ঝগড়া করতাম। ছি,—এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে? তা' ছাড়া কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সে দিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন কোরব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন। এই নিন সিন্দুকের চাবি এবং নিন্ হিসাবের খাতা। (অঞ্চল হইতে সিন্দুকের চাবি খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দর পায়ের

কাছে রাখিয়া দিল)—মায়ের যা কিছু অলঙ্কার, যত কিছু দলিলপত্র সিন্দুকের ভিতরেই পাবেন, এবং আর একখানা কাগজ ঐ খাতার মধ্যে পাবেন, যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েছি।

জীবানন্দ। (অবিশ্বাস করিয়া) বল কি! কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী। তাতেই লেখা আছে দেখ্‌তে পাবেন।

জীবানন্দ। তাই যদি হয় ত, এই চাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

ষোড়শী। তাঁকেই যে দিলাম।

জীবানন্দ। (মলিন মুখে ও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে) কিন্তু এতো আমি নিতে পারিনে ষোড়শী। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও যে এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস করব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরী মশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ চাবিটুকু নেবার সাহস নেই, এ আমি মানিনে। নিন্, ধরুন।

[খাতা ও চাবি তুলিয়া জীবানন্দর হাতের মধ্যে কম জোর করিয়া গুঁজিয়া দিল]

আজ আমি বাঁচ্‌লাম। (কোমল কণ্ঠস্বরে) আর একটিমাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাবো, সে আমার গরীব দুঃখী প্রজাদের ভবিষ্যৎ। আমি ত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি,—আপনি অনায়াসে পারবেন। (নির্ম্মলের প্রতি) আমার কথাবার্ত্তা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না নির্ম্মলবাবু?

নির্ম্মল। (মাথা নাড়িয়া) আশ্চর্য্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্য্যন্ত সই করে রেখেছেন, এ খবর তো আমাকে পোড়াও জানাননি?

ষোড়শী। আমার অনেক কথাই আপনাকে জানানো হয়নি, কিন্তু একদিন হয়ত সমস্তই জানতে পারবেন। কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন, যাঁকে সকল কথাই জানিয়েছি, সে আমার ফকির সাহেব।

নির্ম্মল। এসকল পরামর্শ বোধ করি তিনিই দিয়েছেন?

ষোড়শী। না, তিনি এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানেননি, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার একটু আগের রচনা। যিনি একাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো।

জীবানন্দ। মনে হচ্ছে যেন ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাসা কোরচ ষোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই "মরফিয়া" খাওয়ার চেয়েও শক্ত ঠেক্‌চে।

নির্ম্মল। (হাসিয়া জীবানন্দর প্রতি চাহিয়া) আপনি তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাসা দেখ্‌চেন, কিন্তু আমাকে কাজ-কর্ম্ম, বাড়ী ঘর ফেলে রেখে এই তামাসা দেখ্‌তে হচ্ছে। আর এ যদি সত্য হয় ত, আপনি যা চেয়েছিলেন সেটা অন্ততঃ পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে হোল আনাই লোকসান। (ষোড়শীকে) বাস্তবিক এ সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

ষোড়শী। না নির্ম্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি তামাসার সময়? আমি সত্য সত্যই অবসর নিলাম।

নির্ম্মল। তাহলে বড় দুঃখে পড়েই একাজ আপনাকে করতে হল। আমি আপনাকে বাঁচাতেও হয়ত পারতাম, কিন্তু কেন যে তা হতে দিলেন না তা আমি বুঝেছি। বিষয় রক্ষা হত, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে উত্তাল হয়ে উঠ্‌ত। সে থামাবার সাধ্য আমার ছিল না।

[এই বলিয়া সে কটাক্ষে জীবানন্দর প্রতি চাহিল]

নির্ম্মল। এখন তা'হলে কি করবেন স্থির করেছেন?

ষোড়শী। সে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

নির্ম্মল। কোথায় থাক্‌বেন?

ষোড়শী। এ খবরও আপনাকে আমি পরে দেবো।

নির্ম্মল। [হাতঘড়ি দেখিয়া] রাত প্রায় দশটা। আচ্ছা এখন আসি তাহলে। আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই?

ষোড়শী। এত বড় অহঙ্কারের কথা কি বল্‌তে পারি নির্ম্মল বাবু? তবে মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার প্রয়োজন হবে না।

নির্ম্মল। আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি।

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না।

নির্ম্মল। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে। যদি অবকাশ পান মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন।

[নির্ম্মল প্রস্থান করিল।

জীবানন্দ। ভদ্র লোকটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ষোড়শী। না পারলেও আপনার ক্ষতি হবে না।

জীবানন্দ। আমার না হোক তোমার ত হ'তে পারে। মনে রাখবার জন্যে কি ব্যাকুল প্রার্থনাই জানিয়ে গেলেন!

ষোড়শী। সে শুনেছি। কিন্তু আমি তাঁকে যতখানি জানি তার অর্দ্ধেকও আমাকে জানলে আজ এত-বড় বাহুল্য আবেদন তাঁর করতে হতনা।

জীবানন্দ। অর্থাৎ?

ষোড়শী। অর্থাৎ এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী পদ অনায়াসে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি সে শিক্ষা কোথায় পেলাম জানেন? ওঁদের কাছে। মেয়ে মানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে সে বুঝেছি কেবল হৈমকে দেখে। অথচ, এর বাষ্পও কোনদিন তাঁরা জানতে পারবেননা।

জীবানন্দ। তথাপি, এ হেঁয়ালি হেঁয়ালিই রয়ে গেল অলকা। একটা কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারি লজ্জা করে, কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্য জবাব দিতে পারতে?

ষোড়শী। (সহাস্যে) আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য্য কাজ করতে পারতেন, তখন আমিও তেমনি কোন একটা অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কি না, এ আমি জানিনে,—কিন্তু আশ্চর্য্য কাজ করবার আপনার প্রয়োজন নেই,—আমি বুঝেচি। অপবাদ সকলে মিলে দিয়েছে বলেই তাকে সত্য করে তুলতে হবে তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ করবনা। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে কথা আমি ভুলতে পারবনা। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরী মশাই?

জীবানন্দ। তুমি আমাকে চৌধুরীমশাই বল কেন?

ষোড়শী। তবে কি বলব? হুজুর?

জীবানন্দ। না। অনেকে যা বলে ডাকে—জীবানন্দ বাবু।

ষোড়শী। বেশ, ভবিষ্যতে তাই হবে। কিন্তু রাত্রি হয়ে যাচ্ছে আপনি বাড়ী গেলেন না? আপনার লোকজন কই?

জীবানন্দ। আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েছি।

ষোড়শী। একলা বাড়ী যেতে আপনার ভয় করবে না?

জীবানন্দ। না, আমার পিস্তল আছে।

ষোড়শী। তবে, তাই নিয়ে বাড়ী যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ। তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাবো না।

ষোড়শী। (প্রখর চোখে, অথচ শান্ত স্বরে) আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, তারা বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জীবানন্দ। (অপ্রতিভ হইয়া) ডাকতে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাচ্ছি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না। তাই শুধু আমি বলছিলাম তুমি কি সত্যই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ।

জীবানন্দ। কবে যাবে?

ষোড়শী। কি জানি, হয়ত কালই যেতে পারি।

জীবানন্দ। কাল? কালই যেতে পারো? (একটু স্তব্ধ রহিয়া) আশ্চর্য্য! মানুষের নিজের মন বুঝতেই কি ভুল হয়। যাতে তুমি যাও সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেছি,—অথচ, তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেল। তোমাকে তাড়াতে পারলে ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রী করেছি সে নিয়ে আর গোলমাল হবেনা,—কতকগুলো টাকা টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর,—আর তোমাকে যা হুকুম কোরবো তাই তুমি করতে বাধ্য হবে, এই দিকটাই কেবল দেখতে পেয়েছি কিন্তু আরও একটা দিক আছে, স্বেচ্ছায় তুমি সমস্ত ত্যাগ করে আমার মাথাতেই বোঝা চাপিয়ে দিলে সে ভার বইতে পারবো কি না এ কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি। আজ অলকা, এমন ত হতে পারে আমার মত তোমারও ভুল হচ্ছে,—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি! জবাব দাওনা যে?

ষোড়শী। জবাব খুঁজে পাইনে। হঠাৎ বিস্ময় লাগে এ কি আপনার কথা!

জীবানন্দ। তবে এই কথাটা বল সেখানে তোমার চলবে কি কোরে?

ষোড়শী। অত্যন্ত অনাবশ্যক কৌতূহল চৌধুরী মশায়

জীবানন্দ। তাই বটে, অলকা তাই বটে। আ

আমার আবর্জ্জিত.অমাবশ্যক তোমাকে বোঝায় আমি কি দিয়ে?

[বাহিরে পূজারীর কাশি ও পায়ের শব্দ শুনা গেল। অতঃপর তিনি প্রবেশ করিলেন]

পূজারী। মা, সকলের সম্মুখে মন্দিরের চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকুরের হাতেই দিলাম। রায়মশায়, শিরোমণি,—এঁরা, উপস্থিত ছিলেন।

ষোড়শী। ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও আমি সাগরের ওখানে একবার যাবো।

জীবানন্দ। এগুলোও তাহলে তুমি রায়মশায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী। না, সিন্দুকের চাবি আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবেনা।

জীবানন্দ। তবে কি বিশ্বাস হবে শুধু আমাকেই?

[ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়া জীবানন্দর পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে অভিভূত পূজারীকে কহিল]

ষোড়শী। চল বাবা, আর দেরী কোরোনা।

পূজারী। চল, মা চল।

[পূজারী ও ষোড়শী প্রস্থান করিলে একাকী জীবানন্দ সেই জনহীন কুটীর-অঙ্গনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাটমন্দির

[চণ্ডীর প্রাঙ্গণস্থিত নাটমন্দিরের একাংশ। সময় অপরাহ্ন। উপস্থিত,—শিরোমণি, জনার্দ্দন রায় এবং আরও দুই চারিজন গ্রামের ভদ্রব্যক্তি]

শিরোমণি। (আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে ডানহাত তুলিয়া জনার্দ্দনের প্রতি) আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও, ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে।

জনার্দ্দন। (হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া) আজ এই দিয়ে নির্ম্মলকে দু'টো তিরস্কার করতে হ'ল, শিরোমণি মশাই, মনটা তেমন ভাল নেই।

শিরোমণি। না থাকবারই কথা। কিন্তু এ এক-প্রকার ভালই হ'ল ভায়া। এখন বাবাজীর চৈতন্যোদয় হবে যে, শ্বশুর এবং পিতৃব্যস্থানীয়দের বিরুদ্ধাচরণ করায় প্রত্যবায় আছে। আর, এ যে হতেই হবে। সর্ব্বমঙ্গলময়ী চণ্ডীমাতার ইচ্ছা কি না।

প্রথম ভদ্রলোক। সমস্তই মায়ের ইচ্ছা। তা নইলে কি ষোড়শী ভৈরবীই বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যেতে চায়!

শিরোমণি। নিঃসন্দেহ। মন্দিরের চাবিটা ত পূজারীর কাছ থেকে কৌশলে আদায় হয়েছে, কিন্তু আসল চাবিটা শুনচি নাকি গিয়ে পড়েছে জমিদারের হাতে। ব্যাটা পাঁড় মাতাল, দেখো ভায়া, শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনারূপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাকবেনা।

জনার্দ্দন। ঐটে খেয়াল করা হয়নি।

শিরোমণি। না, এখন সহজে দিলে হয়। দশদিন পরে হয়ত বলে বসবে কই, কিছুই ত সিন্দুকে ছিলনা! কিন্তু আমরা সবাই জানি ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেননা করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ করবেনা,—একটি পাই পয়সা না।

[অনেকেই এ কথা স্বীকার করিল]

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। এর চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভাল।

শিরোমণি। চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই।

অনেকে। চাই চাই—অবিলম্বে চাই।

প্রথম ভদ্রলোক। আমি বলি চলুন আমরা দল বেঁধে যাই জমিদারের কাছে। বলিগে, চাবিটা দিন, কি আছে না আছে মিলিয়ে দেখিগে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। আমিও তাই বলি।

প্রথম ভদ্রলোক। কাল বেলা তৃতীয় প্রহরে,—হুজুর ঘুমটি থেকে উঠে মদ খেতে বসেছেন, মেজাজ খুশ্ আছে,—ঠিক এমনি সময়টিতে।

অনেকে। ঠিক ঠিক, এই ঠিক মতলব।

শিরোমণি। (সভয়ে) কিন্তু অত্যন্ত মদ্যপান করে থাকলে যাওয়া সঙ্গত হবেনা। কি বল জনার্দ্দন?

[অকস্মাৎ ইহাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কে একজন কহিল,—"স্বয়ং হুজুর আসছেন যে!" পরক্ষণেই জীবানন্দ ও প্রফুল্ল প্রবেশ করিলেন। যাহারা বসিয়া ছিল অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ নাটমন্দিরের উঠিবার সিঁড়ির উপরে বসিতে যাইতেছিলেন, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "আসন, আসন, শীঘ্র একটা আসন নিয়ে এস।"]

জীবানন্দ। (উপবেশন করিয়া) আসনের প্রয়োজন নেই।—দেবীর মন্দির, এর সর্ব্বত্রই ত আসন বিছানো।

জনার্দ্দন। তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এ আপনারই যোগ্য কথা।

[প্রফুল্ল সিঁড়ির একাংশে গিয়া বসিল, এবং হাতে তাহার যে খবরের কাগজখানা ছিল তাহাই খুলিয়া নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল]

শিরোমণি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী! মেঘ না চাইতে জল। আজই দ্বিপ্রহরে আমরা হুজুরের কাছে যাবো স্থির করেছিলাম, কিন্তু পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই জন্যই—

জীবানন্দ। যান্‌নি? কিন্তু হুজুর ত দিনের বেলা নিদ্রা দেননা।

শিরোমণি। কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর—

জীবানন্দ। শোনেন? তা আপনারা অনেক কথা শোনেন যা সত্য নয় এবং অনেক কথা বলেন, যা মিথ্যা। এই যেমন, আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—

[এই বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুসড়িয়া গেল]

জনার্দ্দন। মন্দির সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে তা' আশা ছিলনা। নির্ম্মল যে'রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ। তিনি সোজা হলেন কি প্রকারে?

শিরোমণি। (খুসি হইয়া সদর্পে), সমস্তই মায়ের ইচ্ছা হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর বইতে পারছিলেননা।

জীবানন্দ। তাই হবে। তারপরে?

শিরোমণি। কিন্তু পাপ ত দূর হল, এখন,—বলনা জনার্দ্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বলনা।

জনার্দ্দন। (চকিত হইয়া) মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিয়েইচি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেছেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুন্‌তে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতে সমর্পণ করেছে।

জীবানন্দ। তা' করেছে। জমাখরচের খাতাও একখানা দিয়েছে।

শিরোমণি। বেটি এখনও আছে, কিন্তু কখন্ কোথায় চলে যায় সে তো বলা যায় না।

জীবানন্দ। (মুহূর্ত্তকাল বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া) কিন্তু সে জন্য আপনাদের উদ্বেগ কিসের? তাকে তাড়ানোও ত চাই। কি বলেন রায় মশায়?

জনার্দ্দন। দলিল-পত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা' কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণি মশায় বল্‌ছেন যে ষোড়শী থাক্‌তে থাক্‌তেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখ্‌লে ভাল হয়। হয়ত'—

জীবানন্দ। হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাকলেই বা আপনারা আদায় করবেন কি করে?

জনার্দ্দন। (হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে বলিলেন) কি জানেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর।

জীবানন্দ। তা যাবে। কিন্তু শুধু শুধু জানা গিয়ে আর লাভ কি?

শিরোমণি। (প্রথম ভদ্রলোকের প্রতি অলক্ষ্যে) সেরেছে!

জনার্দ্দন। কিন্তু কোন দিন ত জান্‌তেই হবে হুজুর।

জীবানন্দ। তা হবে। কিন্তু আজ আমার সময় নেই রায় মশায়।

শিরোমণি। (ব্যগ্র হইয়া) আমাদের সময় আছে হুজুর। চাবিটা জনার্দ্দন ভায়ার হাতে দিলেই সন্ধ্যার পরে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখতে পারি। হুজুরেরও কোনও দায়িত্ব থাকেনা,—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল-হে তোমরা? ঠিক বলেছি কি না?

[সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিলনা শুধু যাহার হাতে চাবি]

জীবানন্দ। (ঈষৎ হাসিয়া) ব্যস্ত কি শিরোমণি মশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত ভিখিরীর কাছ থেকে আর আদায় হবেনা। আজ থাক্ যেদিন আমার অবসর হবে আপনাদের খবর দেব।

[মনে মনে সকলেই ক্রুদ্ধ হইল]

জনার্দ্দন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ। সে তো ঠিক কথা রায় মশায়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বই কি।

[সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে জমিদারের দৃষ্টিপথের বাহিরে আসিয়া]

শিরোমণি। (জনার্দ্দনের গা টিপিয়া) দেখলে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। ওয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালি। মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবেনা বেশি দিন।

জনার্দ্দন। হুঁ। যা ভয় করা গেল তাই হল দেখ্‌চি।

শিরোমণি। এবার গেল সব শুঁড়ির দোকানে। বেটি যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

প্রথম ভদ্রলোক। হুজুর চাবি আর দিচ্চেন না।

শিরোমণি। আবার? এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে। (কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল)

[সকলের প্রস্থান।

প্রফুল্ল। (খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দাদা, আবার একটা নূতন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন? চাবিটা ওদের দিয়ে দিলেই ত হোতো।

জীবানন্দ। হোতোনা প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েছে।

প্রফুল্ল। সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা পড়ে দেখছিলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানা রকমের জড়োয়া গয়না, কত কি দলিল পত্র, তা'ছাড়া সোনা রূপার বাসন কোশনও কম নয়। কত কাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চুরি ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জানতেও দিতনা।

প্রফুল্ল। (সভয়ে) বলেন কি! তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে?

জীবানন্দ। নিতান্ত মিথ্যে বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। অথচ, এ আমি চাইনি। যতই তাকে পীড়াপীড়ি কোরলাম, জনার্দ্দনকে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল। এর কারণ?

জীবানন্দ। বোধহয় সে ভেবেছিল এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপলে তার আর সইবেনা। ওদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল। কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারেনি।

জীবানন্দ। (হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিলনা) সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আর যত দিকেই করে থাকি প্রফুল্ল, আমাকে চিন্‌তে না দেওয়ার অপরাধ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য এর মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি স্থির করে নেয় কিছুই বলবার যো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে একদিন মরফিয়া চেয়ে নিয়ে চোখ বুজে খেয়েছিলাম, সেই হ'ল তার সকল তর্কের বড় তর্ক,—সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিল না,—সে ছাড়া যে আর কারও পানে চাইবার কোথাও কেউ ছিল না—এ সব ষোড়শী একেবারে ভুলে গেছে। কেবল একটি কথা তার মনে জেগে আছে—যে নিজের প্রাণটা অসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি কোরে! ব্যস্‌, যা কিছু ছিল চোখ বুজে দিলে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ায় ভয়ানক চালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসারটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যেত, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবারও ঠাঁই পেতনা।

প্রফুল্ল। অতিশয় খাঁটি কথা দাদা! অতএব, অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলে তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক দিন,—জমানো মোহর গুলোয় যদি সলোমান সাহেবের দেনাটা শোধ যায় ত শুধু রসের বাষ্প কেন, মুষল ধারে বর্ষণ সুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ। প্রফুল্ল, এই জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল। (হাত জোড় করিয়া) এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অক্ষয় হোক্‌, কিন্তু মোসাহেবী করে এ অধীনের গলার চুন্সিটা পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গেছে। এইবার একবার বাইরে গিয়ে দু'টো ডাল-ভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে ক'বার নেওয়া হল প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। বার চারেক। (হাসিয়া ফেলিয়া) ভগবান্‌ মুখটা দিয়েছিলেন তা বড় লোকের প্রসাদ খেয়েই

দিন গেল; দু'টো বড় কথাও যদি না মাঝে মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাৎ অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের অন্নকে কখনো উঁচু কখনো নীচু বলে এ দেহটার মেদ-মাংসই কেবল পরিপূর্ণ করেছি, সত্যিকারের রক্ত বল্‌তে আর ছিটে-ফোঁটাও বাকি রাখিনি। আজ ভাব্‌চি এক কাজ কোরব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে খপ করে ভৈরবী ঠাকরুণের এক খাম্‌চা পায়ের ধুলো নিয়ে ফে'লব। আপনার অনেক ভাল-মন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্য্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবে না, পেটে লোহার মত ফুটবে।

জীবানন্দ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্চে প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। (যুক্ত হস্তে) তা'হলে বলুন দাদা, এটা শেষ করি। মোসাহেবীর পেন্সন বলে সেদিন যে উইল-খানায় হাজার পাঁচেক টাকা লিখে রেখেছেন, সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখবেন,—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবে না, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেন না।

জীবানন্দ। তা'হলে এবার আমাকে তুমি সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল। আশীর্ব্বাদ করুন এই সুমতিটুকু যেন শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে। কিন্তু কবে যাচ্চেন তিনি?

জীবানন্দ। জানিনে।

প্রফুল্ল। কোথায় যাচ্চেন তিনি?

জীবানন্দ। তাও জানিনে।

প্রফুল্ল। জেনেও কোন লাভ নেই দাদা। বাপরে! মেয়ে মানুষ ত নয়, যেন পুরুষের বাবা। মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেদিন অনেকক্ষণ চেয়ে ছিলাম, মনে হল, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন পাথরে গড়া। ঘা মেরে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে গলিয়ে যে ইচ্ছে মত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন, সে বস্তুই নয়। পারেন ত ও মৎলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ। (বিদ্রূপের স্বরে) তা'হলে প্রফুল্ল, এবার নিতান্তই যাচ্চো?

প্রফুল্ল। গুরুজনের আশীর্ব্বাদের জোর থাকে ত মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বই কি।

জীবানন্দ। তা' হতে পারে। আচ্ছা, ষোড়শী সত্যই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রফুল্ল। হয়। কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভাল কথা দাদা, একটা খবর দিতে আপনা[কে] ভুলে ছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বে[ড়াচ্]ছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ফকির সাহেব। আ[প]নাকে যিনি একদিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিক[ার] করতে দেন্‌নি,—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন-তিনি। কুর্ণিশ করে কুশল প্রশ্ন কোরলাম, ই[চ্ছে] ছিল মুখরোচক দু'টো খোসামোদ টোষামো[দ] করে যদি একটা কোন ভাল রকমের ওষুধ-টা[ও] বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটে নিয়ে বেচে দু'পয়সা-রোজগার কোরব। বি[ন্তু] ব্যাটা ভারি চালাক, সে দিক দিয়েই গেলন[া]। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী মা[কে] দেখতে এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্চেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চেন তাঁ[র] কাছেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ। এঁর সদুপদেশের ফলেই বোধ হয়?

প্রফুল্ল। না। বরঞ্চ, উপদেশের বিরুদ্ধেই যাচ্চেন।

জীবানন্দ। বল কি হে, ফকির যে শুনি তাঁর গুর[ু]। গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রফুল্ল। এ ক্ষেত্রে তাই বটে।

জীবানন্দ। কিন্তু এত বড় বিরাগের হেতু?

প্রফুল্ল। হেতু আপনি। কি জানি, এ কথা শোনা[নো] আপনাকে উচিত হবে কি না, কিন্তু ফকিরে[র] বিশ্বাস আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত [ভয়] করেন। পাছে, কলহ-বিবাদের মধ্যে দিয়ে আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই [তাঁর] সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। নইলে, ভয় তাঁর রি[পু]কলকেও নয়, গ্রামের লোককেও নয়।

[জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলে[ন]

প্রফুল্ল। দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় ক[ম] দেন নি, কিন্তু সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনি মারাত্মক ভুল করলেন, না হাত পেতে নি[য়ে] আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাং[সা] আজ বাকি রয়ে গেল। বেঁচে থাকি ত এ[ক] দিন দেখতে পাবো আশা হয়।

[জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সহ[সা] বেহারা পাত্র ভরিয়া মদ লইয়া প্রবেশ করিতেই]

জীবানন্দ। আঃ—এখানেও। যা নিয়ে যা দরকার নেই।

প্রফুল্ল। রাগ করেন কেন দাদা, যেমন শিক্ষা বরঞ্চ কখন্ দরকার সেইটে বলে দিন্ ন[া]

[বেহারা প্রস্থান করি[ল]

প্রফুল্ল। অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) অরুচি নয়, কিন্তু আর খাবো না।

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) এই নিয়ে ক'বার হল দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এ মীমাংসাটাও আজ না হয় বাকি থাক্ প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

[বেহারা পুনরায় প্রবেশ করিল]

বেহারা। এই পিস্তলটা ভুলে টেবিলের ওপর ফেলে রেখে এসেছিলেন।

জীবানন্দ। ভুলেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু ওতেও আর কাজ নেই, তুই নিয়ে যা।

প্রফুল্ল। কিন্তু রাত প্রায় এগারোটা হ'ল, বাড়ী চলুন?

জীবানন্দ। না, বাড়ী নয় প্রফুল্ল, এখন একলা অন্ধকারে একটু ঘুরতে বার হব।

প্রফুল্ল। একলা? নিরস্ত্র? না না, সে হয় না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে-ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। অন্ততঃ নিত্য সহচরটিকে সঙ্গে রাখুন। (এই বলিয়া সে ভৃত্যের হাত হইতে পিস্তল লইয়া দিতে গেল)

জীবানন্দ। (পিছাইয়া গিয়া) এ জীবনে ওকে আর আমি ছুঁচ্ছিনে প্রফুল্ল। আজ থেকে আমি এম্‌নি একাকী বার হব, যেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার। আমার থেকেও কারও কোন না ভয় হোক্; তার পরে যা হয় তা ঘটুক, আমি কারও কাছে নালিশ কোরব না।

প্রফুল্ল। হঠাৎ হ'ল কি? না হয়, পাইকদের কাউকে ডেকে দিই?

জীবানন্দ। না, পাইক পিয়াদা আর নয়। তোমরা বাড়ী যাও।

প্রফুল্ল। আপনার অবাধ্য হব না দাদা, আমরা চললাম, কিন্তু আপনিও বেশি বিলম্ব করবেন না আমার অনুরোধ।

[প্রফুল্ল ও বেহারা প্রস্থান করিল।

[জীবানন্দ ধীরে ধীরে নাটমন্দিরের আর একটা দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন পান্থ ঠেস দিয়া বসিয়া মৃদু কণ্ঠে নাম গান করিতেছিল। এবং অদূরে চার-পাঁচ জন লোক চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। জীবানন্দ হেঁট হইয়া অন্ধকারে তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিল]

গীত

পূজা করে তোরে-তারা
সার যদি হয় নয়নধারা
শুভঙ্করী নাম তবে মা
ধরিস্ কেন দুঃখ-হরা।
কি পাপেতে বল মা কালী
মাখালি কলঙ্ক-কালি—
এখন ভরসা কেবল কালী
তুই মা বরাভয়করা।

জীবানন্দ। তুমি কে হে?

পথিক। আজ্ঞে, আমি একজন যাত্রী বাবু।

জীবানন্দ। বাবু বলে আমাকে চিন্‌লে কি করে?

পথিক। আজ্ঞে, তা' আর চেনা যায় না? ভদ্দর লোক ছাড়া এমন ধপ ধপে জামা কাপড় আর কাদের থাকে বাবু?

জীবানন্দ। ওঃ—তাই বটে? কোথা থেকে আসচো? কোথায় যাবে? এরা বুঝি তোমার সঙ্গী?

পথিক। আসচি মানভূম জেলা থেকে বাবু, যাবো পুরীধামে। এদের কারও বাড়ী মেদিনীপুরে, কারও বাড়ী আর কোথাও,—কোথায় যাবে তাও জানিনে।

জীবানন্দ। আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? ম্বরা থাকে তা'রা দু'বেলা খেতে পায়, না?

পথিক। (লজ্জিত হইয়া) কেবল খাবার জন্যেই নয় বাবু। আমার পা কেটে গিয়ে ঘায়ের মত হয়েছে দেখেই মা ভৈরবী নিজে হুকুম দিয়েছিলেন, যত দিন না সারে তুমি থাকো।

জীবানন্দ। তোমাকে বলিনি ভাই, বেশ ত, থাকো না। যায়গার ত আর অভাব নেই।

পথিক। কিন্তু ভৈরবী মা ত আর নেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ। এরই মধ্যে শুনতে পেয়েছ? তা' না-ই তিনি থাক্‌লেন তাঁর হুকুম ত আছে? তোমাকে যেতে বলে কার সাধ্য! বাড়ী কোথায় তোমার ভাই?

পথিক। বাড়ী আমার ছিল বাবু মানভূঁয়ের বংশীতট গাঁয়ে। গাঁয়ে অন্ন নেই, জল নেই, ডাক্তার বদ্যি নেই,—জমিদার থাকেন কলকাতায়, কখনো তাঁকে কেউ দুঃখ জানাতে পারিনে। আছে শুধু গমস্তা টাকা আদায়ের জন্যে।

[জীবানন্দ নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া সায় দিল]

পথিক। উপরি উপরি দু'সন বৃষ্টি হলনা, ক্ষেতের ফসল জলে পুড়ে গেল, এও সয়েছিল বাবু,—কিন্তু—(কান্নায় তাহার গলা বুজিয়া আসিল)

জীবানন্দ। তাই বুঝি তীর্থ দর্শনে একবার বেরিয়ে পড়লে?

পথিক। (মাথা নাড়িয়া) এই ফাল্গুনে পরিবার মারা গেল, একে একে দুই ছেলে ওলাউঠায় চোখের সামনে মারা গেল বাবু, এক ফোঁটা ওষুধ কাউকে দিতে পারলামনা।

[বলিতে বলিতে লোকটি উচ্ছ্বসিত শোকে কাঁদিয়া ফেলিল। জীবানন্দ আমার হাতায় চোখ মুছিতে লাগিল]

পথিক। মনে মনে বল্‌লাম, আর কেন? ভাঙা কুঁড়েখানি বিধবা ভাইঝিকে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম,—বাবু, আমার চেয়ে দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ। ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় যায়গা, এর কোথায় কে কি ভাবে আছে বলবার যো নেই।

পথিক। কিন্তু আমার মত—

জীবানন্দ। দুঃখী? কিন্তু দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নেই। তাহ'লে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে পারতো। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই কেবল মানুষে টের পায়। আমার সব কথা তুমি বুঝবেনা, ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও। অন্ততঃ, একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তাকে তুমি চিন্‌তেও পারোনি। কিন্তু তুমি মায়ের নাম করছিলে—

[সহসা সাগর ও হরিহর দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল]

হরিহর। আমাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেছে তার সর্ব্বনাশ না করে আমরা কিছুতেই ছাড়বনা।

সাগর। মায়ের চৌকাট ছুঁয়ে দিব্যি করলাম খুড়ো, ফাঁসি যেতে হয় তাও যাবো।

হরিহর। হঃ—আমাদের আবার জেল, আমাদের আবার ফাঁসি। মা আগে যাক,—

হরিহর ও সাগর। জয় মা চণ্ডী!

[উভয়ের প্রস্থান।

জীবানন্দ। বাস্তবিক, ঠাকুর-দেবতার মত এমন সাক্ষী প্রোক্তা আর নেই। হোক্‌না মিথ্যা জল্প, তবু তার দাম আছে। দুর্ব্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়!

পথিক। কি বল্‌লেন বাবু?

জীবানন্দ। কিছু না ভাই, তুমি মায়ের নাম করছিলে, আমি বাধা দিলাম। আবার সুরু কর আমি চোললাম! কাল এম্‌নি সময়ে হয়ত আবার দেখা পাবে।

পথিক। আর ত দেখা হবেনা বাবু, আমি পাঁচ দিন আছি কালই সকালে চলে যেতে হবে।

জীবানন্দ। চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বল্‌লে তোমার পা এখনো সারেনি, তুমি হাঁটতে পারোনা?

পথিক। মায়ের মন্দির এখন রাজাবাবুর। হুজুরের হুকুম তিন দিনের বেশি আর কেউ থাকতে পারবেনা।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) ভৈরবী এখনও যায়নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে? মা চণ্ডীর কপাল ভাল! আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হল' কি রকম? কি খেলে ভাই?

পথিক। যাদের তিনদিনের বেশি হয়নি তারা মায়ের প্রসাদ সবাই পেলে।

জীবানন্দ। আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশি হয়ে গেছে?

পথিক। ঠাকুর মশাই কি করবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কিনা।

জীবানন্দ। তাই হবে। (এই বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস মোচন করিল) কাল আমি আবার আসবো, কিন্তু ভাই, চুপি চুপি চলে যেতে পাবেনা।

পথিক। ঠাকুর মশায় যদি কিছু বলে?

জীবানন্দ। বল্‌লেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবেনা? রাত হল, এখন যাই, কিন্তু মনে থাকে যেন।

[এমনি সময়ে ষোড়শী প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, জীবানন্দ পিছন হইতে ডাক দিল]

জীবানন্দ। অলকা?

ষোড়শী। (চমকিয়া) আপনি? এত রাত্রে আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ। কি জানি, এম্‌নি এসেছিলাম। তুমি যাত্রার আগে ঠাকুর প্রণাম করতে যাচ্ছ, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

ষোড়শী। আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে সে তো আপনি জানেন?

জীবানন্দ। বিপদ? জানি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ জীবনে আর যাই কেননা স্বীকার করি, আমার শত্রু আছে এ আমি একটা দিনও আর মান্‌বনা।

ষোড়শী। কিন্তু কি হবে আমার সঙ্গে গিয়ে?

জীবানন্দ। কিছু না। শুধু যতক্ষণ আছো সঙ্গে থাকবো, তার পর যখন সময় হবে তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ী চলে যাবো। যাবার দিনে আজ আর আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরোনা। আমার আয়ুর দাম ত জানো, হয়ত আর দেখাও হবেনা। আমাকে যে তুমি কত রকমে দয়া করে গেছ, শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি সেই কথাই স্মরণ কোরব।

ষোড়শী। আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে।

[রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে গিয়া ষোড়শী প্রণাম করিল। জীবানন্দ বলিতে লাগিল]

জীবানন্দ। তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন অলকা। দু'টো দিনও কি আর তোমার থাকা চলে না?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। একটা দিন?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা কর!

ষোড়শী। কিন্তু তাতে কি আপনার প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ। এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায়, সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই।

[ষোড়শী জীবানন্দের কাছে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া নীরবে দাঁড়াইল]

জীবানন্দ। (দাঁড়াইয়া) আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ অলকা, সবাই জানবে আমি শাস্তি দিয়েছি, তুমি সহ্য করেছ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। এত বড় মিথ্যে কলঙ্ক আমি সইব কেমন করে? তাও সয় যদি একটি দিন,—শুধু কেবল একটি দিনও তোমাকে কাছে রাখতে পারি।

ষোড়শী। (পিছাইয়া গিয়া) চৌধুরী মশাই, কিসের জন্যে এত অনুনয় বিনয়? আপনার পাইক পিয়াদাদের গায়ের জোরের ত আজও অভাব হয়নি। আপনি তো জানেন, আমি কারো কাছে নালিশ কোরব না।

জীবানন্দ। (পথ ছাড়িয়া সরিয়া) তা'হলে তুমি যাও। অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে আমি পীড়ন করব না। পাইক পিয়াদা সবাই আছে অলকা, তাদের জোরেরও অভাব হয়নি। কিন্তু, যে নিজে ধরা দিলে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর. আর আমার গায়ে নেই।

ষোড়শী। (গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া) আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ,—

জীবানন্দ। কি অনুরোধ অলকা?——

[বাহিরে গরুর গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ হইল]

ষোড়শী। দয়া করে একটু সাবধানে থাক্‌বেন।

জীবানন্দ। সাবধানে থাক্‌ব। কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠ্‌ব না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই মন্দিরে কে দু'জন দেবতার চৌকাট ছুঁয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল, তাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেছে, তার সর্ব্বনাশ না করে তারা বিশ্রাম করবে না,—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সব শুনলুম,—দু'দিন আগে হলে হয়ত মনে হত, আমিই বুঝি তাদের লক্ষ্য,—দুশ্চিন্তার সীমা থাক্‌তো না, কিন্তু আজ কিছু মনেই হল না,—কি অলকা? চম্‌কালে কেন?

ষোড়শী। (পাংশু মুখে) না কিছু না। এইবারে আপনার চণ্ডীগড় ছেড়ে বাড়ী যাওয়া উচিত। আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ। (অন্যমনস্কতায়) কাজ নেই?

ষোড়শী। কই আমিত আর দেখ্‌তে পাইনে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যেই আপনি এসেছিলেন। আমার মত অসতীকে নির্ব্বাসিত করার পরে আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখতে পাইনে।

জীবানন্দ। (চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিয়া) কিন্তু তুমি তো অসতী নও।

[গাড়োয়ানের প্রবেশ]

গাড়োয়ান। মা, আর কি বেশি দেরী হবে?

ষোড়শী। না বাবা, আর বেশি দেরী হবে না।

[গাড়োয়ান প্রস্থান করিল]

চণ্ডীগড় থেকে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে তা' বলে দিচ্চি।

জীবানন্দ। কোথায় যাবো বল?

ষোড়শী। কেন, আপনার নিজের বাড়ীতে। বীজগাঁয়ে।

জীবানন্দ। বেশ তাই যাবো।

ষোড়শী। কিন্তু কালকেই যেতে হবে।

জীবানন্দ। (মুখ তুলিয়া) কালই? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জলনিকাশের একটা সাঁকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব ফিরিয়ে দিতে হবে, সে তো তোমারই হুকুম। তাছাড়া মন্দিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই,—অতিথি অভ্যাগত যারা আসে তাদের ওপর না অত্যাচার হয়,—এসব না করেই কি তুমি চলে যেতে বল্‌চ?

ষোড়শী। (মুস্কিলে পড়িয়া) এসব সাধু সংকল্প কি কাল সকাল পর্য্যন্ত থাকবে? (জীবানন্দ নীরব রহিল) কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশি থাকবেন না আমাকে কথা দিন্। এবং সে ক'টা দিন আগেকার মত সাবধানে থাকবেন বলুন?

জীবানন্দ। (সে কথায় কান না দিয়া) আমার কৃতকর্ম্মের ফল যদি আমি ভোগ করি সে অভিযোগ আমি কারু কাছে কোরব না,—কিন্তু যাবার সময় তোমার কাছে আমার শুধু একটি মাত্র দাবী আছে—(পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া ষোড়শীর হাতে দিয়া) এই চিঠিখানি ফকির সাহেবকে দিয়ো।

ষোড়শী। দেব। কিন্তু এ পত্র কি আমি পড়তে পারিনে?

জীবানন্দ। পারো, কিন্তু আবশ্যক নেই। এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবে না। আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে তার ঢের বেশি দুঃখ তুমি নিজে নিয়েচ। নইলে এমন করে হয়ত আমাকে,—কিন্তু যাক্ সে। আমার শেষ অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা যদি রাখতে পারো তার চেয়ে আনন্দ আর আমার নেই।

ষোড়শী। তাহলে পড়ি?

[ষোড়শী নীরবে চিঠিখানি পড়িল, তাহার মুখে ভাবের একান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিল; জীবানন্দকে আড়াল করিয়া তাড়াতাড়ি সজল চক্ষু মুছিয়া ফেলিল]

ষোড়শী। আমি যে কুষ্ঠাশ্রমের দাসী হয়ে যা[ই] এখবর তুমি জানলে কি কোরে?

জীবানন্দ। কুষ্ঠাশ্রমের কথা অনেকেই জানে। [কিন্তু] তোমার কথা? আজই দেবতার স্থানে দাঁ[ড়িয়ে] যারা শপথ করে গেল, নিজের কানে শু[নে] আমি যাদের চিনতে পারিনি, তুমি তা[দের] চিনলে কি কোরে?

ষোড়শী। তোমার কি সংসারে আর মন নে[ই]? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে কি তুমি সন্ন্যাসী [হয়ে] বেরিয়ে যেতে চাও না কি?

জীবানন্দ। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) অ[মি] সন্ন্যাসী? মিছে কথা। আমি বাঁচতে চাই[,] মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চা[ই]। বাড়ী চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই, আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সে[দিন] তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চা[ই]। কিন্তু এ প্রার্থনা জানাবো আমি কার কাছে!

[গাড়োয়ানের প্রবেশ]

গাড়োয়ান। মা শৈবালদীঘি সাত আট কো[শ] পথ, এখন বার না হলে পৌঁছাতে বেলা [হয়ে] যাবে।

ষোড়শী। চল, বাবা, যাচ্চি।

[গাড়োয়ান প্রস্থান করিল। ষোড়শী পুন[রায়] জীবানন্দকে প্রণাম করিল]

ষোড়শী। আমি চল্লাম।

জীবানন্দ। এখুনি? এত রাত্রে?

ষোড়শী। প্রজারা জানে আমি ভোর বেলায় য[াত্রা] কোরব, তারা এসে পড়বার পূর্ব্বেই আম[ার] বিদায় হওয়া চাই।

[প্রস্থা[ন]]

জীবানন্দ। (একাকী অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াই[য়া]) অলকা! অলকা! একদিন তোমার মা আ[মার] হাতে তোমাকে দিয়েছিলেন; তবু তোমা[কে] পেলাম না; কিন্তু সেদিন আমাকে যদি [তিনি] তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় [তু]মি অন্ধকারে আমাকে এমন করে ফেলে যে[তে] পারতে না।

[বাহির হইতে গরুর গাড়ী চালানোর শব্দ [শুনা] যাইতে লাগিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শান্তিকুঞ্জ

[জমিদারের "শান্তিকুঞ্জ" তিন চারিদিন হইল ভস্মীভূত হইয়াছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বহু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। সবই পুড়িয়াছে, মাত্র ভৃত্যদের বাস দুই ঘর রক্ষা পাইয়াছে। ইহার মধ্যেই জীবানন্দ আশ্রয় লইয়াছেন। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বারুই নদীর জল দেখা যাইতেছে; প্রভাত বেলায় সেই দিকে চোখ মেলিয়া জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়া ছিলেন। মুখে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার কোন প্রকাশ নাই, শুধু সারারাত্রি ধরিয়া উৎকট রোগ-ভোগের একটা অবসন্ন ম্লানছায়া তাঁহার সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে]

[প্রফুল্ল প্রবেশ করিল]

প্রফুল্ল। এখন কেমন আছেন দাদা?

জীবানন্দ। ভাল আছি।

প্রফুল্ল। বহু কালের অভ্যাস, ওষুধ বলেও যদি এক আধ আউন্স—

জীবানন্দ। (সহাস্যে) ওষুধই বটে। না প্রফুল্ল, মদ আমি খাবো না।

প্রফুল্ল। রাত্রিটা কাল কি উৎকণ্ঠাতেই আমাদের কেটেছে। যন্ত্রণায় হাত-পা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

জীবানন্দ। তাই এই গরম করার প্রস্তাব?

প্রফুল্ল। বল্লভ ডাক্তারের ভয়, হয় ত হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে।

জীবানন্দ। হার্ট ত হঠাৎই ফেল করে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। কিন্তু সে জন্যে ত একটা—

জীবানন্দ। (নিজের হার্ট হাত দিয়া দেখাইয়া) ভায়া, এ বেচারা বহু উপদ্রবেও সমানে চলচে কোন দিন ফেল করেনি। দৈবাৎ একদিন একটা অকাজ যদি করেই বসে ত মাপ করা উচিত।

প্রফুল্ল। কি একগুঁয়ে মানুষ আপনি দাদা! ভাবি, এত বড় জিদ এতকাল কোথায় লুকানো ছিল!

জীবানন্দ। ভাল কথা, তোমার ডাল-ভাতের যোগাড়ে যাবার যে একটা সাধু প্রস্তাব ছিল তার কতদূর?

প্রফুল্ল। ঘাট হয়েছে দাদা। আপনি ভাল হয়ে উঠুন, ডাল-ভাতের চিন্তা তার পরেই কোরব।

জীবানন্দ। আমার ভাল হবার পরে ত? যাক্ তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

[তারাদাস ও পূজারীর প্রবেশ]

তারাদাস। মন্দিরের খান কয়েক থালা ঘটি বাটি পাওয়া যাচ্ছে না।

জীবানন্দ। না গেলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে।

[ব্যস্ত হইয়া এককড়ির প্রবেশ]

এককড়ি। (ডাক ছাড়িয়া) এ কাজ সাগর সর্দ্দারের। আজ খবর পাওয়া গেল, তাকে আর তার দু'জন সঙ্গীকে সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত এদিকে ঘুরে বেড়াতে লোক দেখেচে। থানায় সংবাদ পাঠিয়েচি, পুলিশ এল বলে। সমস্ত ভূমিজ গুষ্টিকে যদি না আমি এই ব্যাপারে আন্দামানে পাঠাতে পারি ত আমার নামই এককড়ি নন্দী নয়,—বৃথাই আমি এতকাল হুজুরের সরকারে গোলামি করে মরেচি!

জীবানন্দ। (একটু হাসিয়া) তাহলে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের ঘর জ্বালিয়েছ সে তো আমি জানি। এদের আগুন দিতে কেউ চোখে দেখেনি, কেবল সন্দেহের উপর যদি তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়, জানা অপরাধের জন্য তোমাকেও ত তার ভাগ নিতে হয়।

এককড়ি। (প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া, পরে শুষ্ক হাস্যের সহিত) হুজুর মা-বাপ। আমাদের সাতপুরুষ হুজুরের গোলাম। হুজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, ফাঁসি যাওয়ায় আমাদের অহঙ্কার।

জীবানন্দ। যা পুড়েছে সে আর ফিরবে না; কিন্তু এরপর যদি পুলিশের সঙ্গে জুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দু'পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা কর, তাহলে হুজুরের লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে এককড়ি।

পূজারী। মিস্ত্রী এসেছে হুজুরের কাছে নালিশ জানাতে।

জীবানন্দ। কিসের নালিশ?

পূজারী। মন্দিরের মেরামতি কাজে ঘটনা-চক্রে তার বিশেষ লোকসান হয়ে যায়। মা বলেছিলেন কাজ শেষ হলে তার ক্ষতি পূরণ করে দেবেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম হুজুর।

জীবানন্দ। তবে দেওয়া হয়না কেন ?

পূজারী। (তারাদাসকে ইঙ্গিত করিয়া) উনি বলেন, যে বলেছিল তার কাছে গিয়ে আদায় করতে।

[জীবানন্দ ক্রুদ্ধ চক্ষে তারাদাসের প্রতি চাহিতে]

তারাদাস। অনেকগুলো টাকা—

জীবানন্দ। অনেকগুলো টাকাই দেবে ঠাকুর।

তারাদাস। কিন্তু খরচটা ন্যায্য কি না—

জীবানন্দ। দেখ তারাদাস, ও সব শয়তানি মৎলব তুমি ছাড়ো। ষোড়শীর ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার তোমার ওপরে নেই। যা' বলে গেছেন তাই করগে। (পূজারীর প্রতি) মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে ?

পূজারী। আছে হুজুর।

জীবানন্দ। চল, আমি নিজে গিয়ে সমস্ত মিটিয়ে দিচ্ছি।

[জীবানন্দ, প্রফুল্ল, তারাদাস ও পূজারীর প্রস্থান। রহিল শুধু এককড়ি। শিরোমণি ও জনার্দ্দন রায়ের প্রবেশ]

জনার্দ্দন। বাবু গেলেন কোথা ?

এককড়ি। (তিক্ত কণ্ঠে) কে জানে।

জনার্দ্দন। কে জানে কি হে ? পুলিশে খবর দেবার কথাটা তাঁকে বলেছিলে ?

এককড়ি। পারেন, আপনিই বলুন না।

জনার্দ্দন। ব্যাপার কি এককড়ি ?

এককড়ি। কে জানে কি ব্যাপার। না আছে মেজাজের ঠিক, না পাই কোন কথার ঠিকানা। তারা ঠাকুরকে তেড়ে মারতে গেলেন, আমাকে পাঠাতে চাইলেন জেলে,—

শিরোমণি। অত্যধিক মদ্যপানের ফল। হুজুর কি এখনি ফিরে আসবেন মনে হয় ?

এককড়ি। বুঝলেন রায় মহাশয়, মিথ্যে সন্দেহ করে সাগর সর্দ্দারের নাম পুলিশে জানানো চলবেনা।

জনার্দ্দন। মিথ্যে সন্দেহ কি হে ? এ যে একরকম স্পষ্ট চোখে দেখা !

শিরোমণি। একবারে প্রত্যক্ষ ব'ললেই হয়।

এককড়ি। বেশ, তাই একবার বলে দেখুন না ?

জনার্দ্দন। বলবই ত হে। নইলে কি গুষ্টিবর্গ মিলে পুড়ে কয়লা হব ? ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে আমিও ত একজন উদ্যোগী।

শিরোমণি। আমার কথাই না কোন্ তার শুনেছে !

জনার্দ্দন। যারা এতবড় জমিদারের বাড়ীতে আগুন দিতে পারে, তারা পারেনা কি ?

এককড়ি। আমিও তাই ভাবি।

জনার্দ্দন। ভেবো পরে। এখন শীঘ্র কিছু একটা করো। এখানে যদি প্রশ্রয় পায় ত, আমাকে ঘরে শিকল দিয়ে মানকচুর মত সেদ্ধ করে ছাড়বে।

শিরোমণি। ব্যাটারা গুরুর দোহাই মানবেনা। ডাকাত কি না। হয়ত বা ব্রহ্ম-হত্যাই করে বসবে। (শিহরিয়া উঠিল)

জনার্দ্দন। আর শুধু কি কেবল বাড়ী ? আমার কত ধানের গোলা, কত খড়ের মাড়, সব শুদ্ধ যদি—

শিরোমণি। দেখ ভায়া, আমি বরঞ্চ দিন কতক শিষ্যবাড়ী থেকে ঘুরে আসিগে।

জনার্দ্দন। কিন্তু আমার ত শিষ্যিবাড়ী নেই ? আর থাকলেও ত ধানের গোলা, খড়ের মাড় নিয়ে শিষ্যিবাড়ী ওঠা যায় না ?

শিরোমণি। না। গেলেও ও সকল ফিরিয়ে আনা কঠিন। আজকালকার শিষ্য সেবকদের মতি-গতিও হয়েছে অন্য প্রকার।

এককড়ি। চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন করে রাখুন।

জনার্দ্দন। তা তো রেখেচি, কিন্তু পাহারা কি তোমাদেরই কম ছিল এককড়ি ?

এককড়ি। আর একটা কথা শুনেছেন ? ভূমিজ প্রজারা গিয়ে কাল আদালতে নালিশ করে এসেছে। শুনচি, কান্না-কাটি শুনে স্বয়ং হাকিম আসবেন সব-জমিন তদারকে।

জনার্দ্দন। বল কি হে ! চণ্ডীগড়ে বাস করে জমিদার আর আমার নামে নালিশ ?

শিরোমণি। শিষ্যগণের আহ্বান উপেক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য নয় জনার্দ্দন !

এককড়ি। দেখুন আস্পর্দ্ধা ! জীবনে বেশিদিন যারা পেটভরে খেতে পায় না, শীতের রাতে যারা বসে কাটায়, মড়কের দিনে যারা কুকুর বেড়ালের মত মরে—

জনার্দ্দন। আবার আবাদের দিনে একমুঠো বীজের জন্যে আমারই দরজার বাইরে পড়ে হত্যা দেয়—

এককড়ি। সেই নিমকহারাম বেটারা আদালতে দাঁড়াবার টাকা পেলেই বা কোথা ? এ দুর্ম্মতি দিলেই বা তাদের কে ?

জনার্দ্দন। এই সোজা কথাটা ব্যাটারা বোঝে না যে কেবল জেলা আদালতই নয়, হাইকোর্ট বলেও একটা কিছু আছে যেখানে জীবানন্দ চৌধুরী জনার্দ্দন রায়কে ডিঙিয়ে' সাগর সর্দ্দার যেতে পারে না।

এককড়ি। নিশ্চয়। টাকা যার মকদ্দমা তার। আপনার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিষ্টার জামাই আছে, কত উকিল মোক্তার আছে, নালিশ যদি করেই, আপনার ভাবনা কিসের?

জনার্দ্দন। (চিন্তিতভাবে) না এককড়ি, কেবল জমি বিক্রীই ত নয়, (ইঙ্গিত করিয়া) আরো যে সব কাজ করা গেছে, ফৌজদারী দণ্ডবিধি কেতাবের পাতায় পাতায় তার ফল-শ্রুতি ত সহজ নয়!

এককড়ি। তা জানি। কিন্তু এই ছোটো লোক চাষার দল হাকিমের কাছে আমল পেলেতো!

জনার্দ্দন। বলা যায় না; এই কথাটাই আজ তোমার মনিবের কাছে পাড়োগে। এখন চোল্‌লাম।

এককড়ি। আসুন। আমিও ইতিমধ্যে একটা কাজ সেরে রাখিগে।

[শিরোমণি এককড়ি ও জনার্দ্দনের প্রস্থান।

(কথা কহিতে কহিতে জীবানন্দ ও প্রফুল্ল প্রবেশ করিল)

জীবানন্দ। না প্রফুল্ল, সে হয় না। মাঠের জল-নিকাশী সাঁকো তৈরির পয়সা যদি নায়েব মশায়ের তবিলে না থাকে ত এখানকার বাড়ী মেরামতও বন্ধ থাক্।

প্রফুল্ল। বেশ থাক্। কিন্তু দেশে ফিরে চলুন।

জীবানন্দ। না।

প্রফুল্ল। না কি রকম? এ বাড়ীতে আপনি থাকবেন কি ক'রে?

জীবানন্দ। যেমন করে আছি। এ সহ্ হয়ে যাবে। মানুষের অনেক কিছুই সয় প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। সয়না দাদা, তারও সীমা আছে। শরীরটা যে হঠাৎ ভয়ানক ভেঙে গেল। বর্ষা সুমুখে। এই ভাঙা মন্দিরে কি এই ভাঙা দেহ সে দুর্য্যোগ সইবে? রক্ষে করুন, এবার বাড়ী চলুন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এই ভাঙা দেহের দেহ-তত্ত্বের আলোচনা আর একদিন করা যাবে ভায়া, এখন কিন্তু নায়েবকে চিঠি লিখে দাও এ টাকা আমার চাই-ই। প্রজারা বছর বছর টাকা যোগাচ্ছে আর মরচে, এবার তাদের মরণ আট্‌কাতে যদি জমিদারীটা মরে ত মরুক্ না।

[দ্রুতপদে জনার্দ্দনের প্রবেশ]

জনার্দ্দন। হুজুর কি নিজে,—স্বয়ং হুকুম দিয়ে আমার—

জীবানন্দ। কি হুকুম রায় মশায়?

জনার্দ্দন। আমার পুকুর ধারের বাগানের বেড়া ভেঙে মন্দিরের জমির সঙ্গে এক করিয়ে দিয়েছেন?

জীবানন্দ। কোন্ বাগানটা বল্‌ছেন? যেখানে বছর কুড়ি পূর্ব্বে মন্দিরের গোশালা ছিল?

জনার্দ্দন। আমি ত জানিনে কবে আবার—

জীবানন্দ। অনেক দিন হ'য়ে গেল কিনা। বোধ হয় নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে কথাটা ভুলে গেছেন।

জনার্দ্দন। (দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া) কিন্তু এ সব করার আগে হুজুর ত আমার কাছে একটা খবর পাঠাতে পারতেন।

জীবানন্দ। খবর পৌঁছবেই জানি। দু'দণ্ড আগে আর পরে। কিছু মনে করবেন না।

জনার্দ্দন। কিন্তু আগে জানালে মাম্‌লা-মকদ্দমা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ। এতেও বাধা উচিত নয় রায় মশায়। ভৈরবীদের হাতে দেবীর বহু সম্পত্তিই বেহাত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো হাত-বদল হওয়া দরকার।

জনার্দ্দন। (শুষ্ক হাস্য করিয়া) তার চেয়ে আর ভাল কথা কি আছে হুজুর। শুন্‌তে পাই সমস্ত গ্রামখানাই একদিন মা চণ্ডীর ছিল। এখন কিন্তু—

জীবানন্দ। জমিদারের গর্ভে গেছে? তা গেছে। তারও ত্রুটি হবেনা রায় মশায়। মন্দিরের দলিল, নক্‌শা ম্যাপ প্রভৃতি যা কিছু আছে কলকাতায় এটর্নির বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমার একলার সাধ্য কি? আপনারা এ কাজে আমারি সহায় থাকবেন।

জনার্দ্দন। থাকবো বই কি হুজুর। আমরা চিরকাল হুজুর সরকারের চাকর বই ত নয়।

[জনার্দ্দন প্রস্থান করিল। জীবানন্দ সকৌতুক হাসিমুখে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

প্রফুল্ল। দাদা কি শেষে একটা রক্তারক্তি বাধাবেন না কি?

জীবানন্দ। যদি বাধে সে ভাগ্যের কথা প্রফুল্ল। তার জন্যে দেবতাদের একদিন তপস্যা করতে হয়েছিল।

প্রফুল্ল। দেবতারা পারেন। লঙ্কার বাইরে বসে তপস্যা করায় পুণ্যও আছে, দুশ্চিন্তাও কম। কিন্তু লঙ্কার ভিতরে যারা বাস করে লঙ্কাকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের ভাগ্যকে ঠিক সৌভাগ্য বলা চলেনা। এসে পর্য্যন্ত গ্রামসুদ্ধ লোকের সঙ্গে বিবাদ করে বেড়ানো আপনার গৌরবেরও নয়, প্রয়োজনও নয়। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার কার্য্যই ত করা গেল, এখন ক্ষান্ত দিয়ে চলুন বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক্!

জীবানন্দ। সময় হলেই যাবো।

প্রফুল্ল। তাই যাবেন। যাই হোক দাদা, আপনার যাবার সময়ের তবু একটা আন্দাজ পাওয়া গেল, কিন্তু আমার যাবার সময় যে কবে আসবে তার কূল কিনারাও চোখে পড়েনা।

[এককড়ির প্রবেশ]

এককড়ি। মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। পুলের কাজটা কোথা থেকে আরম্ভ হবে জানতে চায়।

জীবানন্দ। চলনা প্রফুল্ল, একবার মাঠে গিয়ে তাদের কাজটা দেখিয়ে দিয়ে আসিগে।

প্রফুল্ল। চলুন।

[জীবানন্দ প্রফুল্লকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। অন্যদিক দিয়া শিরোমণি ও জনার্দ্দন রায় প্রবেশ করিলেন]

জনার্দ্দন। বাবু গেলেন কোথায় এককড়ি?

এককড়ি। মিস্ত্রীকে দেখাতে গেলেন—মাঠে সাঁকো তৈরী হবে।

জনার্দ্দন। পাগলের খেয়াল।

শিরোমণি। মদ্যপান জনিত বুদ্ধি-বিকৃতি।

এককড়ি। এই শনিবারে হাকিম সরজমিন-তদন্তে আসবেন। ছোট লোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা কে যোগাচ্চে ঠিক জানতে পারলামনা, কিন্তু এতটুকু জানতে পারলাম তারা সাক্ষী মানলে হুজুর গোপন কিছুই করবেননা। দলিল তৈরির কথা পর্য্যন্ত না।

জনার্দ্দন। (সহাস্যে) আমার বয়সটা কত হয়েছে, ঠাওরাও এককড়ি? চণ্ডীগড়ের জনার্দ্দন রায়কে ওজাহার কাৎ করা যাবেনা, বাপু, আর কোন মতলব ভেঁজে এসোগে। (এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া) তবে, এ কথা জানি তোমার হাতে গিয়ে একটু পড়েচি। মোচড় দিয়ে দু' পয়সা উপরি রোজগারের সময় এই বটে। কিন্তু তাই বলে যা' নয় সয় কর।

এককড়ি। সত্যি বলচি আপনাকে রায় মশায়—

জনার্দ্দন। আহা, সত্যিই ত বলচো! এককড়ি নন্দী আবার মিথ্যে কবে বলেন? সে কথা নয় ভায়া, আমার না হয় শ' খানেক বিঘের টান ধরবে, কিন্তু তাঁর নিজের যাবে কত? সেটা কি তোমার মনিব খতিয়ে দেখেন নি? না দেখে থাকেন ত দেখাওগে চোখে আঙুল দিয়ে। তার পরে না হয় আমাকে প্যাঁচ কোসো।

এককড়ি। যায়গা-জমির কথাই হচ্চেনা, রায়মশায়, কথা হচ্চে দলিল-পত্র তৈরি করার। জিজ্ঞাসা করলে সমস্তই বলবেন, কিছুই গোপন করবেন না।

জনার্দ্দন। তার হেতু? শ্রীঘরে যাবার বাসনা ত? কিন্তু, একা জনার্দ্দন যাবেনা, এককড়ি, মহারাণী হুজুর বলে রেয়াৎ করবে না,—কথাটা তাঁকে বোলো।

এককড়ি। (অভিমানের সুরে) বলতে হয় আপনি নিজেই বলবেন।

জনার্দ্দন। বোলবো বই কি হে। ভাল করেই বোলব। হাকিমের কাছে কবুল জবাব দিয়ে সাধু সাজা ঠাট্টা তামাসা নয়। (ইঙ্গিতে দেখাইয়া) হাতকড়ি পড়বে।

এককড়ি। সে আপনি বুঝবেন আর তিনি বুঝবেন।

জনার্দ্দন। আর তুমি? শ্রীমান এককড়ি নন্দী! বাড়ী যখনি পুড়েছে তখনি জানি কি একটা ভেতরে হচ্চে। কিন্তু জনার্দ্দনকে অত নরম মাটি ঠাউরোনা ভায়া, পস্তাবে। নির্ম্মলকে আটকে রেখেচি, সেই তোমাদের বুঝিয়ে দেবে।

এককড়ি। আমার ওপরে মিথ্যে রাগ করচেন রায় মশায়, যা জানি তাই শুধু জানিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, হুজুর ত এই সামনের মাঠেই আছেন, একটু ঘুরে গিয়ে জিজ্ঞেসা করেই যাননা।

জনার্দ্দন। তাই যাবো। শিরোমণি মশায়, আসুন ত?

শিরোমণি। চলনা ভায়া, ভয় কিসের?

[দুই এক পা অগ্রসর হইয়া সহসা পিছনে ফিরিয়া]

শিরোমণি। (এককড়ির প্রতি) বলি, অত্যধিক মদ্যপান কোরে রয়েচে? তা'হলে না হয়—

এককড়ি। মন তিনি থাবুনা। (হঠাৎ কণ্ঠস্বর সবেত করিয়া) কিন্তু যেতেও আর হবেনা। হুজুর নিজেই আস্‌ছেন।

[জীবানন্দ ও প্রফুল্ল তর্ক করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন]

জনার্দ্দন। (কাছে গিয়া অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার সহিত)। হুজুর সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে দেখুন!

জীবানন্দ। কিসের রায় মশায়?

জনার্দ্দন। জমি বিক্রীর ব্যাপারে হাকিম নিজে আসছেন তদন্ত করতে। হয়ত, ভারি মকদ্দমাই বাধ্‌বে। কিন্তু আপনি না কি—

জীবানন্দ। ও! কিন্তু উপায় কি রায় মশায়? সাহেব জমি ছাড়তে চায় না, সে সস্তায় কিনেচে। মকদ্দমা ত বাধবেই। সুতরাং মামলা জেতা ছাড়া প্রজাদের আর ত পথ দেখিনে।

জনার্দ্দন। (আকুল হইয়া) কিন্তু আমাদের পথ?

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) সে ঠিক, আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

জনার্দ্দন। (মরিয়া হইয়া) এককড়ি তা'হলে সত্যিই বলেছে! কিন্তু হুজুর, পথ শুধু দুর্গম নয়, —জেল খাটতে হবে। এবং আমরা একা নয় আপনিও বাদ যাবেন না।

জীবানন্দ। (একটুখানি হাসিয়া) তাই বা কি করা যাবে রায় মশায়। সখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে, ফল তার খেতে হবে বই কি।

জনার্দ্দন। (চীৎকার করিয়া) এ আমাদের সর্ব্বনাশ করবে এককড়ি।

[পাগলের মত ঝড়ের বেগে জনার্দ্দন বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনে এককড়ি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল]

[নেপথ্যে কোলাহল]

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) কারা যায় প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। বোধ হয় আপনার মাটি-কাটা ধাঙড় কুলীর দল।

জীবানন্দ। একবার ডাকো ত ডাকো ত হে। শুনি আজ বাঁধের কাজ কতখানি করলে।

প্রফুল্ল। (ঈষৎ অগ্রসর হইয়া) ওহে, ও সর্দ্দার? শোন শোন, একবার শুনে যাও।

[স্ত্রী ও পুরুষ কুলীদের প্রবেশ]

সর্দ্দার। কি রে, ডাকছিস্ ক্যেনে?

জীবানন্দ। বাবারা, কোথায় চলেছিস্ বলতো?

সর্দ্দার। ভাত খাবার লাগি রে।

জীবানন্দ। দেখিস্ বাবারা, আমার বাঁধের কাজ যেন বর্ষার আগেই শেষ হয়।

সকলে। (সমস্বরে) সব হোয়ে যাবে রে, সব হোয়ে যাবে। তুই কিছু ভাবিস্‌না। চল।

[কুলীদের প্রস্থান

[নির্ম্মল প্রবেশ করিল]

জীবানন্দ। (সাদরে) আসুন, আসুন, নির্ম্মল বাবু

নির্ম্মল। (নমস্কার করিয়া) আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবানন্দ। আর একদিন হলে হয়না?

নির্ম্মল। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবানন্দ। তা' বটে। অকাজের বোঝা টান্‌তে যাকে আটক থাকতে হয় তাঁর সময় নষ্ট করা চলে না।

নির্ম্মল। অকাজ মানুষে করে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌধুরী মশাই।

জীবানন্দ। কিন্তু কাজের ধারণা ত সকলের এক নয় নির্ম্মলবাবু। রায় মহাশয়ের আমি অকল্যাণ কামনা করিনে। এবং আপনার উদ্দেশ্য সফল হলে আমি বাস্তবিকই খুসি হব, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও আমি স্থির করে ফেলেছি এ থেকে নড়চড় করা আর সম্ভব হবে না।

নির্ম্মল। এ কথা কি সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবানন্দ। সত্য বই কি।

নির্ম্মল। এমন ত হতে পারে আপনার কবুল জবাবে আপনিই শুধু শাস্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবেন।

জীবানন্দ। খুব সম্ভব বটে। কিন্তু সেজন্যে আমার কোন অভিযোগ নেই নির্ম্মলবাবু। নিজের কৃত-কর্ম্মের ফল আমি একা ভোগ করলেই যথেষ্ট। নইলে রায়মশায় নিস্তার লাভ করে সুস্থদেহে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকুন, এবং আমার এককড়ি নন্দী মশায়ও আর কোথাও গোমস্তা-গিরি কর্মে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকুন, কারও প্রতি আমার আক্রোশ নেই।

নির্ম্মল। আত্মরক্ষায় সকলেরই ত অধিকার আছে, অতএব শ্বশুর ম'শায়কেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মামলা মোকর্দ্দমায় বিবরণ দিতে যাওয়া বাহুল্য—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ। চিকিৎসক কি জাল-করার বিষে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন?

নির্ম্মল। (রাগ সম্বরণ করিয়া) এমনও হতে পারে কারও কোন শাস্তিভোগ করারই আবশ্যক হবে না অথচ, ক্ষতিও কাউকে স্বীকার করতে হবে না।

জীবানন্দ। (তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া) বেশত, পারেন ভালই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ, এ শুধু অন্নবস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাত-পুরুষের চাষ আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে। [একটু চুপ করিয়া] আপনি ভালই জানেন, অন্তপক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর জুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষীদের উপর, কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসছে, আর হতে আমি দেব না।

নির্ম্মল। আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারী; এই ক'টা চাষার কি আর তাতে স্থান হবে না? কোথাও না কোথাও—

জীবানন্দ। না না, আর কোথাও না,—এই চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর করে সেদিন তাদের কাছে অনেক টাকা আদায় করেছি,—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দ্দন রায়। এ ঋণ পরিশোধ করতে আমাকে হবেই। এবং আরও যে কত বড় একটা শূল তাদের বিদ্ধ করেছি, সে কথা শুধু আমিই জানি। কিন্তু থাক্। অপ্রীতিকর আলোচনায় আর আমার প্রবৃত্তি নেই, নির্ম্মল বাবু, আমি মনস্থির করেছি।

[জীবানন্দ প্রস্থান করিলেন।

[সেই দিকে চাহিয়া নির্ম্মল অভিভূতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। এমনি সময়ে ফকির সাহেব প্রবেশ করিলেন]

ফকির। জামাই বাবু, সেলাম। বাবু কই?

নির্ম্মল। (অভিবাদন করিয়া) জানিনে। ফকির সাহেব ষোড়শীকে আমাদের বড় প্রয়োজন। তিনি যেখানেই থাকুন একবার আমাকে দেখা করতেই হবে। বলুন, কোথায় আছেন।

ফকির। আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই, কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছিল, তখন আপনিই শুধু তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন।

নির্ম্মল। আর আজ ঠিক সেইটি উল্টে দাঁড়িয়েছে ফকির সাহেব। এখন, কেউ যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত শুধু তিনিই। কোথায় আছেন এখন?

ফকির। শৈবাল দীঘির কুষ্ঠাশ্রমে।

নির্ম্মল। কুষ্ঠাশ্রমে? সেখানে কি সুখে আছেন?

ফকির। (মৃদু হাসিয়া) এই নিন্। মেয়ে মানুষের সুখে থাকার খবর দেবতারা জানেন না, আমি ত আবার সন্ন্যাসী মানুষ। তবে, মা আমার শান্তিতে আছেন এইটুকুই অনুমান করতে পারি।

নির্ম্মল। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) এখানে আপনি কোথায় এসেছিলেন?

ফকির। জমিদার জীবানন্দর এই চিঠি পেয়ে তাঁরই সঙ্গে একবার দেখা করতে। এই চিঠি আপনাদের পড়া প্রয়োজন। নিন্ পড়ুন।

[চিঠিখানি দিতে গেলেন।]

নির্ম্মল। (সসঙ্কোচে) জীবানন্দর লেখা? ও আমি ছোঁব না। প্রয়োজন থাকে আপনিই পড়ুন।

ফকির। প্রয়োজন আছে! নইলে ব'লতাম না। পত্র আমাকেই লেখা।

[ফকির ধীরে ধীরে চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন এবং নির্ম্মলের মুখের ভাব সংশয় ও বিস্ময়ে কুটিল হইয়া উঠিতে লাগিল]

ফকির। (পত্রপাঠ)—

"ফকির সাহেব,

ষোড়শীর আসল নাম অলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুষ্ঠাশ্রমের কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু তাহাকে দিয়া কোন ছোট কাজ করাইবেন না। আশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবাল-দীঘি আমার এই গ্রামের মুনাফা প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা আপনাকে জানি। কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অমর্য্যাদা করে, এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রাম খানি তাহাকে দিলাম। আপনি নিজে একটি

আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা কিছু প্রয়োজন করিবেন; সে খরচ আমিই দিব। কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিব।

শ্রীজীবানন্দ চৌধুরী।"

ফকির। (নির্মলের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া) সংসারে কত বিস্ময়ই না আছে!

নির্মল। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি?

ফকির। সত্য না হলে এ দান নেবার জন্য ষোড়শীকে কিছুতেই আন্‌তে পারতাম না।

নির্মল। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কিন্তু তিনি কি এসেছেন? কোথায় আছেন?

ফকির। আছেন আমার কুটীরে, নদীর পরপারে।

নির্মল। আমার যে এখনি একবার যাওয়া চাই ফকির সাহেব।

ফকির। চলুন। (হাসিয়া) কিন্তু বেলা পড়ে এল, আবার না তাঁকে হাত ধরে রেখে যেতে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

[সহসা অন্তরাল হইতে কয়েক জনের সতর্ক, চাপা-কোলাহলের মধ্যে হইতে প্রফুল্লর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল—"সাবধানে! সাবধানে! দেখো যেন ধাক্কা না লাগে!" এবং পরক্ষণেই তাহারা ধরাধরি করিয়া জীবানন্দকে বহিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত। সঙ্গে প্রফুল্ল]

প্রফুল্ল। এখন কেমন মনে হচ্ছে দাদা?

জীবানন্দ। ভাল না। আমি অজ্ঞান হয়ে সাঁকো থেকে কি পড়ে গিয়েছিলাম প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। না দাদা, আমরা ধরে ফেলেছিলাম। কতবার বলেছি এ রুগ্নদেহে এত পরিশ্রম সইবে না, কিন্তু কিছুতে কান দিলেন না। কি সর্বনাশ করলেন বলুন ত?

জীবানন্দ। (চক্ষু মেলিয়া) সর্বনাশ কোথায় প্রফুল্ল, এই ত আমার পার হবার পাথেয়। এ ছাড়া এ জীবনে আর সম্বল ছিল কই?

[দ্রুতবেগে এককড়ি প্রবেশ করিল; তাহার হাতে একটা কাঁচের শিশি]

এককড়ি। (প্রফুল্লর প্রতি) এখ্‌খুনি হুজুরকে এটা খাইয়ে দিন। বল্লভডাক্তার দৌড়ে আস্‌চে,—এলো বলে।

প্রফুল্ল। (শিশি হাতে লইয়া জীবানন্দর কাছে গিয়া) দাদা! এই ওষুধটুকু যে খেতে হবে?

জীবানন্দ। (চক্ষু মুদ্রিত) খেতে হবে? দাও। (ঔষধ পান করিয়া) কোথায় যেন ভয়ানক ব্যথা, প্রফুল্ল, যেন এ ব্যথার আর সীমা নেই। উঃ—

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল কণ্ঠে) এককড়ি, দেখনা একবার ডাক্তার কত দূরে—যাওনা আর একবার ছুটে।

এককড়ি। ছুটেই যাচ্ছি বাবু—

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

জীবানন্দ। ছুটোছুটিতে আর কি হবে প্রফুল্ল। মনে হচ্ছে যেন আজ আর তোমরা ছুটে আমার নাগাল পাবেনা।

প্রফুল্ল। (নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) এমন ত কতবার হয়েছে, কতবার সেরে গেছে দাদা। আজ কেন এ রকম ভাবচেন?

জীবানন্দ। ভাবচি? না, প্রফুল্ল, ভাবিনি (ঈষৎ হাসিয়া) অসুখ বহুবার হয়েছে এবং বহুবার সেরেছে সে ঠিক। কিন্তু এবার যে আর কিছুতেই সারবেনা সেও ত এম্‌নিই ঠিক প্রফুল্ল।

[এককড়ি ও বল্লভডাক্তারের প্রবেশ]

প্রফুল্ল। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আসুন ডাক্তারবাবু।

বল্লভ। হুজুরের অসুখ,—ছুটতে ছুটতে আস্‌চি ওষুধটা খাওয়ানো হয়েছে ত?

এককড়ি। হয়েছে ডাক্তারবাবু, তখ্‌খুনি হয়েছে। ওষুধের শিশি হাতে উঠি ত পড়ি ক'রে ছুটে এসেছি।

[বল্লভ কাছে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিল। মাথা নাড়িয়া প্রফুল্লকে ইঙ্গিতে জানাইল যে অবস্থা ভাল ঠেকিতেছে না]

এককড়ি। (আকুল কণ্ঠে) কি হবে ডাক্তার বাবু? খুব ভালো জোরালো একটা ওষুধ দিন,—আমরা ডবল্ বিজিট দেব,—যা চাইবেন দেব—

প্রফুল্ল। যা' চাইবেন দেব? শুধু এই? সে আর কতটুকু এককড়ি? আমরা তারও অনেক, অনেক বেশি দেব। আমার নিজের প্রাণের দাম বেশি নয়, কিন্তু সে দেওয়াও ত আজ অতি তুচ্ছ মনে হয় ডাক্তার বাবু।

বল্লভ। (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) সমস্তই ওঁর হাতে প্রফুল্ল বাবু, নইলে আমরা আর কি! নিমিত্ত মাত্র! লোকে শুধু মিথ্যে ভাবে বইত না যে, চণ্ডীগড়ের বল্লভ ডাক্তার মরা বাঁচাতে পারে! ওষুধের বাক্স সঙ্গেই এনেছি. এ সব জল

আমার হয়না। চলুন, নন্দী মশাই, শীগ্‌গীর একটা বিচার তৈরি করে দিই।

[এককড়ি ও বল্লভের প্রস্থান।

জীবানন্দ। চোখ বুজে শুয়ে কত কি মনে হচ্ছিল প্রফুল্ল। মনে হচ্ছিল আশ্চর্য্য এই পৃথিবী। নইলে আমার জন্যে চোখের জল ফেল্‌তে তোমাকে পেয়েছিলাম কি কোরে?

প্রফুল্ল। আপনি ত জানেন—

জীবানন্দ। জানি বইকি প্রফুল্ল। কিন্তু এককড়ি তার কি জানে? সে জানে তারই মত তুমিও শুধু একজন কর্ম্মচারী। এক পাষণ্ড জমিদারের তেম্‌নি অসাধু সঙ্গী। কত যে করেছ নীরবে কত যে সয়েছ বাইরের লোকে তার কি খবর রাখে? মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয়েছে দু'টো ভাত ডাল যোগাড়ের ছল ক'রে ত্যাগ করে যেতে চেয়েছ কিন্তু যেতে আমি দিইনি। আজ ভাবি ভালই করেছি। সত্যই ছেড়ে চলে যদি যেতে প্রফুল্ল, আজকের দুঃখ রাখ্‌বার যায়গা পেতে কোথায়?

প্রফুল্ল। দাদা—

জীবানন্দ। একটুখানি কাগজ-কলম আনোনা প্রফুল্ল, তোমার দাদার স্নেহের দান—

প্রফুল্ল। (পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া) স্নেহ আপনার অনেক পেয়েছি দাদা, সেই শুধু আমার সম্বল হয়ে থাক্। আপনি কেবল আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, নিজের পরিশ্রমে যা কিছু পাই এ জীবনে তার বেশি না লোভ করি।

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) বেশ, তাই হোক্ প্রফুল্ল। দান কোরে তোমাকে আমি খাটো ক'রে যাবোনা। কিন্তু ষোড়শী তুমি ত কোনদিনই নও।

[বল্লভ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া ঔষধের পাত্র প্রফুল্লর হাতে দিয়া তেম্‌নি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল]

প্রফুল্ল। দাদা? এই ওষুধটুকু খান্।

[প্রফুল্ল কাছে আসিয়া ঔষধ জীবানন্দর মুখে ঢালিয়া দিয়া নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত মুছাইয়া দিল]

জীবানন্দ। কি ভয়ানক অন্ধকার প্রফুল্ল। রাত্রি বুঝি হল ভাই?

প্রফুল্ল। রাত্রি ত এখনো হয়নি দাদা।

জীবানন্দ। হয়নি? তবে আমার দু'চক্ষে এ নিবিড় আঁধার কিসের প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। অন্ধকার ত নেই দাদা। এখনো যে সূর্য্যাস্তও হয়নি।

জীবানন্দ। হয়নি? যায়নি সূর্য্য এখনো ডুবে? তবে খোল, খোল, আমার সুমুখের জানালা খুলে দাও প্রফুল্ল, একবার দেখি তাঁকে। যাবার আগে আমার শেষ নমস্কার তাঁকে জানিয়ে যাই।

[প্রফুল্ল সম্মুখের বাতায়ন খুলিয়া দিল, এবং কাছে আসিয়া জীবানন্দর ইঙ্গিত মত তাঁহার মাথাটি সযত্নে উঁচু করিয়া দিল। অদূরে বারুইয়ের শীর্ণ জলধারা মন্দবেগে বহিতেছে। পরপারে সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। দূরে নীল বনানী আরক্ত আভায় রঞ্জিত। তটে ধূসর বালুকারাশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে]

জীবানন্দ। (চোখ মেলিয়া কম্পিত দুই হস্ত যুক্ত করিয়া ললাটে স্পর্শ করাইল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) বিশ্বদেব! কে বলে তুমি অচেনা? তুমি চির-রহস্যে ঢাকা? জন্মান্তরের সহস্র পরিচয় যে আজ যাবার দিনে তোমার মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। (একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) ভেবে ছিলাম, হয়ত তোমাকে দেখে ভয় হবে,—হয়ত, এ জীবনের শতেক গ্লানি দীর্ঘ কালো ছায়া মেলে আজ মুখ তোমার ঢেকে দেবে, কিন্তু সে তো হতে দাওনি! বন্ধু, এ জন্মের শেষ নমস্কার তুমি গ্রহণ কর। (শ্রান্তিতে ঢলিয়া পড়িয়া) উঃ—কি ব্যথা!

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ব্যথা কোথায় দাদা?

জীবানন্দ। কোথায়? মাথায়, বুকে, আমার সর্ব্বাঙ্গে, প্রফুল্ল—উঃ—

[দ্রুতপদে ষোড়শী প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে এককড়ি ও বল্লভ ডাক্তার]

ষোড়শী। এ কি কথা এরা সব বলে প্রফুল্ল!

[জীবানন্দর পদতলে বসিয়া পড়িল]

ষোড়শী। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যে আজ সমস্ত ছেড়ে চলে এসেচি। কিন্তু নিষ্ঠুর—অভিমানে এ কি করলে তুমি!

প্রফুল্ল। দাদা, চেয়ে দেখুন অলকা এসেছেন।

জীবানন্দ। অলকা? এলে তুমি? (ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া) কিন্তু সময় নেই আর।

ষোড়শী। কিন্তু, এই যে সেদিন বললে, তুমি সংসারে বাঁচতে চাও—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত হয়ে। তুমি বাড়ী চাও, ঘর চাও, স্ত্রী চাও, সন্তান চাও—

জীবানন্দ। (মাথা নাড়িয়া) না। আজ ফাঁকি দিয়ে আর কিছুই চাইনে অলকা। চিরদিন কেবল ফাঁকি দিয়ে পেয়ে পেয়েই স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম, এমনিই বুঝি। কিন্তু আজ তার কৈফিয়ৎ দেবার দিন এসেছে। যে সৌভাগ্য এ জীবনে অর্জ্জন করিনি, অলকা, সেই ত ঋণ,—সে বোঝা আর যেন আমার না বাড়ে।

[ষোড়শী জীবানন্দর বুকের উপরে মাথা রাখিতে, সে ধীরে ধীরে তাহার অক্ষম হাতখানি ষোড়শীর মাথার পরে রাখিল]

জীবানন্দ। অভিমান ছিল বই কি একটু। তবু, যাবার আগে এই ত তোমাকে পেলাম। এর অধিক পাওয়া সংসারের নিত্য কাজে হয়ত বা কখনো ক্ষুণ্ণ, কখনো বা ম্লান হোতো, কিন্তু সে ভয় আর রইল না। এ মিলনের আর বিচ্ছেদ নেই, অলকা, এই ভাল। এই ভাল।

[ষোড়শী কথা কহিতে পারিল না; দুঃসহ রোদনের বেগে তাহার সমস্ত দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল]

জীবানন্দ। উঃ! পৃথিবীতে কি আর হাওয়া নেই প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। কষ্ট কি খুব বেশি হচ্ছে দাদা? ডাক্তারকে কি একবার ডাক্‌বো?

জীবানন্দ। না না, আর ডাক্তার বদ্যি নয় প্রফুল্ল, শুধু তুমি আর অলকা। উঃ—কি অন্ধকার! সূর্য্য কি অস্ত গেল ভাই?

প্রফুল্ল। এই মাত্র গেল দাদা।

জীবানন্দ। তাই। হাওয়া নেই, আলো নেই, বিশ্বদেব! এ জীবনের শেষ দান কি তবে নিঃশেষ করেই নিলে! উঃ—

ষোড়শী। স্বামী!

প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে কি আজ, সত্যিই ছুটি দিলে দাদা!

যবনিকা

হরিলক্ষ্মী

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

হরিলক্ষ্মী

১

যাহা লইয়া এই গল্পের উৎপত্তি, তাহা ছোট, তথাপি এই ছোট ব্যাপারটুকু অবলম্বন করিয়া হরিলক্ষ্মীর জীবনে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা ক্ষুদ্রও নহে, তুচ্ছও নহে। সংসারে এমনই হয়। বেলপুরের দুই শরিক, শান্ত নদীকূলে জাহাজের পাশে জেলে ডিঙ্গীর মত একটি অপরটির পার্শ্বে নিরুপদ্রবেই বাঁধা ছিল, অকস্মাৎ কোথাকার একটা উড়ো ঝড়ে তরঙ্গ তুলিয়া জাহাজের দড়ি কাটিল, নোঙ্গর ছিঁড়িল, এক মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র তরণী কি করিয়া যে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহার হিসাব পাওয়াই গেল না।

বেলপুর তালুকটুকু বড় ব্যাপার নয়। উঠিতে বসিতে প্রজা ঠেঙ্গাইয়া হাজার বারোর উপরে উঠে না, কিন্তু সাড়ে পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের কাছে দু' পাই অংশের বিপিনবিহারীকে যদি জাহাজের সঙ্গে জেলে ডিঙ্গীর তুলনাই করিয়া থাকি ত বোধ করি, অতিশয়োক্তির অপরাধ করি নাই!

দূর হইলেও জ্ঞাতি, এবং ছয় সাত পুরুষ পূর্ব্বে উভয়ের একত্রই ছিল, কিন্তু আজ একজনের ত্রিতল অট্টালিকা গ্রামের মাথায় চড়িয়াছে এবং অপরের জীর্ণ গৃহ দিনের পর দিন ভূমিশয্যা গ্রহণের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছে।

তবু এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল এবং এমনই ভাবেই ত বাকী দিনগুলা বিপিনের সুখে-দুঃখে নির্ব্বিবাদেই কাটিতে পারিত; কিন্তু যে মেঘখণ্ডটুকু উপলক্ষ করিয়া অকালে ঝঞ্ঝা উঠিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল, তাহা এইরূপ!

সাড়ে পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের হঠাৎ পত্নীবিয়োগ ঘটিলে বন্ধুরা কহিলেন, চল্লিশ একচল্লিশ কি আবার একটা বয়স! তুমি আবার বিবাহ কর। শত্রুপক্ষীয়রা শুনিয়া হাসিল; কহিল, চল্লিশ ত শিবচরণের চল্লিশ বছর আগে পার হয়ে গেছে! অর্থাৎ, কোনটাই সত্য নয়। আসল কথা, বড়বাবুর দিব্য গৌরবর্ণ নাদুস-নুদুস দেহ, সুপুষ্ট মুখের পরে রোমের চিহ্নমাত্র নাই। যথাকালে দাড়িগোঁফ না গজানোর সুবিধা হয় ত কিছু আছে, কিন্তু অসুবিধাও বিস্তর। বয়স আন্দাজ করা ব্যাপারে যাহারা নীচের দিকে যাইতে চাহে না, উপরের দিকে তাহারা যে অঙ্কের কোন্ কোঠায় গিয়া ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহা নিজেরাই ঠাহর করিতে পারে না। সে যাই হোক, অর্থশালী পুরুষের যে কোন দেশেই বয়সের অজুহাতে বিবাহ আটকায় না, বাঙ্গালা দেশে ত নয়-ই। মাস দেড়েক শোক-তাপ ও না না করিয়া গেল, তাহার পরে হরিলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া শিবচরণ বাড়ী আনিলেন। শূন্য গৃহ এক দিনেই ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ শত্রুপক্ষ যাহাই কেন না বলুক, প্রজাপতি যে সত্যই তাঁহার প্রতি এবার অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাহা মানিতেই হইবে। তাহারা গোপনে বলাবলি করিল, পাত্রের তুলনায় নববধূ বয়সের দিক দিয়া একেবারেই বে-মানান হয় নাই, তবে, দুই একটি ছেলে মেয়ে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিলে আর খুঁত ধরিবার কিছু থাকিত না! তবে, সে যে সুন্দরী, এ কথা তাহারা স্বীকার করিল। ফল কথা সচরাচর বড় ঘরের চেয়েও লক্ষ্মীর বয়সটা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল, বোধ করি, উনিশের কম হইবে না। তাহার পিতা আধুনিক নব্যতন্ত্রের লোক, যত্ন করিয়া মেয়েকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য ইচ্ছা ছিল, শুধু ব্যবসা ফেল পড়িয়া আকস্মিক দারিদ্র্যের জন্যই এই সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী সহরের মেয়ে, স্বামীকে দুই চারি দিনেই চিনিয়া ফেলিল। তাহার মুস্কিল হইল এই যে, আত্মীয় মিশ্রিত বহু পরিজন-পরিবৃত বৃহৎ সংসারের মধ্যে সে মন খুলিয়া কাহারও সহিত মিশিতে পারিল না। ও-দিকে শিবচরণের ভালবাসার ত আর অন্ত রহিল না। শুধু কেবল বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা বলিয়াই নয়, সে যেন একেবারে অমূল্য নিধি লাভ করিল। বাটীর আত্মীয় আত্মীয়ার দল কোথায় কি করিয়া যে তাহার মন যোগাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। একটা কথা সে প্রায়ই শুনিতে পাইত—এইবার

মেজ-বৌয়ের মুখে কালি পড়িল। কি রূপে, কি গুণে, কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে অত দিনে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল।

কিন্তু এত করিয়াও সুবিধা হইল না, মাস ছয়েকের মধ্যে লক্ষ্মী অসুখে পড়িল। এই অসুখের মধ্যেই এক দিন মেজ-বৌয়ের সাক্ষাৎ মিলিল। তিনি বিপিনের স্ত্রী, বড় বাড়ীর নতুন বধূর জ্বর শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। বয়সে বোধ হয়, দুই তিন বছরের বড়; তিনি যে সুন্দরী, তাহা মনে মনে লক্ষ্মী স্বীকার করিল। কিন্তু এই বয়সেই দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতের চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে বছর ছয়েকের একটি ছেলে, সে-ও রোগা। লক্ষ্মী শয্যার একধারে সযত্নে বসিতে স্থান দিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হাতে কয়েকগাছি সোণার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই, পরণে ঈষৎ মলিন একখানি রাঙা পাড়ের ধুতি, বোধ হয়, তাহার স্বামীর হইবে, পল্লীগ্রামের প্রথামত ছেলেটি দিগম্বর নয়, তাহারও কোমরে একখানি শিউলিফুলে ছোপানো ছোট্ট কাপড় জড়ানো।

লক্ষ্মী তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, ভাগ্যে জ্বর হয়েছিল, তাই ত আপনার দেখা পেলুম। কিন্তু সম্পর্কে আমি বড় যা হই, মেজবৌ। শুনেছি, মেজ ঠাকুরপো এঁর চেয়ে ঢের ছোট।

মেজবৌ হাসিমুখে কহিল, সম্পর্কে ছোট হ'লে কি তাঁকে 'আপনি' বলে?

লক্ষ্মী কহিল, প্রথম দিন এই যা বল্লুম, নইলে 'আপনি' বল্‌বার লোক আমি নই। কিন্তু তাই ব'লে তুমিও যেন আমাকে দিদি বলে ডেকো না,—ও আমি সইতে পারব না। আমার নাম লক্ষ্মী।

মেজ-বৌ কহিল, নামটি ব'লে দিতে হয় না, দিদি, আপনাকে দেখলেই জানা যায়। আর আমার নাম—কি জানি, কে যে ঠাট্টা ক'রে কমলা রেখেছিলেন—এই বলিয়া সে সকৌতুকে একটুখানি হাসিল মাত্র।

হরিলক্ষ্মীর ইচ্ছা করিল, সে-ও প্রতিবাদ করিয়া বলে, তোমার পানে তাকালেও তোমার নামটি বুঝা যায়, কিন্তু অনুকৃতির মত শুনাইবার ভয়ে বলিতে পারিল না; কহিল, আমাদের নামের মানে এক। কিন্তু, মেজ-বৌ, আমি তোমাকে 'তুমি' বলতে বল্লুম, তুমি পার্‌লে না।

মেজ-বৌ সহাস্যে জবাব দিল, হঠাৎ না-ই পারলুম' দিদি। এক বয়স ছাড়া আপনি সকল বিষয়েই আমার বড়। যাক্ না দু'দিন—দরকার হ'লে বল্‌লে কতক্ষণ?

হরিলক্ষ্মীর মুখে সহসা ইহার প্রত্যুত্তর যোগাইল না, কিন্তু সে মনে বুঝিল, এই মেয়েটি প্রথম দিনের পরিচয়টিকে মাখামাখিতে পরিণত করিতে চাহে না। কিন্তু কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই মেজ-বৌ উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, এখন তা'হলে উঠি দিদি, কা'ল আবার—

লক্ষ্মী বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এখনই যাবে কি রকম, একটু বোসো।

মেজ-বৌ কহিল, আপনি হুকুম করলে ত বসতেই হ'বে, কিন্তু আজ যাই, দিদি, ওঁর আস্‌বার সময় হ'ল। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া যাইবার পূর্ব্বে সহাস্যবদনে কহিল, আসি দিদি। কা'ল একটু সকাল সকাল আস্‌বো, কেমন? এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিপিনের স্ত্রী চলিয়া গেলে হরিলক্ষ্মী সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। এখন জ্বর ছিল না, কিন্তু গ্লানি ছিল। তথাপি কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত সে ভুলিয়া গেল। এত দিন গ্রাম ঝেঁটাইয়া কত বৌ-ঝি যে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু পাশের বাড়ীর দরিদ্র ঘরের এই বধূর সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। তাহারা যাচিয়া আসিয়াছে, উঠিতে চাহে না। আর বসিতে বলিলে ত কথাই নাই। সে কত প্রগল্‌ভতা, কত বাচালতা, মনোরঞ্জন করিবার কত কি লজ্জাকর প্রয়াস! তাহাতে মন তাহার মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহাদেরই মধ্য হইতে অকস্মাৎ কে আসিয়া তাহার রোগশয্যার মুহূর্ত্ত কয়েকের তরে নিজের পরিচয় দিয়া গেল! তাহার বাপের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়াও লক্ষ্মী কি জানি কেমন করিয়া অনুভব করিল—তাহার মত সে কিছুতেই কলিকাতার মেয়ে নয়। পল্লী অঞ্চলে লেখাপড়া জানে বলিয়া বিপিনের স্ত্রীর একটা খ্যাতি আছে। লক্ষ্মী ভাবিল খুব সম্ভব বৌটি সুর করিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী নহে। যে পিতা বিপিনের মত দীন দুঃখীর হাতে মেয়ে দিয়েছে, সে কিছু আর মাষ্টার রাখিয়া স্কুলে পড়াইয়া পাশ করাইয়া কন্যা সম্প্রদান করে নাই। উজ্জ্বল শ্যাম—ফর্সা বলা চলে না। কিন্তু রূপের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, শিক্ষা, সংসর্গ, অবস্থা, কিছুতেই ত বিপিনের স্ত্রী তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে লক্ষ্মীর নিজেকে যেন ছোট মনে হইল। তাহার কণ্ঠস্বর। সে যেন গানের মত, আর বলিবার

ঘরখানি একেবারে মধু দিয়া ভরা। একটুকু জড়িমা নাই, কথাগুলি যেন সে বাড়ী হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিল—এমনই সহজ। কিন্তু সব চেয়ে যে বস্তু তাহাকে বেশী বিদ্ধ করিল, সে ওই মেয়েটির মুখ। সে যে দরিদ্র ঘরের বধূ, তাহা মুখে না বলিয়াও এমন করিয়াই প্রকাশ করিল, যেন ইহাই তাহার স্বাভাবিক, যেন এ ছাড়া আর কিছু তাহাকে কোনমতেই মানাইত না। দরিদ্র; কিন্তু কাঙাল নয়। এক পরিবারের বধূ একজনের পীড়ায় আর একজন তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে,—ইহার অতিরিক্ত লেশমাত্রও অন্য উদ্দেশ্য নাই। সন্ধ্যার পরে স্বামী দেখিতে আসিলে হরিলক্ষ্মী নানা কথার পরে কহিল, আজ ও-বাড়ীর মেজবৌ-ঠাকরুণকে দেখলাম।

শিবচরণ কহিল, কাকে? বিপিনের বৌকে?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এত কাল পরে আমাকে নিজেই দেখ্‌তে এসেছিলেন। কিন্তু মিনিট পাঁচেকের বেশী বসতে পারলেন না, কাজ আছে ব'লে উঠে গেলেন।

শিবচরণ কহিল, কাজ? আরে, ওদের দাসী আছে না চাকর আছে? বাসনমাজা থেকে হাঁড়িঠেলা পর্য্যন্ত—কই, তোমার মত শুয়ে ব'সে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটাক্ দেখি? এক ঘটি জল পর্য্যন্ত আর তোমাকে গড়িয়ে খেতে হয় না।...

নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য হরিলক্ষ্মীর অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু কথাগুলা নাকি তাহাকে বাড়াইবার জন্যই, লাঞ্ছনার জন্য নহে, এই মনে করিয়া প্রতিবাদ করিল না, বলিল, শুনেছি, নাকি মেজ-বৌর বড় গুমোর, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যায় না?

শিবচরণ কহিল, যাবে কোত্থেকে? হাতে কগাছি চুড়ি ছাড়া আর ছাইও নেই,—লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না।

হরিলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া বলিল, লজ্জা কিসের? দেশের লোক কি ওঁর গায়ে জড়োয়া গহনা দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, না দেখতে না পেলে, ছি ছি করে?

শিবচরণ কহিল, জড়োয়া গয়না! আমি যা তোমাকে দিয়েছি, কোন্ শালার বেটা তা' চোখে দেখেছে? পরিবারকে আজ পর্য্যন্ত দুগাছা চুড়ি ছাড়া আর গড়িয়ে দিতে পারলিনে! বাবা! টাকার জোর বড় জোর! জুতো মারবো আর—

হরিলক্ষ্মী ক্ষুব্ধ ও অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, ছি, ছি, ও সব কি বোলছ?

শিবচরণ কহিল, না, না, আমার কাছে লুকো-ছাপা নেই—যা বোল্‌ব, তা' স্পষ্টাস্পষ্টি কথা।

হরিলক্ষ্মী নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া শুইল। বলিবারই বা আছে কি? ইহারা দুর্বলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রূঢ় কথা কঠোর ও কর্কশ করিয়া উচ্চারণ করাকেই একমাত্র স্পষ্টবাদিতা বলিয়া জানে। শিবচরণ থামিল না, বলিতে লাগিল, বিয়েতে যে পাঁচশ টাকা ধরি নিয়ে গেলি, সুদে-আসলে সাত আটশ হয়েছে, তা খেয়াল আছে? গরীব একধারে প'ড়ে আছিস্ থাক, ইচ্ছে করলে যে কাণ ম'লে দূর ক'রে দিতে পারি। দাসীর যোগ্য নয়,—আমার পরিবারের কাছে গুমোর।

হরিলক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল। অসুখের উপরে বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল।

পরদিন দুপুরবেলায় ঘরের মধ্যে মৃদুশব্দে হরিলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া দেখিল, বিপিনের স্ত্রী বাহির হইয়া যাইতেছে। ডাকিয়া কহিল, মেজ-বৌ, চ'লে যাচ্ছ যে?

মেজ-বৌ সলজ্জে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি ভেবেছিলাম, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ কেমন আছেন, দিদি?

হরিলক্ষ্মী কহিল, আজ ঢের ভাল আছি। ক তোমার ছেলেকে আনোনি?

মেজ-বৌ বলিল, আজ সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়্‌ দিদি।

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়্‌লো মানে কি?

অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে ব'লে আমি দিনে বেলায় বড় তাকে ঘুমুতে দিইনে, দিদি।

হরিলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, রোদে রোদে দুরন্ত ক'রে বেড়ায় না?

মেজ-বৌ কহিল, করে বই কি। কিন্তু ঘুমানো চেয়ে সে বরঞ্চ ভাল।

তুমি নিজে বুঝি ঘুমোও না?

মেজ-বৌ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিলক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, মেয়েদের স্বভাবের ম এবার হয় ত সে তাহার অনবকাশের দীর্ঘ তালি দিতে বসিবে, কিন্তু সে সেরূপ কিছুই করিল না। ইহার পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কথা কথায় হরিলক্ষ্মী তাহার বাপের বাড়ীর কথা, তা বোনের কথা, মাষ্টারমশায়ের কথা, স্কুলের কথ এমন কি, তাহার ম্যাট্রিক পাশ করার কথাও করিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে যখন হুঁস হইল, তখ

সহ দেখিতে পাইল, শ্রোতা হিসাবে মেজ-বৌ যত ভালই হৌক, বক্তা হিসাবে একেবারে অকিঞ্চিৎকর। নিজের কথা সে প্রায় কিছুই বলে নাই। প্রথমটা লক্ষ্মী লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু তখনই মনে করিল, আমার কাছে গল্প করিবার মত তাহার আছেই বা কি! কিন্তু কা'ল যেমন এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাহার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তেমনই ভারি একটা তৃপ্তি বোধ করিল।

দেয়ালের মূল্যবান ঘড়িতে নানাবিধ বাজনা-বাদ্য করিয়া তিনটা বাজিল। মেজ-বৌ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে কহিল, দিদি, আজ তা হ'লে আসি?

লক্ষ্মী সকৌতুকে বলিল, তোমার বুঝি ভাই তিনটে পর্য্যন্তই ছুটী? ঠাকুরপো না কি কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ী ঢোকেন?

মেজ-বৌ কহিল, আজ তিনি বাড়ীতে আছেন।

আজ কেন তবে আর একটু বোসো না?

মেজ-বৌ বসিল না, কিন্তু যাবার জন্যও পা বাড়াইল না। আস্তে আস্তে বলিল, দিদি, আপনার কত শিক্ষা-দীক্ষা, কত লেখাপড়া, আমি পাড়া-গাঁয়ের—

তোমার বাপের বাড়ী বুঝি পাড়াগাঁয়ে?

হাঁ দিদি, সে একেবারে অজ পল্লীগ্রামে। না বুঝে কা'ল হয় ত কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি, কিন্তু অসম্মান করবার জন্যে,—আমাকে আপনি যে দিদি কর্‌তে বলবেন, দিদি—

হরিলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি মেজ-বৌ, তুমি ত আমাকে এমন কোন কথাই বলনি।

মেজ-বৌ এ কথার প্রত্যুত্তরে আর একটা কথাও কহিল না। কিন্তু 'আসি' বলিয়া পুনশ্চ বিদায় লইয়া যখন সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, তখন কণ্ঠস্বর যেন তাহার অকস্মাৎ আর একরকম শুনাইল।

রাত্রিতে শিবচরণ যখন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন হরিলক্ষ্মী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মেজ-বৌয়ের শেষের কথাগুলা আর তাহার স্মরণ ছিল না। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মনও শান্ত, প্রসন্ন ছিল।

শিবচরণ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ, বড়-বৌ?

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিয়া কহিল, ভাল আছি।

শিবচরণ কহিল, সকালের ব্যাপার জান ত? বাছাধনকে ডাকিয়ে এনে সকলের সামনে এম্‌নি কড়কে দিয়েছি যে, জন্মে ভুলবে না। আমি বেল-পুরের শিবচরণ! হাঁ!

হরিলক্ষ্মী ভীত হইয়া কহিল, কাকে গো?

শিবচরণ কহিল, বিপ্‌নেকে। ডেকে ব'লে দিলাম, তোমার পরিবার আমার পরিবারের কাছে ব'... ক'রে তাকে অপমান ক'রে যায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা... পাজি, নচ্ছার, ছোট লোকের মেয়ে! ... মাথায় ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে গাঁয়ের বা'র ক'... দিতে পারি, জানিস্‌।

হরিলক্ষ্মীর রোগক্লিষ্ট মুখ একেবারে ফ্যাকা... হইয়া গেল,—বল কি গো!

শিবচরণ নিজের বুকে তাল ঠুকিয়া সদর্পে বলি... লাগিল, এ গাঁয়ে জজ বল, ম্যাজিষ্ট্রেট বল, দা... দারোগা পুলিস বল, সব এই শর্ম্মা! এই শর্ম্মা... মরণ-কাঠি, জীয়ন-কাঠি এই হাতে। তুমি বল, কা'... যদি না বিপনের বৌ এসে তোমার পা টেপে... আমি লাটু চৌধুরীর ছেলেই নই! আমি—

বিপিনের বধূকে সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছি... করিবার বিবরণ ও ব্যাখ্যায় লাটু চৌধুরীর ছে... অ-কথা কু-কথার আর শেষ রাখিল না। আর... তাহারই সম্মুখে স্তব্ধ নির্নিমেষ চক্ষুতে চাহিয়া হরি... লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, ধরিত্রী, দ্বিধা হও!

দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যার দৈহিক... শিবচরণ কেবলমাত্র নিজের দেহ ভিন্ন আর সমস্ত... দিতে পারিত। ...সেই দেহ বেলপুর... সারিতে চাহিল না। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, হাওয়া বদলাইবার। শিবচরণ সাড়ে ষোল আনার মর্য্যাদা... মত ঘটা করিয়া হাওয়া বদলানোর আয়োজন করিল। যাত্রার শুভ দিনে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, আসিল না কেবল বিপিন ও তাহার স্ত্রী। বাহিরে শিবচরণ যাহা না বলিবার, তাহা বলিতে লাগিল, এবং ভিতরে বড় পিসী উদ্দাম হইয়া উঠিলেন। বাহিরেও ধুয়া ধরিবার লোকাভাব ঘটিল না, অন্তঃপুরেও তেমনই পিসীমা'র চীৎকারের আয়তন বাড়াইতে যথেষ্ট স্ত্রীলোক জুটিল। কেবল বলিল না শুধু হরিলক্ষ্মী। মেজ-বৌয়ের প্রতি তাহার ক্ষোভ ও অভিমানের মাত্রা কাহারও অপেক্ষাই কম ছিল না, সে মনে মনে বলিতে লাগিল, তাহার বর্ব্বর স্বামী যত অন্যায়ই করিয়া থাক, সে নিজে ত কি... করে নাই, কিন্তু ঘরের ও বাহিরের যে সব লোকের আজ চেঁচাইতেছিল, তাহাদের সহিত কোন সূত্রে কণ্ঠ মিলাইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। যাইবার পথে পাল্কীর দরজা ফাঁক করিয়া লক্ষ্মী উৎসুক চক্ষুতে বিপিনের জীর্ণ গৃহের জানালার প্রতি চাহিয়া রহিল কিন্তু কাহারও ছায়াটুকুও তাহার চোখে পড়িল না।

কাশীতে বাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল, তথাকার জলবাতাসের গুণে নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইল না। মাস চারেক পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার দেহের কান্তি দেখিয়া মেয়েদের গোপন ঈর্ষ্যার আর অবধি রহিল না।

হিম-ঋতু আগতপ্রায়, দুপুরবেলায় মেজ-বৌ চিররুগ্ন স্বামীর জন্য একটা পশমের গলাবন্ধ বুনিতেছিল, অনতিদূরে বসিয়া ছেলে খেলা করিতেছিল, সে-ই দেখিতে পাইয়া কলরব করিয়া উঠিল, মা, জ্যাঠাইমা।

মা হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া লইয়া আসন পাতিয়া দিল, স্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, শরীর নিরাময় হয়েছে, দিদি?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ, হয়েছে। কিন্তু না হতেও পারতো, না ফিরতেও পারতাম, অথচ যাবার সময়ে একটিবার খোঁজও নিলে না। সমস্ত পথটা তোমার জানালার পানে চেয়ে চেয়ে গেলাম, একবার ছায়াটুকুও চোখে পড়ল না। রোগা বোন চ'লে যাচ্ছে, একটুখানি মায়াও কি হ'ল না, মেজ-বৌ? এমনি পাষাণ তুমি?

মেজ-বৌয়ের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে কোন উত্তরই দিল না।

লক্ষ্মী বলিল, আমার আর যা দোষই থাক, মেজ-বৌ, তোমার মত কঠিন প্রাণ আমার নয়। ভগবান্ না করুন, কিন্তু অমন সময়ে আমি তোমাকে না দেখে থাক্‌তে পারতাম না।

মেজ-বৌ এ অভিযোগেরও কোন জবাব দিল না, নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী আর কখনও আসে নাই, আজ এই প্রথম এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। শতবর্ষের জরাজীর্ণ গৃহ, মাত্র তিনখানি কক্ষ কোনমতে বাসোপযোগী রহিয়াছে। দরিদ্রের আবাস, আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে, ঘরের চূণ-বালি খসিয়াছে, সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি অনাবশ্যক অপরিচ্ছন্নতা এতটুকু কোথাও নাই। স্বল্প বিছানা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, দুই চারিখানি দেবদেবীর ছবি টাঙানো আছে, আর আছে, মেজ-বৌয়ের হাতের নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম। অধিকাংশই পশম ও সূতার কাজ, তাহা শিক্ষা-নবীশের হাতের লাল ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের টিয়াপাখী অথবা পাঁচরঙা বেরালের মূর্ত্তি নয়। মূল্যবান্ ফ্রেমে আঁটা লাল-নীল-বেগুনি-ধূসর-মিলিয়ে নানা বিচিত্র রঙের সমাবেশে পশমে বোনা 'ওয়েল কম্' 'আসুন বসুন' অথবা, বানান-ভুল গীতার শ্লোকার্দ্ধও নয়। লক্ষ্মী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটি কার ছবি, মেজ-বৌ, যেন চেনা-চেনা ঠেক্‌চে?

মেজ-বৌ সলজ্জে হাসিয়া কহিল, ওটি তিলক মহারাজের ছবি দেখে বোন্‌বার চেষ্টা করেছিলাম, দিদি, কিন্তু কিছুই হয় নি। এই কথা বলিয়া সে সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো ভারতের কৌস্তভ, মহাবীর তিলকের ছবি আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

লক্ষ্মী বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, চিন্‌তে পারিনি, সে আমারই দোষ, মেজ-বৌ, তোমার নয়। আমাকে শেখাবে, ভাই? এ বিদ্যে শিখতে যদি পারি ত তোমাকে গুরু ব'লে মানতে আমার আপত্তি নেই।

মেজ-বৌ হাসিতে লাগিল। সে দিন ঘণ্টা তিন চার পরে বিকালে যখন লক্ষ্মী বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন এই কথাই স্থির করিয়া গেল যে, কলা-শিল্প শিখিতে কা'ল হইতে সে প্রত্যহ আসিবে।

আসিতেও লাগিল, কিন্তু দশ পনেরো দিনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ বিদ্যা শুধু কঠিন নয়, অর্জ্জন করিতেও সুদীর্ঘ সময় লাগিবে। এক দিন লক্ষ্মী কহিল, কই, মেজ-বৌ, তুমি আমাকে যত্ন ক'রে শেখাও না।

মেজ-বৌ বলিল, ঢের সময় লাগবে, দিদি, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি অন্য সব বোনা শিখুন।

লক্ষ্মী মনে মনে রাগ করিল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিখতে কত দিন লেগেছিল, মেজ-বৌ?

মেজ-বৌ জবাব দিল, আমাকে কেউ ত শেখায়নি, দিদি, নিজের চেষ্টাতেই একটু একটু ক'রে—

লক্ষ্মী বলিল, তাইতেই। নইলে পরের কাছে শিখতে গেলে তোমারও সময়ের হিসাব থাক্‌তো।

মুখে সে যাহাই বলুক, মনে মনে নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিল, মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এই মেজ-বৌয়ের কাছে সে দাঁড়াইতেই পারে না। আজ তাহার শিক্ষার কাজ অগ্রসর হইল না এবং যথাসময়ের অনেক পূর্ব্বেই সূচ-সূতা-প্যাটার্ণ গুটাইয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। পরদিন আসিল না এবং এই প্রথম প্রত্যহ আসায় তাহার ব্যাঘাত হইল।

দিন চারেক পরে আবার এক দিন হরিলক্ষ্মী তাহার সূচ-সূতার বাক্স হাতে করিয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেজ-বৌ তাহার ছেলেকে রামায়ণ হইতে ছবি দেখাইয়া দেখাইয়া গল্প

রাঁধিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, দু'তিন দিন আসেন নি, আপনার শরীর ভাল ছিল না বুঝি?

লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া কহিল, না, এম্নি পাঁচ ছ' দিন আসতে পারি নি।

মেজ-বৌ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, পাঁচ ছ' দিন আসেন নি? তাই হ'বে বোধ হয়। কিন্তু আজ তা' হলে ছ'ঘণ্টা বেশী থেকে কামাইটা পুষিয়ে নেওয়া চাই।

লক্ষ্মী বলিল, হুঁ। কিন্তু অসুখই যদি আমার ক'রে থাকতো, মেজ-বৌ, তোমার ত একবার খোঁজ করা উচিত ছিল।

মেজ-বৌ সলজ্জে বলিল, উচিত নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সংসারের অসংখ্য রকমের কাজ, —একলা মানুষ, কাকেই বা পাঠাই বলুন? কিন্তু অপরাধ হয়েছে, তা স্বীকার করচি দিদি।

লক্ষ্মী মনে মনে খুসী হইল। এ কয়দিন সে অত্যন্ত অভিমানবশেই আসিতে পারে নাই, অথচ, অহর্নিশি যাই-যাই করিয়াই তাহার দিন কাটিয়াছে। এই মেজ-বৌ ছাড়া শুধু গৃহে কেন, সমস্ত গ্রামের মধ্যেও আর কেহ নাই, যাহার সহিত সে মন খুলিয়া মিশিতে পারে। ছেলে নিজের মনে ছবি দেখিতেছিল। হরিলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া কহিল, নিখিল, কাছে এস ত, বাবা? সে কাছে আসিলে লক্ষ্মী বাক্স খুলিয়া একগাছি সরু সোনার হার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, যাও, খেলা কর গে।

মায়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ওটা দিলেন না কি?

লক্ষ্মী স্মিত মুখে জবাব দিল, দিলাম বই কি।

মেজ-বৌ কহিল, আপনি দিলেই বা ও নেবে কেন?

লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, জ্যাঠাইমা কি একটা হার দিতে পারে না?

মেজ-বৌ বলিল, তা জানিনে, দিদি, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি, মা হয়ে আমি নিতে দিতে পারিনে। নিখিল, ওটা খুলে তোমার জ্যাঠাইমাকে দিয়ে দাও। দিদি, আমরা গরীব, কিন্তু ভিখিরি নই। কোন একটা দামী জিনিষ হঠাৎ পাওয়া গেল বলেই হাত পেতে নেব, —তা' নিইনে।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজও তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী, দ্বিধা হও!

[illegible] সময়ে সে কহিল, কিন্তু এ কথা তোমার [illegible]ওরের কানে যাবে, মেজ-বৌ।

মেজ-বৌ বলিল, তাঁর অনেক কথা আমার কানে আসে, আমার একটা কথা তাঁর কানে গেলে কান অপবিত্র হবে না।

লক্ষ্মী কহিল, বেশ, পরীক্ষা ক'রে দেখলেই হবে। একটু থামিয়া বলিল, আমাকে খামোকা অপমান করার দরকার ছিল না, মেজ-বৌ। আমিও শাস্তি দিতে জানি।

মেজ-বৌ বলিল, এ আপনার রাগের কথা! নইলে আমি যে আপনাকে অপমান করিনি, শুধু আমার স্বামীকেই খামোকা অপমান করতে আপনাকে দিইনি, —এ বোঝবার শিক্ষা আপনার আছে।

লক্ষ্মী কহিল, তা আছে, নেই শুধু তোমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সঙ্গে কোঁদল করবার শিক্ষা।

মেজ-বৌ এ কথার আর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী চলিতে উদ্যত হইয়া বলিল, ওই হারটুকুর দাম যাই হোক, ছেলেটাকে স্নেহবশেই দিয়েছিলাম, তোমার স্বামীর দুঃখ দূর হবে ভেবে দিইনি। মেজ-বৌ, বড়-লোকমাত্রেই গরীবকে শুধু অপমান ক'রে বেড়ায়, এইটুকুই কেবল শিখে রেখেচ, ভালবাসতেও যে পারে, এ তুমি শেখোনি। শেখা দরকার! তখন কিন্তু গিয়ে হাতে পায়ে পড়ো না।

প্রত্যুত্তরে মেজ-বৌ শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না।

৩

বন্যার চাপে মাটির বাঁধ যখন ভাঙিতে সুরু করে, তখন তাহার অকিঞ্চিৎকর আরম্ভ দেখিয়া মনে করাও যায় না যে, অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ এত অল্পকাল মধ্যেই ভাঙনটাকে এমন ভয়াবহ, এমন সুবিশাল করিয়া তুলিবে। ঠিক এমনই হইল হরিলক্ষ্মীর। স্বামীর কাছে বিপিন ও তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাগুলা যখন তাহার সমাপ্ত হইল, তখন তাহার পরিণাম কল্পনা করিয়া সে নিজেই ভয় পাইল। মিথ্যা বলা তাহার স্বভাবও নয়, বাক্যের তাহার শিক্ষা ও মর্য্যাদায় বাধে, কিন্তু উচ্ছ্বাসের প্রবল স্রোতের মত যে সকল বাক্য আপন ঝোঁকেই তাহার মুখ দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার অনেকগুলিই যে সত্য নহে, তাহা নিজেই সে চিনিতে পারিল। অথচ তাহার প্রতিরোধ করাও যে তাহার সাধ্যের বাহিরে, ইহাও অনুভব করিয়া

স্বামীর বাকি রহিল না। শুধু একটা ব্যাপার সে ঠিক একখানি জানিত না, সে তাহার স্বামীর বড় ভাই যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই প্রতিহিংসাপরায়ণ, তেমনই বর্ব্বর। পীড়ন করিবার কোথায় যে সীমা, সে যেন তাহা জানেই না। আজ শিবচরণ আস্ফালন করিল না, সমস্তটা শুনিয়া শুধু কহিল, আচ্ছা, মাসছয়েক পরে দেখো। বছর ঘুরবে না, সে ঠিক।

অপমান ও লাঞ্ছনার জ্বালা হরিলক্ষ্মীর অন্তরে জ্বলিতেছিল, বিপিনের স্ত্রী ভালরূপ শাস্তি ভোগ করে, তাহা সে যথার্থই চাহিতেছিল, কিন্তু শিবচরণ বাহিরে চলিয়া গেলে তাহার মুখের এই সামান্য কয়েকটা কথা বার বার মনের মধ্যে আবৃত্তি করিয়া লক্ষ্মী মনের মধ্যে আর স্বস্তি পাইল না। কোথায় যেন কি একটা ভারি অন্যায় হইল, এমনই তাহার বোধ হইতে লাগিল।

দিন কয়েক পরে কি একটা কথার প্রসঙ্গে হরিলক্ষ্মী হাসিমুখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁদের জন্য কিছু কোরচ না কি?

কা'দের সম্বন্ধে?

বিপিন ঠাকুরপোদের সম্বন্ধে?

শিবচরণ নিস্পৃহস্বরে কহিল, কি-ই বা কোরব, আর কি-ই বা করতে পারি, আমি সামান্য ব্যক্তি বই ত না!

হরিলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, এ কথার মানে?

শিবচরণ বলিল, মেজ-বৌমা ব'লে থাকেন কি না, রাজত্বটা ত আর বট্‌ঠাকুরের নয়—ইংরাজ গবর্মেন্টের!

হরিলক্ষ্মী কহিল, বলেছে না কি? কিন্তু, আচ্ছা—

কি আচ্ছা?

লক্ষ্মী একটুখানি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, কিন্তু মেজবৌ ত ঠিক এ রকম কথা বড় একটা বলে না। লোকের চালাকি কি না! অনেকে আবার মিছেও হয় ত তোমার কাছে ব'লে যায়।

শিবচরণ কহিল, আশ্চর্য্য নয়। তবে কি না, এটা আমি নিজের কানেই শুনেছি।

হরিলক্ষ্মী বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু তখনকার মত স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সহসা কোপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল, বল কি গো, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে না হয় যা খুসী বলেছে, কিন্তু গুরু ব'লে তোমার ত একটা সম্মান থাকা দরকার।

শিবচরণ বলিল, হিঁদুর ঘরে এই ত পাঁচ জনে মনে করে। লেখাপড়া-জানা বিদ্বান মেয়েমানুষ কি না! তবে, আমাকে অপমান ক'রে পার আছে, কিন্তু তোমাকে অপমান ক'রে কারও রক্ষে নেই। সদরে একটু জরুরি কাজ আছে, আমি চল্লাম।—এই বলিয়া শিবচরণ বাহির হইয়া গেল। কথাটা যে রকম করিয়া হরিলক্ষ্মীর পাড়িবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না, বরঞ্চ উল্টা হইয়া গেল। স্বামী চলিয়া গেলে ইহাই তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল।

সদরে গিয়া শিবচরণ বিপিনকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, পাঁচ-সাত বছর থেকে তোমাকে ব'লে আসছি, বিপিন, গোয়ালটা তোমার সরাও, শোবার ঘরে আমি আর টিক্‌তে পারিনে, কথাটায় কি তুমি কাণ দেবে না ঠিক করেছ?

বিপিন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ, আমি ত একবারও শুনিনি বড়দা'?

শিবচরণ অবলীলাক্রমে কহিল, অন্ততঃ দশবার আমি নিজের মুখেই তোমাকে বলেছি। তোমার স্মরণ না থাকলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু, এত বড় জমীদারী যাকে শাসন করতে হয়, তা'র কথা ভুলে গেলে চলে না। সে যাই হোক্‌, তোমার আপনার ত একটা আক্কেল থাকা উচিত যে, পরের যায়গায় নিজের গোয়ালঘর রাখা কতদিন চলে? কালকেই ওটা সরিয়ে ফেল গে। আমার আর সুবিধে হবে না, তোমাকে শেষবারের মত জানিয়ে দিলাম।

বিপিনের মুখে এমনই কথা বাহির হয় না, অকস্মাৎ এই পরম বিস্ময়কর প্রস্তাবের সম্মুখে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পিতামহর আমল হইতে যে গোয়ালঘরটাকে সে নিজেদের বলিয়া জানে, তাহা অপরের, এত বড় মিথ্যে উক্তির সে একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, নীরবে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তাহার স্ত্রী সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, কিন্তু রাজার আদালত খোলা আছে ত!

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। সে যত ভাল মানুষই হউক, এ কথা সে জানিত, ইংরাজ রাজার আদালতগৃহের সুবৃহৎ দ্বার যত উন্মুক্তই থাক্‌, দরিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ একটুকু খোলা নাই। হইলও তাহাই। পরদিন বড়বাবুর লোক আসিয়া প্রাচীন ও জীর্ণ গো-শালা ভাঙ্গিয়া লম্বা প্রাচীর টানিয়া দিল। বিপিন থানায় গিয়া খবর দিয়া আসিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শিবচরণের পুরাতন ইটের

দাঁড়িয়ে অ।

তা' যাবে, কেবল

এই কথা শুনিল…

সে চুপ করিয়া রহিল, … চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া অবধি … দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না, এই ঘটনার মাসখা… মধ্যে সে আবার জ্বরে পড়িল। কিছুকাল গ্রামেই চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ফল যখন হইল না, তখন ডাক্তারের উপদেশমত পুনরায় তাঁহাকে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

নানাবিধ কাজের তাড়ায় এবার শিবচরণ সঙ্গে যাইতে পারিল না, দেশেই রহিল। যাবার সময় সে স্বামীকে একটা কথা বলিবার জন্য মনে মনে ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনমতেই সে এই লোকটির সম্মুখে সে কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ অনুরোধ বৃথা, ইহার অর্থ সে বুঝিবে না।

৪

… দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে …

বেলা বাড়িয়া …

পুনঃ সস্নেহ তাড়নায় লক্ষ্মী স্নান করিয়া আ… উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার রোগা শরীর, বউ-মা, নীচে গিয়ে কাজ নেই, এইখানেই ঠাঁই ক'রে ভাত দিয়ে যাক।

লক্ষ্মী আপত্তি করিয়া … কহিল, …ন আগের মতই ভাল হয়ে গেছে, পিসীমা, আমি … ঘরে গিয়েই খেতে পারবো, ওপরে বয়ে আনবার দরকার নাই। চল, নীচেই যাচ্ছি।

পিসীমা বাধা দিলেন, শিবুর নিষেধ আছে জানাইলেন এবং তাঁহারই আদেশে ঝি ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণে রাঁধুনী অন্নব্যঞ্জন বহিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। সে চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এটি কে, পিসীমা? আগে ত দেখিনি?

পিসীমা হাস্য করিয়া বলিলেন, চিনতে পারলে না বউ-মা, ও যে তোমাদের বিপিনের বৌ।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে বুঝিল, তাহাকে চমৎকৃত করিবার জন্যই এতখানি ষড়যন্ত্র এমন করিয়া গোপনে রাখা হইয়াছিল। কিছুক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসু মুখে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিসীমা বলিলেন, বিপিন মারা গেছে, শুনে…

লক্ষ্মী শুনে নাই কিছুই, কিন্তু এইমাত্র … খাবার দিয়ে গেল, সে যে বিধবা, বুঝা যায়। ঘাড় নাড়িয়া কহি…